হেমেন্দ্রকুমার রায়

রচনাবলী

হেমেন্দ্রকুমার রায়

রচনাবলী

২৬

সম্পাদনা

গীতা দত্ত

এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি

কলেজ স্ট্রিট মার্কেট ।। কলকাতা সাত

প্রকাশিকা
শ্রীমতী গীতা দত্ত
এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি
এ-১৩২, ১৩৩ কলেজ স্ট্রিট মার্কেট ✡ কলকাতা-৭০০ ০০৭

লিপি বিন্যাস
এ পি সি লেজার
৬১ মহাত্মা গান্ধী রোড ✡ কলকাতা-৭০০ ০০৯

মুদ্রাকর
শ্রীকার্তিক কুণ্ডু ও শ্রীতরুণ কুণ্ডু
ইউনিক কলার প্রিন্টার্স
২০এ পটুয়াটোলা লেন ✡ কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ
রমেন আচার্য
কলকাতা-৭০০ ০৫৯

অলংকরণ
প্রণব হাজরা

বাঁধাই
লাভলি বুক বাইন্ডিং
কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ
কলকাতা পুস্তকমেলা
মাঘ ১০, ১৪১৮ ✡ জানুয়ারি ২৫, ২০১২

ISBN 81-7942-068-X

দাম — ৮০.০০

সম্পাদকের নিবেদন

হেমেন্দ্রকুমার রায় রচনাবলীর ষড়্‌বিংশ খণ্ডটির প্রকাশ ঘটল ৩৬ তম কলকাতা পুস্তকমেলায়। বর্তমান খণ্ডে একটি উপন্যাস, কিছু স্মৃতিচারণ মূলক রচনার সঙ্গে ন-টি নানান স্বাদের গল্প এবং একটি নাটক রাখা হল। যার অনেকগুলিই আজ দুর্লভ।

এই খণ্ডের কয়েকটি রচনার সংগ্রহে শ্রীশোভনকুমার রায়, শ্রীসায়ন্তন রায় ও শ্রীঅরুণাভ মজুমদার আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। তাঁদের ধন্যবাদ। রচনাবলীর অন্তর্ভুক্ত হয়নি এরকম রচনার সংগ্রহে কেউ এগিয়ে এলে, আমরা বিশেষ কৃতজ্ঞ থাকব এবং গ্রন্থে তার যথাযোগ্য স্বীকৃতিও রাখব।

বিনীত

গীতা দত্ত

সূচিপত্র

হারাধনের দ্বীপ

॥ প্রথম পরিচ্ছেদ ॥

ক

শ্রীচন্দ্রকান্ত চৌধুরি। আগে ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের জজসাহেব, এখন অবসর গ্রহণ করেছেন। একখানি উচ্চ-শ্রেণির কামরায় চেপে ট্রেনে করে তিনি যাচ্ছিলেন পোর্ট ক্যানিং-এর দিকে। সিগার টানতে টানতে পড়ছিলেন একখানি খবরের কাগজ।

খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে কামরার জানলা দিয়ে তিনি বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখলেন। সূর্যকরদীপ্ত নির্মেঘ আকাশ, তার তলায় মাঠের পর মাঠ, বনের পর বন, তালীকুঞ্জ, বাঁশঝাড়, ঝোপঝাপ, ঝিল-খাল-পুকুর। তারপর তিনি হাতের ঘড়ির দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। গন্তব্যস্থলে গিয়ে পৌঁছতে এখনও বিলম্ব আছে।

খবরের কাগজে অদ্ভুত এই 'হারাধনের দ্বীপ' সম্বন্ধে যে-সব কথা বেরিয়েছে, তিনি মনে মনে তাই নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলেন। 'হারাধনের দ্বীপ!' এমন দ্বীপের নাম কেউ কখনো শোনেনি। অথচ এই অশ্রুত দ্বীপের কথা নিয়ে আজকাল কাগজওয়ালারা ক্রমাগত মাথা না ঘামিয়ে পারছে না।

সুন্দরবনের শেষ প্রান্তে গঙ্গাসাগরের কাছে ছোটো-বড়ো-মাঝারি দ্বীপ আছে অনেকগুলি। কোনো কোনো বড়ো দ্বীপের নাম আছে, আবার অনেক দ্বীপই হচ্ছে একেবারেই অনামা। গত মহাযুদ্ধের সময় কে-এক সাধারণ ব্যক্তি ধনকুবের রূপে অসাধারণ হয়ে ওঠে। হঠাৎ কাঁড়ি কাঁড়ি টাকার মালিক হয়ে সে আবু হোসেনের মতো টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে শুরু করে দেয়। সেই সময়ে কী-এক আজব খেয়ালের দ্বারা চালিত হয়ে সে গঙ্গাসাগরের কাছে ছোটো একটি নামহীন দ্বীপ ক্রয় করে ফেলে, তারপর নিজের মর্জি অনুসারে সেই দ্বীপের নাম দেয়—'হারাধনের দ্বীপ'। এবং অজস্র টাকা ঢেলে সেই বিজন দ্বীপের উপরে প্রাসাদের মতো মস্ত একখানা বাড়ি তৈরি করায়।

হাতে টাকা থাকলে মানুষ খেয়ালের বশে সব কিছুই করতে পারে। দিবাস্বপ্নে অনেক কিছুই চমৎকার বলে মনে হয়, কিন্তু কঠিন বাস্তবের সামনে এসে দাঁড়ালে সুখের স্বপ্ন ছুটে যেতে বিলম্ব হয় না। এই আধুনিক আবু হোসেনও সেই

সত্য হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করলে। দ্বীপে যাতায়াত করবার জন্য নিয়মিত কোনো জলযানের ব্যবস্থা ছিল না। কাজেই কলকাতা থেকে আবশ্যক জিনিসপত্তর—বিশেষ করে আহার্য্যসামগ্রী—যথাসময়ে সরবরাহ করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে ওঠে। তার উপরে বর্ষাকালে সামুদ্রিক ঝড় যখন দুর্বার বেগে দ্বীপকে ভীষণভাবে আক্রমণ করে এবং দিন-রাত ধরে অশ্রান্ত বৃষ্টিধারায় দ্বীপ হয়ে পড়ে জলে জলে জলময়, তখন দ্বীপের নবাগত বাসিন্দাদের জীবন হয়ে ওঠে অত্যন্ত অসহায় এবং দুর্বহ। সুতরাং সেই হঠাৎ নবাবের খেয়াল ছুটে যেতে বেশি দেরি লাগল না।

মাস কয়েক যেতে না যেতেই সে আবার কলকাতায় পালিয়ে এসে, বাড়ি সমেত সেই দ্বীপটাকে জলের দরে বেচে ফেলবার জন্যে খবরের কাগজে উজ্জ্বল ভাষায় বড়ো বড়ো হরফে বিজ্ঞাপন দিতে লাগল। কিছুদিন পরেই শোনা গেল, আবার কে এক নির্বোধ ব্যক্তি পরে পস্তাবে বলে সস্তায় সেই দ্বীপটা কিনে নিয়েছে।

চন্দ্রবাবু নিজের পকেটের ভিতরে হাত ঢুকিয়ে বার করলেন একখানা চিঠি। পত্রলেখকের হাতের লেখা যার-পর-নাই খারাপ, কিন্তু জায়গায় জায়গায় তা আবার এমন স্পষ্ট যে পড়তে কোনোই কষ্ট হয় না :—

'প্রিয় চন্দ্রবাবু...অনেক কাল আপনার কোনো খবর পাইনি। ...কিন্তু আপনাকে এই 'হারাধনের দ্বীপে' আসতেই হবে...পরিস্থানের মতো সুন্দর দ্বীপ...কত কথাই বলবার আছে...সেই পুরনো দিনের কথা...প্রকৃতির কোলে বসে উপভোগ করব সূর্যের সোনার কিরণ...আসতেই হবে, নিশ্চয়ই আসবেন। ...আসচে বারোই তারিখে পোর্ট ক্যানিংয়ে আবার আপনার সঙ্গে দেখা হবে, আর প্রস্তুত থাকবে আমাদের একখানা 'লাঞ্চ'।'

তলায় নাম সই করা হয়েছে—শ্রীমতী চারুশীলা দেবী।

চন্দ্রবাবু ভাবতে লাগলেন। আট-দশ বছর আগে দেওঘরে বেড়াতে গিয়ে এক চারুশীলা দেবীর সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়েছিল। তিনি ছিলেন এক অত্যন্ত ধনী জমিদারের বিধবা সহধর্মিণী। তখন তাঁর বয়স ছিল বোধ হয় ত্রিশ-বত্রিশ। তিনিও ছিলেন অতিশয় খামখেয়ালি।

ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লেন ভূতপূর্ব জজ চন্দ্রকান্ত চৌধুরি।

খ

শ্রীমতী স্বপ্না সেন। সেই ট্রেনেই একখানি তৃতীয় শ্রেণির কামরায় চড়ে যাত্রা করছে 'পোর্ট ক্যানিং'-এর দিকেই। কামরায় আরও কয়েকজন যাত্রী রয়েছে। সকলেই পরিচিত। স্বপ্না মনে মনে ভাবছিল, ভাগ্যে সে কর্মপ্রার্থী হয়ে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিল, তাই এতদিন পরে অস্থায়ী হলেও একটা ভালো কাজ পাওয়া গেল। তাকে হতে হবে একজন মহিলার সঙ্গিনী।

পকেট থেকে একখানি পত্র বার করে সে পড়তে লাগল :—

'সংবাদপত্রে আপনার বিজ্ঞাপন দেখেছি। আপনি যে মাহিনা চেয়েছেন তা দিতে আমার আপত্তি নেই। বারোই তারিখে বৈকালবেলায় আমি 'পোর্ট ক্যানিং'-এ হাজির থাকব। সেই সময়েই আমার সঙ্গে দেখা করলে আনন্দিত হব। রাহা খরচের জন্যে ২০/- টাকা পাঠালুম। ইতি—শ্রীমতী কাননকুন্তলা দেবী।'

কাননকুন্তলা! বাবা, কী কষ্টকল্পিত নাম? ভদ্রমহিলা নিশ্চয়ই অনেক টাকার মালিক, নইলে একটা দ্বীপকে-দ্বীপই কিনে ফেলতে পারেন? দ্বীপের নামটাও কী বেয়াড়া! 'হারাধনের দ্বীপ'! কে কবে শুনেছে এমন নাম?

স্বপ্নার মন হঠাৎ ফিরে গেল পিছনের দিকে! মনে পড়ল তার কুমার নরেন্দ্রনারায়ণের কথা। তাঁর কাছে সে কাজ করেছে প্রায় দুই বৎসর। কাজ কিছু কঠিন নয়, বিপত্নীক নরেন্দ্রনারায়ণের একমাত্র শিশুপুত্রকে দেখাশুনা করবার ভার ছিল তারই উপরে। নরেন্দ্রনারায়ণের একমাত্র বংশধর নীরেন্দ্রনারায়ণ। সেই হত তাঁর অগাধ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী।

স্বপ্না শিউরে উঠল। নরেন্দ্রনারায়ণ—নরেন্দ্রনারায়ণ—না, না, নরেন্দ্রনারায়ণের কথা মন থেকে তার একেবারেই মুছে ফেলা উচিত!

কিন্তু—কিন্তু আর একটা করুণ দৃশ্য যে সে কিছুতেই ভুলতে পারছে না! পুরীর সেই সমুদ্রতীর! নীরেন্দ্রনারায়ণের ছোট্ট মুখখানি একবার ভাসছে, একবার ডুবছে—ভেসে যাচ্ছে উত্তাল তরঙ্গমালার দিকে। সে-ও তাকে বাঁচাবার জন্যে জলে ঝাঁপ দিলে বটে, কিন্তু মনে মনে নিশ্চিত ভাবেই জানত সে, কিছুতেই বাঁচাতে পারবে না তাকে।

না, না, কেন সে আবার ভেবে মরছে এইসব দুঃস্বপ্নের কথা?

নিজের মনকে শক্ত করে স্বপ্না কামরার জানলার দিকে ফিরে বসল। চেয়ে দেখতে লাগল প্রকৃতির নাচঘরে চলচ্চিত্রের পর চলচ্চিত্র—এক ছবি সুমুখে আসে, আর এক ছবি মিলিয়ে যায়!

গ

স্বপ্নার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ঠিক তার সামনের বেঞ্চিতেই বসেছিল অমলেন্দু সেন।

নিজের মনে মনেই সে বললে, 'মেয়েটি সুন্দরী বটে। বেশ বুদ্ধিমতী বলেও মনে হয়। আচ্ছা পরে এর সঙ্গে একটু ভালো করে আলাপ করতে হবে।'

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তার মন আবার বলে উঠল, ধ্যেৎ, এসব আলাপ-পরিচয়ের কথা নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় এখন নেই। এখন কাজের সময়, সে এসেছে জরুরি কাজের ভার নিয়ে।

হুঁ। অ্যাটর্নি বিজন বোস। লোকটা হচ্ছে অত্যন্ত রহস্যময়। বলে কিনা, 'বেশি কথার দরকার নেই অমলেন্দুবাবু। আপনার মত কী বলুন? হ্যাঁ, কি না?'

অমলেন্দু বলে, 'আপনি পাঁচ হাজার দিতে চান?' এমন অবহেলাভরে কথাগুলো সে বলেছিল, যেন পাঁচ হাজার টাকা তার কাছে ধর্তব্যের মধ্যেই গণ্য নয়। অথচ সে সময়ে পরের দিনের খাবার কেনবার সামর্থ্যও তার ছিল না। সে সময়ে এটুকুও সে বুঝতে পেরেছিল যে, বিজন বোস তার অবহেলার ভাবটা মোটেই আমলে আনেনি। অ্যাটর্নিদের চোখে ধুলো দেওয়া সহজ নয়। বিজন বোস চুপ করে আছে দেখে সে আবার শুধোয়, 'তাহলে এ বিষয়ে আপনি আর কোনো খবর দিতে রাজি নন?' বিজন বোস নিশ্চিতভাবে মাথা নেড়ে বলে, 'না অমলেন্দুবাবু! আমার মক্কেল ভালো করেই খবর নিয়ে জেনেছেন যে, আপনি নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি হলেও আপনার বর্তমান আর্থিক অবস্থা এখন সচ্ছল নয়। তাঁরই কথামতো আপনাকে আমি পাঁচ হাজার টাকা দেব এই শর্তে যে, আসছে ১২ই তারিখে বৈকালবেলায় আপনি 'পোর্ট ক্যানিং'-এ গিয়ে হাজির থাকবেন। সেখান থেকে একখানা মোটর-লাঞ্চ আপনাকে নিয়ে হারাধনের দ্বীপে যাত্রা করবে। তারপর দ্বীপে উপস্থিত হয়ে আপনাকে কাজ করতে হবে আমার মক্কেলের ইচ্ছা অনুসারে।'

অমলেন্দু বলে, 'সেই দ্বীপে আমাকে থাকতে হবে কতদিন?'

—'এক সপ্তাহের বেশি নয়।'

অমলেন্দু অল্পক্ষণ চিন্তা করে বলে, 'কিন্তু জেনে রাখবেন, আমি কোনো বে-আইনি কাজ করতে প্রস্তুত নই।'

মুখ টিপে মৃদু হাসি হেসে বিজন বোস বলে, 'কেউ আপনাকে বে-আইনি কাজ করতে বললে দ্বীপ থেকে অনায়াসেই আপনি চলে আসতে পারবেন, কেউ বাধা দেবে না।'

নিকুচি করেছে! এতক্ষণ পরে লোকটা আবার মুখ টিপে হাসলে। আইনবিরুদ্ধ কাজ করা অমলেন্দুর স্বভাববিরুদ্ধ নয়, ও-হাসি যেন ইঙ্গিতে সেই কথাই প্রকাশ করতে চায়! হ্যাঁ, দু-এক বার নিজেকে সামলাবার জন্যে তাকে এমন কিছু করতে হয়েছে, তা মুখ ফুটে বলা যায় না দশ জনের সামনে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজেকে সে সামলে নিতে পেরেছে, কোনো বাধা না মেনেই। —হ্যাঁ, কোনো বাধা না মেনেই।

তা হারাধনের দ্বীপটা তার কাছে বোধহয় নিতান্ত মন্দ লাগবে না। একসঙ্গে ভ্রমণ ও অর্থোপার্জন!

ঘ

গাড়ির একটা কোণ নিয়ে সিধে হয়ে চুপ করে বসেছিলেন সৌদামিনী দেবী। বয়স তাঁর পঁয়ষট্টির কম হবে না। একহারা দেহ, ব্রাহ্মসমাজের মেয়ে। মাঝে মাঝে বিরক্ত চোখে কামরার অন্যান্য লোকগুলোর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখছিলেন। কামরার ভিতরে ভিড় আর গ্রীষ্মের আতিশয্যে অস্থির হয়ে উঠেছে সবাই। একটু অসুবিধা কেউ সইতে পারে না, সবতাতেই বাড়াবাড়ি! এই তো আমি কেমন স্থির ও শান্তভাবে বসে আছি! আমাকে দেখেও কি ওদের বুদ্ধি হয় না?

কামরার ভিতরে ছিল জন-চারেক তরুণী। তাদের হাবভাব ও সাজপোশাক একেবারে বেহদ্দ বেহায়ার মতো। আমাদেরও বয়সকালে মেয়েরা সাজপোশাক ভালোবসত। কিন্তু তখন তো এমন নির্লজ্জতা কখনো দেখিনি! কালে কালে হল কী? এদের কঠিন শিক্ষা দেওয়া উচিত।

সকলের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে সৌদামিনী তাকালেন জানলার বাইরের দিকে। কিন্তু প্রাকৃতিক দৃশ্য তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট করলে না, মনে মনে ভাবছিলেন তিনি গত বৎসরের কথা।

হ্যাঁ, গত বৎসরে এই সময়ে তিনি ছিলেন গিরিডিতে। এবারে চলছেন গঙ্গাসাগর সঙ্গমে, হারাধানের দ্বীপে।

'ভ্যানিটি কেস' থেকে একখানা আগে-পড়া চিঠি বার করে আবার পড়তে লাগলেন :—

'প্রিয় সৌদামিনী দেবী, আশা করি আমাকে আপনি ভুলে যাননি। কয়েক বৎসর আগে আমরা দুজনে পশ্চিমে একসঙ্গে কিছুকাল কাটিয়েছিলুম, এ কথা

আপনার মনে আছে তো? সেদিনের মিলন-স্মৃতি আজও আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে আছে।

গঙ্গাসাগরের সঙ্গমে আমি একটি ছোটো দ্বীপ কিনেছি। সেখানে মনের মতো একখানি বাড়িও পেয়েছি। তার ভিতরে গিয়ে বসলে আপনি ভুলে যাবেন সব একেলে ঝঞ্ঝাটের কথা—অর্থাৎ এরোপ্লেন, ট্রাম-বাস-মোটর, গ্রামোফোন, রেডিয়ো-সিনেমা আর মেয়েদের আধ-ফুট-উঁচু হাই-হিল জুতোর কথা। আপনি যদি মাসখানেক এখানে এসে যাপন করেন, তাহলে অত্যন্ত আনন্দিত হব। জায়গাটির একটি নামও দিয়েছি—'হারাধনের দ্বীপ'। নামটা সেকেলে, নয়? তা আমরা দুজনেই তো সেকেলে যা-কিছু পছন্দ করি। আসবেন। আসছে ১২ই তারিখে বৈকালবেলায় 'পোর্ট ক্যানিং'-এ আমি আপনার জন্যে প্রস্তুত হয়ে থাকব। ইতি—

আপনার কাঃ কুঃ'

আবার কাঃ কুঃ? মানুষটি কে? সাটে নাম লিখেছে কেন? ফি বছরেই তো একবার করে এখানে-ওখানে বেড়াতে যাওয়ার অভ্যাস তাঁর আছে। কবে, কোথায় এই মানুষটির সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল, মনে পড়ে না তো! তিনি মেয়ে না পুরুষ? লেখার ছাঁদ দেখে তো মনে হয় মেয়েমানুষ। তা যিনিই হোন, বিনা পয়সায় এমন বেড়িয়ে আসবার লোভ তো ছাড়া যায় না! শেষ পর্যন্ত দেখাই যাক না কেন?

৩

ট্রেন একটা স্টেশনে এসে থামল। বিরক্ত মুখে বাইরের দিকে তাকালেন মেজর সেন। একে তো এইসব পাড়াগেঁয়ে ট্রেনগুলো গোরুর গাড়ির সঙ্গে তাল রেখে চলবার চেষ্টা করে, তার উপরে ঘড়িঘড়ি যখন-তখন যে কোনো স্টেশনে এসে অচল হয়ে থাকা। জ্বালাতন!

কিন্তু এই 'কাঃ কুঃ' লোকটা কে? লিখেছে : 'আমাদের এই হারাধনের দ্বীপে এলে আপনার দুইজন পুরাতন বন্ধুর দেখা পাবেন। আমিও আপনার কাছে নতুন মানুষ নই। সবাই মিলে কিছুদিন আবার পুরাতন স্মৃতির জগতে বাস করা যাবে।'

পুরাতন স্মৃতির জগতে? সেখানে বাস করার জন্যে তাঁর মনে কোনোই আগ্রহ নেই। সেখানে মনকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে ভালো লাগে না তাঁর। অতীত

কালের কথা ভাবলেই মনে জাগে তাঁর বিশেষ এক ঘটনার স্মৃতি। সে ঘটনা তিনি লুকিয়ে রাখতে চান সন্তর্পণে।

কিন্তু চুলোয় যাক সেসব কথা। এই হারাধনের দ্বীপের রহস্যটা কী? আজকাল খবরের কাগজে প্রায়ই এই অজানা দ্বীপটার সম্বন্ধে অদ্ভুত-সব কাহিনি পাঠ করা যায়। হঠাৎ সেখানে তাঁর আমন্ত্রণ হল কেন?

ভেবেচিন্তে কোনোই সুরাহা হল না। ট্রেন আবার চলতে শুরু করলে। তিনি আশ্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলেন।

চ

ডাক্তার বোস গম্ভীরভাবে তাঁর রিজার্ভ করা কামরার ভিতরে বসে আছেন।

আজ জীবনের পথ হয়েছে তাঁর কুসুমাস্তৃত! অনেক বাধাবিঘ্ন, অনেক কাঁটাঝোপ পার হয়ে আজ তিনি যে পথে এসে দাঁড়িয়েছেন, তা নিয়ে যাবে তাঁকে উচ্চতম, সৌভাগ্যের দিকে। আজ তাঁর হাতযশের কথা ছড়িয়ে পড়েছে দেশ-বিদেশে। তাঁকে ঘিরে থাকে রোগীদের জনতা, না-চাইতে তাঁর ঘরে এসে পড়ে কাঁড়িকাঁড়ি টাকা। কয়েক বৎসর আগেও এটা ছিল স্বপ্নাতীত ব্যাপার। তাঁর বর্তমান উপভোগ্য, তাঁর ভবিষ্যৎ সমুজ্জ্বল।

কেবল অতীতে থেকে গিয়েছে একটি খুঁত। তখনও তিনি আরোহণ করেছেন খ্যাতির সোপানে, কিন্তু একটি মাত্র ঘটনা তাঁর জীবনকে করে তুলেছিল অপ্রীতিকর। কেবল অপ্রীতিকরই নয়। আর একটু হলেই ভেঙে পড়তে পারত তাঁর যশের ভিত্তি। থাক সে কথা, নতুন করে আর ভাবার দরকার নেই। কিন্তু এই লোকটা কে? এমন করে নিজের নাম সই করেছে, ভালো করে পড়াই যায় না। কিন্তু সে যে তাঁকে চেনে, সে বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই। হারাধনের দ্বীপে গিয়ে কিছুদিন অবকাশ যাপন করার জন্যে আমন্ত্রিত হয়েছেন তিনি।

অবকাশ! যেন অবকাশের সুযোগ তাঁর আছে। রোগী আর রোগী, টাকা আর টাকা! রোগী দেখা বন্ধ করলে টাকা আসাও বন্ধ হয়। কিন্তু রোগী আর টাকা নিয়েই তো প্রতিদিন কাটিয়ে দেওয়া চলে না। মাঝে মাঝে হাঁপ ছাড়তে না পারলে জীবন যে হয়ে উঠবে বিষাক্ত। হ্যাঁ, ইতিমধ্যেই তাঁর জীবন হয়ে উঠেছে ভারবহ। কিছুদিনের ছুটি না নিলে এ ভার আর নামবে না। তাই তিনি গ্রহণ করেছেন এই আমন্ত্রণ।

ছ

ট্রেনের আর-একটি কামরায় বসে মহেন্দ্র নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে তারপর মনে মনেই বললে, 'পোর্ট ক্যানিং-এ পৌঁছতে আর বেশি দেরি নেই।' বুকপকেটে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে সে বার করলে একখানা পকেটবুক। তারই খানকয় পাতা উলটে এক জায়গায় থেমে সে কতকগুলো নামের ফর্দ পাঠ করতে লাগল: চন্দ্রকান্ত চৌধুরি, স্বপ্না সেন, অমলেন্দু সেন, সৌদামিনী, মেজর সেন, ডাক্তার বোস, মনোতোষ চৌধুরি এবং নিত্যানন্দ দাস ও সত্যবালা—স্বামী আর স্ত্রী। বাড়িখানা তদারক করার ভার আছে শেষ দুজনেরই উপরে।

মহেন্দ্র নিজের মনেই বললে, 'তাহলে এই ক-জনকে নিয়েই আমার কারবার। তা এদের নিয়ে বেশি বেগ পেতে হবে না বলেই মনে হচ্ছে।'

পকেটবুকখানা আবার বুকপকেটের ভিতরে স্থাপন করে জানলা দিয়ে সে একবার বাইরে মুখ বাড়িয়ে দিলে। পাশের কামরার আর এক ভদ্রলোকও জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে আছেন। তাঁর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই মহেন্দ্র জানলার কাছ থেকে সরে এসে বসল। আপন মনে বললে, 'গোঁফ দেখেই চিনেছি! সেই মিলিটারি ভদ্রলোক! উনি আমাকে চিনতে পারলেন কি না জানি না। কিন্তু যদি পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন, আমি কী বলব? বললেই হবে, আমি সিংহল-প্রবাসী বাঙালি, স্বদেশে বেড়াবার শখ হয়েছে, তাই এদিকে এসেছি।'

॥ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥

ক

পোর্ট ক্যানিং!

যাত্রীরা সব দাঁড়িয়ে আছেন—পরস্পরের কাছ থেকে খানিক খানিক তফাতে। প্রত্যেকের দৃষ্টি কৌতূহলী ও অনুসন্ধিৎসু। প্রত্যেকেই পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখছে। সেই সব দৃষ্টি দেখলে তারা কেউ কারুকে চেনে বলে মনে হয় না।

চন্দ্রবাবু আস্তে আস্তে এগিয়ে সৌদামিনী দেবীর সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। ধীরে ধীরে বললেন, 'আজকের আকাশটা বেশ পরিষ্কার দেখছি।'

সৌদামিনী কাঠের পুতুলের মতন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন, চন্দ্রবাবুর দিকে ফিরে বললেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'এটা ভালো লক্ষণ। জলপথে যেতে হবে, জলঝড়ের ভয় নেই।'

সৌদামিনীর মনে হল, এঁকে দেখলে বোধ হয়, বিশিষ্ট কোনো ভদ্রলোক। চেহারায় আভিজাত্য আছে। যিনি আমাদের নিমন্ত্রণ করেছেন, নিশ্চয়ই তিনি উচ্চশ্রেণিতে ওঠা-বসা করেন।

চন্দ্রবাবু শুধোলেন, 'আপনি এ-অঞ্চলে আগে কখনো এসেছেন কি?'

সৌদামিনী বললেন, 'আজ্ঞে না।'

—'চারুশীলার সঙ্গে আপনার কত দিনের আলাপ?'

সৌদামিনী বিস্মিত স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, 'চারুশীলা দেবী কে?'

—'যিনি আমাদের নিমন্ত্রণ করেছেন।'

—'আমাকে তো চারুশীলা দেবী নিমন্ত্রণ করেননি!'

—'তবে?'

—'পুরো নামটাও আমি বলতে পারব না। আমি যে নিমন্ত্রণপত্র পেয়েছি, তার তলায় আছে একটা নামের দুটো আদ্য অক্ষর—কাঃ কুঃ।'

—'বটে? বটে!' চন্দ্রবাবু আর কিছু বললেন না, একেবারে গুম হয়ে রইলেন। তিনি ভূতপূর্ব জজসাহেব বটে, কিন্তু এখনও তাঁর বুকের ভিতরে সজাগ হয়ে আছে বিচারকের মন।

অমলেন্দু অগ্রসর হয়ে স্বপ্নার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। বললে, 'আপনিও কি আমাদের সঙ্গে হারাধনের দ্বীপে যাবেন?'

স্বপ্না বললে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

অমলেন্দু বললে, 'আমরা কেউ কারুকে চিনি না, কিন্তু মনে হচ্ছে আমাদের বাস করতে হবে এক বাড়িতেই! আমার নাম অমলেন্দু সেন।'

স্বপ্না বললে, 'আমার নাম স্বপ্না সেন।'

অমলেন্দু বললে, 'আপনি কি এই দ্বীপে আগে কখনো এসেছিলেন?'

—'জীবনে নয়। এমনকি যিনি আমাকে কাজে নিযুক্ত করেছেন, তাঁকেও কখনো চোখে দেখিনি।'

—'ভারী আশ্চর্য কথা তো! কে আপনাকে কাজে নিযুক্ত করেছেন?'

—'কাননকুন্তলা দেবী।'

অমলেন্দু মনে মনে ভাবতে লাগল, তবু একটা হদিস পাওয়া গেল। সেই সেয়ানা অ্যাটর্নি বিজন বোস আমার কাছে তার মক্কেলের নামও করেনি। এই মহিলা আর আমার অবস্থা দেখছি একই রকম—যাঁর কাছে কাজ করতে যাচ্ছি তাঁকে আমরা কেউই চিনি না। এতক্ষণে বোঝা গেল তিনি হচ্ছেন স্ত্রীলোক।

মেজর সেনের ভাব দেখলে মনে হয় যেন তিনি কিঞ্চিৎ অধীর হয়ে উঠেছেন! হাতের ছড়ি দিয়ে সামনের একটা ঝোপের উপর বারকয়েক আঘাত করে তিনি অমলেন্দু ও স্বপ্নার কাছে এসে বললেন, 'আপনারাও কি হারাধনের দ্বীপেই যাবেন?'

অমলেন্দু বললে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'বলতে পারেন, কার জন্যে আমরা এখানে অপেক্ষা করছি?'

—'কাননকুন্তলা দেবীর জন্যে। তিনিই সবাইকে নিমন্ত্রণ করেছেন। কিন্তু তিনি এখনও পর্যন্ত এসে পৌঁছোননি।'

এমন সময়ে একটি নূতন লোক এলে সকলকে শুনিয়ে বললে, 'আপনারা এখন মোটরলাঞ্চে গিয়ে উঠতে পারেন।'

লোকটির মাথায় ফেজটুপি, গায়ে কোট, পরনে ইজের।

ডাক্তার বোস এতক্ষণ স্তব্ধ হয়ে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। এখন তিনি বললেন, 'তুমি কে?'

—'আমার নাম মহম্মদ ইব্রাহিম। আমি মোটরলাঞ্চের চালক।'

মহেন্দ্র বললেন, 'মনোতোষ চৌধুরিরও আমাদের সঙ্গে যাবার কথা। তিনি এখনও আসেননি।'

ইব্রাহিম বললে, 'তাঁর জন্যে আমাদের অপেক্ষা করতে হবে না। তিনি নিজের মোটরবোটে করেই দ্বীপে উঠবেন।'

ডাক্তার বোস বললেন, 'কিন্তু যিনি আমাদের নিমন্ত্রণ করেছেন তিনি কোথা?'

ইব্রাহিম বললে, 'খবর পেলুম তিনি ট্রেন ফেল করেছেন। বোধ হয় পরের ট্রেনেই আসবেন।'

চন্দ্রবাবু বিরক্তিপূর্ণ স্বরে বললেন, 'গৃহকর্তা অনুপস্থিত। আমরা অতিথি হয়ে কার কাছে যাব?'

ইব্রাহিম বললে, 'সেজন্য আপনাদের কারুকে কিছু ভাবতে হবে না। দ্বীপের বাড়িতে নিত্যানন্দবাবু আর তাঁর স্ত্রী আছেন, তিনিই আপনাদের দেখাশুনা করার

ভার নেবেন। কিন্তু আমাদের আর এখানে অপেক্ষা করা চলবে না। সন্ধে হবার আগেই আমি মোটরলাঞ্চে স্টার্ট দিতে চাই।'

মহেন্দ্র নিজের মনে মনেই বলল, 'ব্যাপারটা যেন রহস্যময় হয়ে উঠছে! দেখছি আমার দৃষ্টিকে রীতিমতো সজাগ রাখতে হবে।'

সৌদামিনী বললেন, 'আমরা দ্বীপে কখন গিয়ে পৌঁছোব?'

ইব্রাহিম বললে, 'কাল সকালে।'

মেজর সেন শুধোলেন, 'রাত্রে আমাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা কী হবে?'

ইব্রাহিম বললে, 'খাবার-দাবার এর মধ্যেই লাঞ্চে এসে গিয়েছে।'

অমলেন্দু ভাবলে, 'গৃহকর্তা নেই, কিন্তু আর সব ঠিক আছে! এ যে কৃষ্ণ নেই, কৃষ্ণলীলার ব্যাপার! আমার কেমন খটকা লাগছে! একজন স্ত্রীলোকের কাছে চাকরি নিয়েছি, তাঁর নাম নাকি কাননকুন্তলা। পেয়েছি পাঁচ হাজার টাকা! কিন্তু কেন? আমায় কী করতে হবে?'

খ

রাত্রের ব্যবস্থা ভালোই হয়েছিল। আহার ও শয়নের জন্যে কারুকেই কিছুমাত্র অসুবিধা ভোগ করতে হয়নি।

রাত্রে আকাশে চাঁদ ওঠেনি, চারিদিক ঢাকা ছিল অন্ধকারের আবরণে। চাঁদের আলো ফুটলে যাত্রীরা হয়তো নদীর দুই তীরে প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখবার জন্যে জেগে থাকতেন কিছুক্ষণ। স্তব্ধ রাত্রে নদীর জলকল্লোল শুনলেও মাধুর্য উপভোগ করা যায়। কিন্তু চলন্ত মোটরলাঞ্চের কর্কশ শব্দ তারও মিষ্টতাটুকু নষ্ট করে দিয়েছিল। কাজেই আহারাদির পরেই সকলে যে-যার শয্যায় গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন।

খুব ভোরে ঘুম থেকে জেগে উঠে স্বপ্না ভাবলে, আর-সবাই এখনও বোধ হয় ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। কিন্তু বাইরে বেরিয়ে এসে দেখলে তার ধারণা ভ্রান্ত। লাঞ্চের ছাদের উপরে দাঁড়িয়ে আছে দুই মূর্তি—অমলেন্দু আর মহেন্দ্র।

অমলেন্দু হেসে বললে, 'সুপ্রভাত, স্বপ্না দেবী! এত সকালে উঠেছেন? রাত্রে বুঝি ভালো ঘুম হয়নি?'

স্বপ্না বললে, 'না, আমি খুব ঘুমিয়েছি। একটা স্বপ্ন পর্যন্ত দেখিনি। বাঃ, পূর্ব দিকে কী রামধনু-রঙের বাহার, চমৎকার!'

অমলেন্দু বললে, 'চমৎকার বলেই তো এত ভোরে বিছানার মায়া ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়িয়ে আছি। এখনও চারিদিক রহস্যময় হয়ে আছে। কিন্তু এখনই সূর্য উঠবে, সমস্ত রহস্য মিলিয়ে যাবে তার স্পষ্ট আলোয়।'

স্বপ্না বললে, 'রহস্য আমি ভালোবাসি, অমলেন্দুবাবু! এই অল্প আলোছায়ামাখা পৃথিবীকে মনে হয় কেমন একটা মায়ালোকের মতো! সর্বত্র জেগে থাকে কেমন যেন কল্পনার খেলা—কেমন যেন সম্ভাবনার ইঙ্গিত!'

মহেন্দ্র মৃদু হাস্য করে বললে, 'তাহলে স্বপ্না দেবী, এই জলযাত্রা নিশ্চয়ই আপনার ভালো লেগেছে?'

স্বপ্না বললে, 'আপনি একথা বলছেন কেন?'

মহেন্দ্র বললে, 'এও তো একটা রহস্যময় ব্যাপার—'

—'রহস্যময়?'

—'নিশ্চয়। যে দ্বীপের দিকে যাচ্ছি, তার কথা আমরা কেউ কিছু জানি না। আমরা যাঁর আতিথ্য গ্রহণ করব, তিনিও উপস্থিত নেই। আমরা এখানে আছি সাত জন। আরও একজন নতুন অতিথি নাকি আসবেন, কিন্তু আমরা কেউ কারুকেই চিনি না। সমগ্র ব্যাপারটাই কি রহস্যময় নয় স্বপ্না দেবী?'

স্বপ্না কোনো জবাব দিলে না।

কিছুক্ষণ সবাই স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, দৃষ্টি রেখে পূর্ব আকাশের দিকে। প্রাতঃসূর্যের রক্তমুখ দেখা গেল ধীরে ধীরে। তার দীপ্তির তপ্ততায় গলে মিলিয়ে যাচ্ছে ইন্দ্রধনুর বর্ণ-বৈচিত্র্য!

গ

প্রভাত-সূর্যের কিরণ-হার নদীর জলে যখন চকমকিয়ে দুলে দুলে উঠছে, খানিক তফাত থেকে ভেসে এল একটা ধ্বনি। সকলেই উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগল।

মহেন্দ্র বললে, 'মোটরবোটের আওয়াজ! ওই যে, এইবারে দেখা যাচ্ছে বোটখানা। উঃ, ওখানা ছুটে আসছে কী ভীষণ বেগে!'

অমলেন্দু বললে, 'মনোতোষ চৌধুরি নামে এক ভদ্রলোকের মোটরবোটে আসবার কথা ছিল না? বোধহয় তিনি আসছেন।'

মহেন্দ্র বললেন, 'খুব সম্ভব তাই।'

সকলে সেই দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল কৌতূহলী চোখে। বাস্তবিক, বোটখানা ছুটে আসছিল একেবারে চরম বেগে। নদী এখানে অত্যন্ত বেগবতী, যে-কোনো মুহূর্তে একটা দুর্ঘটনা ঘটতে পারে, চালক যেন সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করতে রাজি নয়। দেখতে দেখতে দুই দিকে ক্রুদ্ধ ও শুভ্র ফেনায়িত তরঙ্গমালাকে উদ্বেলিত করে তুলে মোটর-বোটখানা কাছে এসে পড়ল। চালকের আসনে আসীন যে যুবকের মূর্তি, দেখলে মনে হয় সে মূর্তি যেন পার্থিব নয়, স্বর্গ থেকে অবতীর্ণ যেন কোনো তরুণ দেবতা সারথি হয়ে বিদ্যুৎগতিতে চালনা করে নিয়ে যাচ্ছেন এই জলযানকে! দীর্ঘ, ঋজু, বলিষ্ঠ দেহ, তপ্ত-কাঞ্চননিভ বর্ণ, মাথার চুলগুলো পিছনে বিক্ষিপ্ত হয়ে উড়ছে প্রবল বাতাসে।

বোটের হর্ন বেজে উঠল সজোরে, তারপর সেখানা লাঞ্চের পাশ দিয়ে এগিয়ে গেল তীব্র বেগে।

লাঞ্চ চালাতে চালাতে বোটের দিকে তাকিয়ে মহম্মদ ইব্রাহিম নিজেকে শুনিয়ে নিজেই বললে, 'এতক্ষণ পরে একটা মানুষের মতো মানুষের দেখা পাওয়া গেল! ওই ভদ্রলোকই বোধহয় মনোতোষ চৌধুরি? চমৎকার চেহারা, চমৎকার বোট আর চমৎকার ওঁর চালাবার কায়দা! ভদ্রলোক নিশ্চয়ই অনেক টাকার মালিক। লাঞ্চের উপরে যতগুলো মূর্তি আছে, ওদের কারুকেই আমার পছন্দ হয় না। কারুর কারুর চেহারা অমনি এক-রকম ভব্যিযুক্ত বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে আছে থুত্থুড়ো বুড়ো আর বুড়ি, কারুকে দেখতে কেরানির মতো, আর কেউ যেন-বা মাস্টারনি। এমন একটা দ্বীপ যিনি কিনে ফেলেছেন, নিশ্চয়ই তিনি খুব বড়োলোক আর বনেদী ঘরের ছেলে! কিন্তু যাদের তিনি নিমন্ত্রণ করেছেন, তাদের চেহারা দেখলে ভক্তি হয় না কেন?

'কিন্তু ও-সবের চেয়েও মস্ত একটা আজব কথা এই যে, ওঁদের যিনি নিমন্ত্রণ করেছেন আর আমার হাতে দিয়েছেন এই লাঞ্চ চালাবার ভার, আমি এখনও পর্যন্ত তাঁকে একবার চোখেও দেখতে পেলুম না। এরকম কথা কে কবে শুনেছে! কলকাতার সেই অ্যাটর্নিবাবু মধ্যস্থ হয়ে আমাকে নিযুক্ত করেছেন, আমার উপরে হুকুম আছে যে অতিথিদের দ্বীপে নামিয়ে দিয়েই আমি যেন আবার ফিরে যাই। ভিতরের ব্যাপারটা যে কী, কিছুই বুঝতে পারছি না। তা বড়োলোকদের কথা বড়োলোকরাই জানে, খামোকা আমার মাথা ঘামাবার দরকার কী? আমার দরকার টাকা নিয়ে। আমি পাব দ্বিগুণ টাকাই!'

সামনের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ তার চিন্তাস্রোতে বাধা পড়ল। উচ্চকণ্ঠে সে বলে উঠল, 'হারাধনের দ্বীপ, হারাধনের দ্বীপ! দূরে ওই দেখা যাচ্ছে হারাধনের দ্বীপ!'

ঘ

মোটরলাঞ্চ দ্বীপের কাছে তীর পর্যন্ত গেল না, কারণ জল সেখানে অগভীর। সকলে ছোটো একখানি নৌকোয় চড়ে একে একে দ্বীপের উপরে গিয়ে নামলেন।

সামনেই অনেকখানি খোলা জমি, তার আশেপাশে জঙ্গল আর বন্য গাছপালার ভিড়। দেখলেই বোঝা যায়, জঙ্গল সাফ করে এই খোলা জমিটা প্রস্তুত করা হয়েছে। সবুজ ঘাসের আস্তরণে মোড়া জমি, কোথাও আগাছার চিহ্নটুকুও দেখা যায় না। তারই মাঝখান দিয়ে ছোটো একটি পাকা রাস্তা সিধে চলে গিয়েছে এবং রাস্তার শেষে দেখা যাচ্ছে বেশ একখানা বড়োসড়ো লাল রঙের দোতলা বাড়ি—তাকে অনায়াসেই অট্টালিকা বলে গণ্য করা চলে। একেবারে হালফ্যাশনের বাড়ি, এমন জায়গায় এরকম বাড়ি দেখলে মনে জাগে রীতিমতো বিস্ময়!

স্বপ্না খুব খুশিমুখে বলে উঠল, 'বাঃ, কী সুন্দর বাড়িখানি! ঠিক যেন ছবির মতো!'

ডাক্তার বোসের মনে হল বাড়িখানা সুন্দর হলেও কেমন যেন রহস্যময়। অসাধারণ স্থানে অসাধারণ বাড়ি এবং অসাধারণ কোনো-কিছুই ডাক্তার বোস পছন্দ করেন না।

সৌদামিনী মনে মনে বললেন, 'এই নির্জন দ্বীপে লোকালয় থেকে বহুদূরে এসে বাড়িখানাকে দেখে মনে হচ্ছে যেন হানাবাড়ি! কোথাও জনমানবের চিহ্ন পর্যন্ত নেই! এখানে কি মানুষ থাকতে পারে?'

সকলে রাস্তা ধরে খোলা জমি পার হয়ে বাড়ির সামনে এসে পড়ল। তারপর গাড়িবারান্দার তলা দিয়ে বাড়ির সদরের কাছে আসতেই দেখা গেল, সেখানে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটি মূর্তি। বয়স তার ষাটের কাছাকাছি, মুখ সম্পূর্ণ ভাবহীন। জামাকাপড় অত্যন্ত সাদাসিধে।

চন্দ্রবাবু এগিয়ে তার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে শুধোলেন, 'কে তুমি?'

লোকটি বললে, 'আজ্ঞে, আমার নাম শ্রীনিত্যানন্দ দাস। আমার উপরে হুকুম আছে, আপনাদের সমস্ত ব্যবস্থা করে দেবার জন্যে।'

—'কে তোমাকে হুকুম দিয়েছে?'

—'আমাদের মনিব।'

—'তাঁর নাম কী?'

—'জানি না।'

মহেন্দ্র তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে নিত্যানন্দের দিকে তাকিয়ে বললে, 'মনিবের নাম জানো না।'

স্বপ্না বললে, 'তাঁর নাম বোধহয় কাননকুন্তলা দেবী?'

চন্দ্রবাবু বললেন, 'কিন্তু আমাকে নিমন্ত্রণ করেছেন চারুশীলা দেবী।'

নিত্যানন্দ বললে, 'আপনারা যাঁদের কথা বলছেন, তাঁদের নাম আমি শুনিনি। খালি এইটুকুই জানি যে, আমার মনিবের কথামতো অ্যাটর্নি বিজনবাবু আমাকে আর আমার স্ত্রীকে এখানকার কাজে নিযুক্ত করেছেন। আর এটাও আমাকে জানানো হয়েছিল, আজ সকালে আপনারা সবাই এখানে এসে পৌঁছবেন।'

মেজর সেন বললেন, 'তোমাদের মনিব ট্রেন ফেল করে আজ আমাদের সঙ্গে আসতে পারেননি। খুব সম্ভব তিনি কালকেই এসে পড়বেন। কিন্তু আপাতত আমরা কী করব? কে কোথায় থাকব? আহারাদির ব্যবস্থা কী হবে?'

ঠিক সেই সময়ে বাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে একটি যুবক বললে, 'কারুকে কোনোই দুশ্চিন্তা করতে হবে না! এর মধ্যেই বাড়ির সব জায়গায় আমি টহল দিয়ে এসেছি। মস্ত বাড়ি—একসঙ্গে পঞ্চাশ-ষাট জন মানুষ এখানে বাস করতে পারে।

প্রকাণ্ড ভাঁড়ার ঘর, রাশি রাশি খাবার জিনিস জমা করা আছে। রান্নাঘরে নিত্যানন্দের স্ত্রী সত্যবালা আগুন দিয়েছে তিনটে উনুনে। সুতরাং মাভৈঃ!'

সকলেই যুবককে দেখেই চিনতে পারলে, ভোরবেলায় মোটরবোটের চালকের আসনে বসে ছিল এই মূর্তিই।

মহেন্দ্র শুধোলে, 'আপনিই কি মনোতোষবাবু?'

যুবক দুই ভুরু নাচিয়ে বললে, 'আরে, বাহবা কী বাহবা! এই মধ্যেই আমার নাম পর্যন্ত আদায় করে ফেলেছেন দেখছি! আজ্ঞে হ্যাঁ মশাই, পিতৃদেব ওই নামই রেখেছিলেন বটে!'

সকলের পিছনে দাঁড়িয়ে সব কথা নীরবে শুনছিল অমলেন্দু। এইবারে সে অগ্রসর হয়ে বললে, 'নিত্যানন্দ, তোমার মনিবের বদলে তুমিই যখন আছ, আগে

আমাদের সকলের মাথা গোঁজবার জায়গা ঠিক করে দাও দেখি! তারপর হাতমুখ ধুয়ে আমরা সকলেই চা-পান করতে চাই। কোনো অসুবিধা হবে না তো?'

নিত্যানন্দ বললে, 'কিছু না, পাঁচ মিনিটের মধ্যে চা প্রস্তুত হয়ে যাবে। আসুন আমার সঙ্গে আসুন।'

সকলে বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করলে।

নিত্যানন্দ গলা তুলে বললে, 'সত্যবালা, মেয়েদের ঘর-দুটো দেখিয়ে দাও।' তারপর ফিরে সৌদামিনী ও স্বপ্নার উদ্দেশ্যে বললে, 'আপনারা আগে অনুগ্রহ করে উপরে যান। ওইদিকে গেলেই সিঁড়ি পাবেন।' বলে একদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলে।

স্বপ্না কার্পেটপাতা সুদৃশ্য পালিশ করা কাঠের সোপানশ্রেণি দিয়ে উপরে উঠে দেখতে পেলে, একটি প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক সেখানে দাঁড়িয়ে আছে।

সে বললে, 'আমার সঙ্গে আসুন।'

—'তোমার নামই সত্যবালা?'

—'হ্যাঁ। বাছা।'

তার সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে স্বপ্না একটি ঘরের ভিতর গিয়ে ঢুকল। চমৎকার সাজানো-গুছানো ঘর। ধবধপে বিছানা-পাতা খাট, ড্রেসিং টেবিল, চেয়ার, কৌচ ও সোফা প্রভৃতি কোনো আসবাবেরই অভাব নেই। মার্বেলপাথরের মেঝে, মাঝখানে নরম কার্পেট বিছানো।

সত্যবালা বললে, 'ওই দরজা খুললে স্নানের ঘর পাবেন। আর যখনই আমাকে দরকার হবে, ঘণ্টা বাজালেই আমি শুনতে পাব। আপনার আর কিছু দরকার আছে?'

—'আমার সুটকেস এই ঘরে পাঠিয়ে দিতে হবে।'

—'এখনই দিচ্ছি', বলেই সত্যবালা প্রস্থানোদ্যত হল।

স্বপ্না বললে, 'দাঁড়াও, তোমরা স্বামী-স্ত্রী ছাড়া বাড়িতে আর-কেউ আছে?'

—'না।'

—'আমরা আট জন লোক। তোমরা দুজনে আমাদের সামলাতে পারব কি?'

—'বোধহয় পারব। আর আমাদের মনিব তো দু-এক দিনের মধ্যেই এসে পড়বেন। শুনলুম, তাঁরও সঙ্গে নিশ্চয়ই দাস-দাসীরা আসবে।' এই বলে সত্যবালা ঘরের ভিতর থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল।

স্বপ্না একবার জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। ঘন অরণ্যে আচ্ছন্ন দ্বীপ, তার ওপারে দেখা যাচ্ছে সমুদ্রের অসীমতা। চারিদিকে একান্ত স্তব্ধতার বীণায় বেজে উঠছে মাঝে মাঝে গানের পাখিদের সুর। তারপরে ঘরের ভিতরে কিছুক্ষণ ধরে সে পায়চারি করলে, মুখে তার কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্ন ভাব। সমস্ত ব্যাপারটাই তার কাছে কেমন খাপছাড়া বলে মনে হল। গৃহকর্তা অনুপস্থিত, অতিথিদেরও যেন কেমন ছাড়া ছাড়া ভাব! সবই অদ্ভুত!

হঠাৎ তার চোখ পড়ল দেওয়ালের এক জায়গায়। ড্রেসিং টেবিলের উপরে একখানি আয়না, ঠিক তার উপরেই কাচ ও ফ্রেম দিয়ে বাঁধানো একখানা কাগজের উপরে লেখা রয়েছে এই পদ্যটি—

'হারাধনের দশটি ছেলে ঘোরে পাড়াময়,
একটি কোথা হারিয়ে গেল, রইল বাকি নয়।
হারাধনের নয়টি ছেলে কাটতে গেল কাঠ,
একটি কেটে দুখান হল, রইল বাকি আট।
হারাধনের আটটি ছেলে বসল খেতে ভাত,
একটির পেট ফেটে গেল, রইল বাকি সাত।
হারাধনের সাতটি ছেলে গেল জলাশয়,
একটি সেথা ডুবে মল, রইল বাকি ছয়।
হারাধনের ছয়টি ছেলে চড়তে গেল গাছ,
একটি মল পিছলে পড়ে, রইল বাকি পাঁচ।
হারাধনের পাঁচটি ছেলে গেল বনের ধার,
একটি গেল বাঘের পেটে, রইল বাকি চার।
হারাধনের চারটি ছেলে নাচে ধিন ধিন,
একটি মল আছাড় খেয়ে রইল বাকি তিন।
হারাধনের তিনটি ছেলে ধরতে গেল রুই,
একটি খেলে বোয়াল মাছে, রইল বাকি দুই।
হারাধনের দুইটি ছেলে মারতে গেল ভেক,
একটি মল সাপের বিষে, রইল বাকি এক।
হারাধনের একটি ছেলে কাঁদে ভেউ ভেউ,
মনের দুঃখে বনে গেল, রইল না আর কেউ!'

স্বপ্না বললে, 'আরে, এ-ছড়াটা আমি তো ছেলেবেলায় পড়েছি! কিন্তু এই ছেলেভুলানো ছড়াটা এখানে ফ্রেমে বাঁধিয়ে টাঙিয়ে রাখা হয়েছে কেন?'

জিজ্ঞাসার কোনো জবাব পাওয়া গেল না। স্বপ্না আবার জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল, সামনে দেখা যাচ্ছে ওই সমুদ্র—অসীম সমুদ্র! ওদিকে তাকালেই তার মনের পটে ফুটে ওঠে একটা দুঃস্বপ্নের দৃশ্য! সমুদ্রকে এখন দেখাচ্ছে বেশ শান্ত, কিন্তু সময়ে সে কী অধীর আর নিষ্ঠুর হয়েও ওঠে! সে তোমাকে টেনে নিয়ে যায় অতলে, তারপর মৃত্যুঘুমে ঘুমিয়ে পড়ে তরুণ ও জীবন্ত দেহ। মানুষ ডুবে যায়, তলিয়ে যায়, হারিয়ে যায় চিরকালের মতো।

স্বপ্না শিউরে উঠে বললে, 'না, না, আর সে কথা স্মরণ করব না, মুছে যাক অতীতের স্মৃতি—জেগে থাক বর্তমান।'

৬

ডাক্তার বোস বাড়ি থেকে বেরিয়ে আবার গিয়ে দাঁড়ালেন জলের ধারে।

লাঞ্চখানা তখন একটু তফাতে নোঙর করা ছিল। ইব্রাহিম ডাঙা থেকে আবার নৌকোয় উঠতে যাচ্ছে, ডাক্তার বোস জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি বাড়ির ভেতরে আসবে না?'

ইব্রাহিম বললে, 'না হুজুর, আমাকে আবার এখনই ফিরে যেতে হবে।'

—'কেন?'

—'মনিব যদি পোর্ট ক্যানিং-এ এসে পৌঁছোন, তাঁকে তো আবার এখানে নিয়ে আসতে হবে?'

—'মনোতোষবাবুর মোটরবোটখানা কোথায় গেল?'

—'তাঁর ড্রাইভার সেখানা নিয়ে চলে গেছে। সে ফিরে আসবে আবার এক মাস পরে।'

—'এক মাস পরে?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ। এই রকম হুকুমই সে পেয়েছে।'

ডাক্তার বোস অবাক হয়ে ভাবতে লাগলেন, তাহলে মনোতোষবাবু এই দ্বীপে কিছুকালের জন্যে কায়েমি হয়ে বাস করতে চান? ভালো! কিন্তু আমার পক্ষে তা সম্ভব হবে না। তাহলে কলকাতায় রোগীমহলে হাহাকার পড়ে যাবে, আর আমারও ব্যাঙ্কের খাতায় জমার ঘরে বিরাজ করবে দারিদ্র্য। পায়ে পায়ে তিনি

আবার বাড়ির দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। খানিক পরেই শব্দ শুনেই বুঝতে পারলেন, মোটরলাঞ্চ আবার ছেড়ে দিলে। ডাক্তার বোসের মনে হল দেশের মাটির সঙ্গে যে শৃঙ্খলের যোগ ছিল, আবার তা ছিন্ন হয়ে গেল। এখন এই দ্বীপময় জগতে তাঁরা ছাড়া আর কোনো প্রাণীর সাড়াশব্দ পাওয়া যাবে না।

বাড়ির সামনের চাতালে ইজিচেয়ারের উপরে অর্ধশয়ান হয়ে আছেন চন্দ্রকান্ত চৌধুরি। ওই মিশরের মমির মতো শুষ্ক শীর্ণ দেহ, ওই কচ্ছপের মতো গলদেশ, ওই ব্যাঙের মতো মুখ, ওই কুঁজোর মতো সামনে দুমড়ে-পড়া দেহ আগে তিনি কোথায় দেখেছিলেন, এতক্ষণ স্মরণে আসছিল না। এইবারে মনে পড়েছে! উনি হচ্ছেন হাইকোর্টের জজ চন্দ্রকান্ত। তাঁকে একবার ওর কোর্টে গিয়ে সাক্ষ্য দিতে হয়েছিল। অতিশয় হৃদয়হীন—লোকে ওঁর নাম রেখেছিল ফাঁসুড়ে জজ। প্রায় পৃথিবীর বাইরে এসে এমন জায়গায় আজ তাঁর সঙ্গে দেখা!

চ

চন্দ্রবাবু আপন মনে বললেন, 'ডাক্তার বোসকে দেখেই চিনেছি। লোকটা একবার আমার কোর্টে সাক্ষ্য দিতে এসেছিল। খুব সচেতন সাক্ষী, নির্ভুল উত্তর দিতে পারে। কিন্তু রাবিশ, ডাক্তার মাত্রই হচ্ছে নির্বোধ।

এ বাড়িতে আমরা সবাই পুরুষ, মেয়ে আছে কেবল দুজন। তাদের একজন হচ্ছে স্বল্পবাক, প্রাচীনা; আর-একজন একালের হাল-ফ্যাশনের মেয়ে। না, আরও একটি স্ত্রীলোক আছে, ওই সত্যবালা। অদ্ভুত জীব, সর্বদাই যেন ভয়ে তটস্থ।'

ছ

গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে স্নানঘরে বসে স্নান করছে মনোতোষ। স্নান করতে ভারী ভালো লাগছিল তার। ধনীর ছেলে, যাপন করছে উৎসবময় জীবন, চন্দ্রালোক ছাড়া অন্ধকারের কোনো ধারই ধারে না!

হঠাৎ সে বলে উঠল, 'অবশেষে সামুদ্রিক দ্বীপে! এর মধ্যেই পৃথিবীকে আমি সব দিক দিয়ে উপভোগ করে নিয়েছি, কিন্তু এ অভিজ্ঞতা আমার পক্ষে নূতন! মোটরবোটকে আসতে বলে দিয়েছি এক মাস পরে। তার আগে এখান থেকে আমি ফেরবার নামও মুখে আনব না।'

জ

মহেন্দ্র নিজের ঘরে একখানা চেয়ারে বসে ভাবছে, 'আমার অভিনয়টা ঠিক হচ্ছে তো? মনে হয়, কেউই যেন আমাকে দেখে পছন্দ করছে না। কিন্তু কেবল আমি কেন, সকলেই সন্দেহ-ভরা চোখে তাকাচ্ছে সকলের দিকে। তবে আমি যে আসলে কে, সেটা বোধহয় কেউ ঠাহর করতে পারেনি। যাহোক আমার কাজ করতে হবে খুব সাবধানে।'

তারও ঘরের দেওয়ালে টাঙানো রয়েছে সেই ছেলেভুলানো ছড়াটি। সেই দিকে তাকিয়ে তার চোখ উঠল চমকে!

এর মানে কী?

ঝ

চেয়ারের উপর উপবিষ্ট মেজর সেনের দুই ভুরু সঙ্কুচিত।

—'রাবিশ! সবটাই যেন আজব কারখানা! অস্বাভাবিক! অনুপস্থিত গৃহকর্তার বাড়িতে উপস্থিত হয়েছে অতিথিরা! গৃহকর্তা যে কে, তারও হদিস কেউ দিতে পারছে না।

এ-রকমটা আমি আশা করিনি। যে-কোনো একটা ছুতো তুলে এখান থেকে সরে পড়তে হবে কোনোরকমে। কিন্তু এই ঘরে বসেই তো দেখতে পেয়েছি, মোটরবোট আর মোটরলাঞ্চ দ্বীপ ছেড়ে আবার চলে গিয়েছে। এখন ইচ্ছা করলেও আর পালাবার জো নেই। চারিদিকে সমুদ্র! আমরা বন্দি!

আর ওই অমলেন্দু লোকটা কে? নিশ্চয়ই ভালো লোক নয়। দেখলেই সন্দেহ হয়!'

ঞ

অমলেন্দু ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল পা টিপে টিপে। তাকে দেখলেই মনে হয়, শিকারের সন্ধান পেয়ে একটা চিতে বাঘ যেন চলছে-ফিরছে অত্যন্ত সন্তর্পণে!

হঠাৎ মৃদু হেসে মনে মনে সে বললে, 'অ্যাটর্নি বিজন বোসের মুখে শুনলুম, আমার মেয়াদ এখানে এক সপ্তাহের বেশি নয়।

উত্তম! আমি পরিপূর্ণমাত্রায় উপভোগ করব সেই এক সপ্তাহ!'

ট

সৌদামিনী সোজা হয়ে মূর্তির মতন দাঁড়িয়ে আছেন ঘরের মাঝখানে। তাঁর মুখে বিরক্তির চিহ্ন, তাঁর দৃষ্টি নিবন্ধ ঘরের দেওয়ালে টাঙানো সেই ছেলে-ভুলানো ছড়ার দিকে।

শুষ্ক কণ্ঠে ধীরে ধীরে তিনি বললেন, 'বোধহয় আমি কোনো পাগলাগারদে এসে পড়েছি!'

॥ তৃতীয় পরিচ্ছেদ ॥

ক

রাত্রের আহারের জায়গা হল বৈঠকখানার পাশের ঘরে।

খাবারের আয়োজন হয়েছিল প্রায় ভূরিভোজনের মতো। নিত্যানন্দ যেন একাই অনেকজন। তার পরিবেশনে সবাই পরিতুষ্ট।

আহারাদির পর সকলেই আবার বৈঠকখানায় এসে বসল।

ভোজনের পর চন্দ্রবাবুর খিটখিটে মেজাজ কতকটা যেন প্রসন্ন হয়ে উঠল। তিনি কোনো কোনো প্রসঙ্গ তুললেন, ডাক্তার বোস ও মেজর সেন তাঁর কথা শুনতে লাগলেন।

স্বপ্না বললে, 'মহেন্দ্রবাবু, আপনি তো সিংহলপ্রবাসী শুনলুম। ওখানকার গল্প বলুন।'

মহেন্দ্র তার কৌতূহল নিবারণের চেষ্টায় নিযুক্ত হল।

অমলেন্দু তার চেয়ারখানা টেনে নিয়ে গিয়ে দেওয়াল ঘেঁষে বসল। তারপর তার সতর্ক দৃষ্টি ফিরতে লাগল এর-ওর-তার মুখের উপর।

সৌদামিনী চেয়ারের উপরে কাঠের পুতুলের মতো স্থির। তিনি সকলের কথা শুনতে লাগলেন, কিন্তু নিজে একটিও বাক্য উচ্চারণ করলেন না।

মনোতোষ চেঁচিয়ে বললে, 'নিত্যানন্দ, এখানে আইসক্রিম সোডা থাকে তো আমায় একটা এনে দাও।'

এখানকার কথাবার্তা তার ভালো লাগছিল না। সে উঠে জানলার কাছে একটা টেবিলের সামনে গিয়ে বসে পড়ল।

নিত্যানন্দ একটা গেলাসে আইসক্রিম সোডা ভরে তার সামনে এনে রাখলে।

মনোতোষ বললে, 'আইসক্রিমের আর-একটা বোতল আর চাবি টেবিলের উপর রেখে দাও। দু-গ্লাস না খেলে আমার তেষ্টা মিটবে না।'

গেলাসে বার-দুয়েক চুমুক দিয়ে টেবিলের দিকে তাকিয়ে মনোতোষ সচমকে বলে উঠল, 'আরে এ কী ব্যাপার!'

মনোতোষের কথা শুনে সকলেই মুখ ফিরিয়ে তার দিকে তাকিয়ে দেখলে।

অমলেন্দু সবিস্ময়ে বললে, 'টেবিলের উপরে সাজানো ওই মূর্তিগুলো কীসের? দশ দশটা মূর্তি!'

চন্দ্রবাবু ও সৌদামিনী ছাড়া আর সবাই উঠে সেই টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

মহেন্দ্র কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে ধীরে ধীরে বললে, 'এগুলো হচ্ছে সেই ছেলেভুলোনো ছড়ার মূর্তি। হারাধনের দশটি ছেলে!'

স্বপ্না বললে, 'এ তো ভারী মজার ব্যাপার দেখছি! ওই বাঁধানো ছড়াটা আমার ঘরের দেওয়ালে টাঙানো আছে!'

তারপর অন্য সকলেও বললে সেই একই কথা। সকলেরই ঘরে টাঙানো আছে ওই ছড়াটা।

চন্দ্রবাবু মুখ বিকৃত করে বললেন, 'একেবারে ছেলেমানুষি ব্যাপার।'

সকলে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। নিস্তব্ধ রাত্রে বাহির থেকে ভেসে আসতে লাগল সমুদ্রের তরঙ্গ-কোলাহল।

সৌদামিনী বললেন, 'সমুদ্রের সাড়া রাত্রে শোনায় চমৎকার।'

স্বপ্না তিক্তকণ্ঠে বললে, 'সমুদ্রের শব্দকে আমি ঘৃণা করি!'

সৌদামিনী একটু বিস্মিত হয়ে তার মুখের দিকে চোখ তুলে তাকালেন।

তারপর আবার স্তব্ধতা। তারপর সমুদ্রের কোলাহল ডুবিয়ে ঘরের ভিতরে আচম্বিতে জাগ্রত হল আর-এক অদ্ভুত কণ্ঠস্বর! সে যেন অমানুষিক কণ্ঠস্বর :

—'ভদ্রমহোদয় ও মহোদয়াগণ! সকলে চুপ করে আমার কথা শুনুন!'

প্রত্যেকেই অত্যন্ত চমকে উঠল। সকলে চারিদিকে তাকাতে লাগল—চার

দেওয়ালের দিকে, পরস্পরের মুখের দিকে। কে কথা কইলে, কোথা থেকে আসছে এই আশ্চর্য কণ্ঠস্বর?

সেই অজানা কণ্ঠে স্পষ্ট, উচ্চস্বরে শোনা গেল :

'তোমাদের বিরুদ্ধে এই হচ্ছে অভিযোগ :

'ডাক্তার ভবনাথ বসু। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে ১৪ই মার্চ তারিখে তুমি লতিকা রায়চৌধুরিকে হত্যা করেছ।

'সৌদামিনী দেবী, ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে ৫ই নভেম্বর তারিখে তোমার জন্যে অমলাদেবী মারা পড়েছেন।

'মহেন্দ্রকুমার মিত্র, ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে ১০ই অক্টোবর তারিখে জ্যোতির্ময় বসুর মৃত্যু হয়েছে তোমার জন্যেই।

'স্বপ্না দেবী, ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে ১১ই আগস্ট তারিখে কুমার নরেন্দ্রনারায়ণের পুত্র নীরেন্দ্রনারায়ণকে তুমি হত্যা করেছ।

'অমলেন্দু মল্লিক, ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে ফেব্রুয়ারি মাসের কোনো এক তারিখে সিংহলের বিজন অরণ্যে ২১ জন মানুষের মৃত্যুর জন্যে তুমিই দায়ী।

'মেজর মন্মথমোহন সেন, ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারি তারিখে তুমি তোমার স্ত্রীর বন্ধু সুরেন্দ্রনাথ পালকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে পাঠিয়ে দিয়েছ।

'মনোতোষ চৌধুরি, গত বৎসরের নভেম্বর মাসের ১৫ই তারিখে তুমি সুকুমার ও তার ভগ্নী অতসীর মৃত্যুর জন্যে দায়ী।

'নিত্যানন্দ দাস ও সত্যবালা দাসী, ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের ৬ই মে তারিখে নিস্তারিণী দেবী মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন তোমাদের জন্যেই।

'চন্দ্রকান্ত চৌধুরি, ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের ১০ই জুন তারিখে বরেন্দ্রনাথ বসুকে তুমি মৃত্যুর মুখে পাঠিয়ে দিয়েছ।

'আজ তোমরা এখানে বন্দি। নিজেদের স্বপক্ষে তোমাদের কিছু বলবার আছে?'

খ

স্তব্ধ হল কণ্ঠস্বর।

কিছুক্ষণ সবাই স্তম্ভিত ও নির্বাক। তারপরই হুড়মুড় করে কতকগুলো কাচের জিনিস ভাঙার শব্দ হল।

নিত্যানন্দ একখানা ট্রের উপরে কয়েকটা ভরতি কফির পেয়ালা সাজিয়ে নিয়ে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করেছিল, হঠাৎ তার হাত ফসকে ট্রেখানা সশব্দে পড়ে গেল মেঝের উপরে।

এবং ঠিক সেই মুহূর্তেই ঘরের বাহির থেকে শোনা গেল একটু উচ্চ আর্তনাদ ও ধপাস করে একটা দেহ পতনের শব্দ।

সর্বপ্রথম সাড়া হল অমলেন্দুর। সে এক লাফে এগিয়ে ঘরের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। বাহিরে দরজার ঠিক সামনেই অচেতন অবস্থায় পড়ে আছে সত্যবালার দেহ।

অমলেন্দু ডাকলে, 'মনোতোষবাবু!'

মনোতোষ তাড়াতাড়ি সেখানে ছুটে গেল এবং দুইজনে ধরাধরি করে সত্যবালার দেহ বৈঠকখানায় নিয়ে এসে একখানা সোফার উপর শুইয়ে দিলে।

ডাক্তার বোস সত্যবালাকে খানিকক্ষণ পরীক্ষা করে বললেন, 'কোনো ভয় নেই, অজ্ঞান হয়ে গেছে, এখুনি জ্ঞান হবে।'

স্বপ্না চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'ও কে কথা কইলে? কোথায় সে?'

মেজর সেন বললেন, 'এ সব কী ব্যাপার? কেউ কি আমাদের সঙ্গে কৌতুক করতে চায়?' তাঁর হাত ঠকঠক করে কাঁপছে। তাঁকে দেখলে মনে হয়, তাঁর বয়স যেন দশ বছর বেড়ে গিয়েছে!

মহেন্দ্রর সর্বাঙ্গ ঘেমে উঠেছিল, রুমাল বার করে সে মুখ মুছতে লাগল।

কেবল চন্দ্রবাবু ও সৌদামিনী এমন স্থির ভাবে বসেছিলেন, যেন এখানে অসাধারণ কোনো কিছুই ঘটেনি।

অমলেন্দু বললে, 'মনে হচ্ছে, এই ঘরের ভিতরে দাঁড়িয়েই এইমাত্র ওই কথাগুলো কেউ উচ্চারণ করেছে।'

স্বপ্না বললে, 'কিন্তু কে সে? নিশ্চয়ই আমাদের মধ্যে কেউ নয়?'

অমলেন্দুর চোখ একবার ঘরের খোলা জানালার দিকে আকৃষ্ট হল। তারপর সে মাথা নাড়লে নিশ্চিতভাবে, 'না—ওখান থেকে কেউ কথা বলেনি।'

ঘরের আর-একদিকে আর-একটা দরজা দিয়ে পাশের অন্য-একটা ঘরের ভিতরে যাওয়া যায়। অমলেন্দু ধাক্কা মেরে সেই দরজাটা খুলে ফেলে ভিতরে ঢুকেই বলে উঠল, 'ও, এইবারে বোঝা গেছে।'

সকলে তাড়াতাড়ি উঠে তার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। কেবল সৌদামিনী সিধে

হয়ে স্থিরভাবে বসে রইলেন নিজের চেয়ারের উপরে। ও-ঘরের দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড় করানো আছে একটা টেবিল এবং সেই টেবিলের উপরে রয়েছে প্রকাণ্ড একটা চোঙায়ালা সেকেলে গ্রামোফোন। চোঙার মুখটা স্পর্শ করে আছে বৈঠকখানা ঘরের দেওয়ালকে।

অমলেন্দু চোঙাটা ঠেলে সরিয়ে দিতেই দেখা গেল, দেওয়ালের উপরে রয়েছে ছোটো ছোটো তিন-চারটে ছিদ্র।

অমলেন্দু গ্রামোফোনের 'সাউন্ড বক্স'টা রেকর্ডের যথাস্থানে স্থাপন করে আবার কল চালিয়ে দিলে এবং সঙ্গে সঙ্গে আবার শোনা গেল—'ভদ্রমহোদয় ও মহোদয়াগণ! সকলে চুপ করে আমার কথা শুনুন!'

স্বপ্না চেঁচিয়ে উঠল, 'বন্ধ করে দিন—মেশিন বন্ধ করে দিন! এ হচ্ছে ভয়ানক!'

অমলেন্দু মেশিন বন্ধ করে দিল।

ডাক্তার বোস আশ্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'এ হচ্ছে একটা যাচ্ছেতাই নির্দয় ঠাট্টা! অত্যন্ত অপমানকর!'

পরিষ্কার স্বরে চন্দ্রবাবু, 'আপনি তাহলে একে ঠাট্টা বলেই মনে করছেন!'

ডাক্তার ফ্যালফ্যাল করে তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তা ছাড়া আর কী মনে করতে পারি?'

চিবুক চুলকোতে চুলকোতে চন্দ্রবাবু শান্তকণ্ঠে বললেন, 'আপাতত আমি কোনো মতামত প্রকাশ করতে চাই না।'

মনোতোষ বললে, 'কিন্তু আপনারা একটা কথা ভুলে যাচ্ছেন। এই মেশিনটা চালিয়ে দিয়েছে কে?'

চন্দ্রবাবু বললে, 'হ্যাঁ, এইবারে সেই কথা নিয়েই আলোচনা করতে হবে। চলুন, আবার বৈঠকখানায় গিয়ে বসি।'

সত্যবালার তখন জ্ঞান হয়েছে। সে ক্রন্দন করছিল অস্ফুট স্বরে। তার পাশে গিয়ে একখানা চেয়ারের উপরে বসেছিলেন সৌদামিনী।

নিত্যানন্দ কাছে গিয়ে সৌদামিনীকে সম্বোধন করে বললে, 'আপনি দয়া করে সরে বসুন। আমাকে ওর সঙ্গে কথা কইতে দিন। সত্য, তুমি কাঁদছ কেন? চুপ করো, শান্ত হও।'

সত্যবালা উদ্ভ্রান্ত চোখে সকলকার দিকে তাকাতে লাগল। ডাক্তার সান্ত্বনাকণ্ঠে বললেন, 'কেঁদো না সত্যবালা, তোমার আর কোনো ভয় নেই।'

সত্যবালা বললে, 'আমি কি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলুম?'

—'হ্যাঁ।'

পাণ্ডুমুখে কম্পিতস্বরে সে বললে, 'ওই কণ্ঠস্বর—ওই ভয়ানক কণ্ঠস্বর—ঠিক যেন বিচারক রায় দিচ্ছেন আসামিদের প্রতি—'

নিত্যানন্দ বললে, 'হ্যাঁ, আমিও এমন চমকে গিয়েছিলুম যে আমার হাত থেকে ট্রেখানা পড়ে গেল। ওসব হচ্ছে মিথ্যাকথা—একেবারে বাজে মিথ্যাকথা!'

চন্দ্রবাবু দু-এক বার কেশে নিজের গলা পরিষ্কার করে নিয়ে বললেন, 'গ্রামোফোনের মেশিনটা চালিয়ে দিয়েছিল কে? তুমিই কি?'

নিত্যানন্দ চিৎকার করে বলে উঠল, 'ও রেকর্ডে কী আছে আমি তা জানতুম না! ভগবানের দিব্য, আমি কিছুই জানতুম না! জানলে পরে আমি কিছুতেই এ-কাজ করতুম না!'

চন্দ্রবাবু শুষ্ককণ্ঠে বললেন, 'তোমার কথা আমি সত্য বলেই মেনে নিচ্ছি। কিন্তু মেশিনটা তুমি চালিয়ে দিয়েছিলে কেন?'

—'আমি মনিবের হুকুম তামিল করতে বাধ্য।'

—'কে তোমার মনিব?'

—'কে যে আমার মনিব তাও আমি জানি না। তবে অ্যাটর্নি বিজনবাবুর মুখেই আমি তাঁর হুকুম শুনেছি।'

—'হুকুমটা কী, নিত্যানন্দ?'

—'আমাকে ওই রেকর্ডখানা মেশিনের উপরে রাখতে হবে। তারপর রাত্রের খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেলে আমি যখন কফির ট্রে হাতে করে বৈঠকখানায় আসব, আমার স্ত্রী তখন মেশিনটা চালিয়ে দেবে।'

অত্যন্ত মৃদুকণ্ঠে চন্দ্রবাবু বললেন, 'আশ্চর্য কথা!'

নিত্যানন্দ আবার চেঁচিয়ে বললে, 'কিন্তু আশ্চর্য হলেও আমি সত্য কথাই বলছি। ওই রেকর্ডের উপরে একটা নামও লেখা আছে। আমি ভেবেছিলুম, ওখানা কোনো গানের রেকর্ড।'

অমলেন্দুর দিকে তাকিয়ে চন্দ্রবাবু বললেন, 'ওই রেকর্ডের উপরে কোনো নাম লেখা আছে নাকি?'

অমলেন্দু ম্লান হাসি হেসে বললে, 'আছে, মশাই, আছে। রেকর্ডের উপরে লেখা আছে—'সর্বশেষের গান'!'

গ

মেজর সেন উত্যক্ত কণ্ঠে বললেন, 'সমস্ত ব্যাপারটাই হচ্ছে রাবিশ! সকলের নামেই এইরকম বাজে অভিযোগ করা! কে এই বাড়ির মালিক? অ্যাটর্নি বিজন বোসের সঙ্গে তার কী সম্পর্ক?'

সৌদামিনী তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন, 'হ্যাঁ, কে এই বাড়ির মালিক?'

জজ চন্দ্রকান্তবাবু, চিরকালই হুকুম দেওয়া ছিল তাঁর পেশা। সেই রকম হুকুমের স্বরেই তিনি বললেন, 'হুঁ, এইবারে ওই কথাটাই জানা দরকার। নিত্যানন্দ, তুমি আগে তোমার স্ত্রীকে এ ঘর থেকে নিয়ে যাও। তারপর আবার ফিরে এসো।'

নিত্যানন্দ বললে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।' তারপর তার কাঁধে ভর করে সত্যবালা সেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সকলেরই কণ্ঠস্বর শুকিয়ে গিয়েছিল। মনোতোষ বললে, 'আমার তেষ্টা পেয়েছে। আপনারাও কিছু পান করবেন নাকি?'

সবাই বললে, 'হ্যাঁ।'

মনোতোষ বললে, 'পাশের ঘরে একটা সেলফের উপরে আমি অনেকগুলো সোডা-লেমোনেডের সাজানো বোতল দেখে এসেছি। আপনারা একটু অপেক্ষা করুন, আমি এখনই নিয়ে আসছি।'

নিত্যানন্দ আবার ঘরের ভিতরে এসে ঢুকল।

চন্দ্রবাবু বললেন, 'তা হলে নিত্যানন্দ, এ বাড়ির মালিক কে, তুমি তা জানো না?'

—'আজ্ঞে না। আমি তাঁকে দেখিওনি, তাঁর নামও শুনিনি। আমাকে নিযুক্ত করেছেন অ্যাটর্নি বিজনবাবু।'

চন্দ্রবাবু বললেন, 'অ্যাটর্নি বিজন বসু? হুঁ, ও নাম আমার পরিচিত। তারপর নিত্যানন্দ, তোমার আর কী বক্তব্য আছে?'

—'আপনারা আসবার দু-দিন আগে আমরা দুজনে এখানে এসেছি। দেখলুম, সাজানো-গুছানো বাড়ি, ভাঁড়ার ঘর খাবারে ভরতি। কোথাও কিছুরই অভাব নেই।'

—'তারপর?'

—'তারপর আর বলবার কথা বিশেষ কিছুই নেই। তারপর আমি একখানা চিঠি পাই। তাতেই লেখা ছিল, আমাকে কী কী করতে হবে।'

—'সে চিঠিখানা তোমার কাছে আছে?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ। এই নিন।' নিত্যানন্দ পকেট থেকে একটা কাগজ বার করে চন্দ্রবাবুর হাতে দিলে।

চন্দ্রবাবু চিঠিখানার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'চিঠিখানা দেখছি টাইপ করা। লেখকের ঠিকানা হচ্ছে কলকাতার গ্র্যান্ড হোটেল।'

মহেন্দ্র টপ করে এগিয়ে এসে চিঠিখানা টেনে নিয়ে বললে, 'আমাকে একবার চিঠিখানা দেখতে দিন।' তারপর কাগজখানার উপরে দৃষ্টি নিবন্ধ করে মৃদুস্বরে ধীরে ধীরে বললে, 'আন্ডারউড টাইপরাইটার! নতুন যন্ত্র—কোনো টাইপ ক্ষয়ে যায়নি। সাধারণ টাইপ করার কাগজ। এর ভিতর থেকে বিশেষ কিছু আবিষ্কার করা চলবে না। হয়তো আঙুলের ছাপ পাওয়া যেতে পারে কিন্তু পাওয়া যাবে বলে আমি বিশ্বাস করি না।'

চন্দ্রবাবু হঠাৎ অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে মহেন্দ্রের দিকে করলেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, 'আশ্চর্য, আপনার নাম তো এখনও আমরা জানতে পারিনি?'

মহেন্দ্র থতমত খেয়ে একটু থেমে বললে, 'আমার নাম? আমার নাম নরেন্দ্রনাথ লাহিড়ি।'

চন্দ্রবাবু কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে বসে রইলেন। তারপর বললেন, 'এইমাত্র গ্রামোফোনের রেকর্ডের সাহায্যে আমাদের সকলকার নামে কোনো ব্যক্তি গুরুতর অভিযোগ করেছে। নরেনবাবু, আপনি ছাড়া অভিযোগ হয়েছে আর-সকলের বিরুদ্ধেই। না, ঠিক সকলের বিরুদ্ধে নয়, অভিযুক্তদের মধ্যে আছেন মহেন্দ্রকুমার মিত্র নামে জনৈক ব্যক্তি। তিনি কে? তিনি তো এখানে উপস্থিত নেই!'

মহেন্দ্র নাচারভাবে বললে, 'দেখছি, আত্মপ্রকাশ করা ছাড়া আমার পক্ষে আর কোনো উপায় নেই। চন্দ্রবাবু, আমার নাম নরেন্দ্রনাথ লাহিড়ি নয়।'

—'তা হলে আপনারই নাম কি মহেন্দ্রকুমার মিত্র?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

অমলেন্দু তপ্তকণ্ঠে বললে, 'আপনি কেবল নাম লুকিয়ে এখানে আসেননি।

মিথ্যা কথা বলতেও আপনার বাধে না। আপনি নিজেকে সিংহলপ্রবাসী বলে জানাতে চান। সিংহলে আমি অনেকবার গিয়েছি। একটু আগেই আপনার মুখে সিংহলের যে-সব গল্প শুনছিলুম, সেখানে গেলে নিশ্চয়ই আপনি ওরকম বাজে গল্প বলতে পারতেন না। কে আপনি?'

সকলের দৃষ্টি গেল মহেন্দ্রর দিকে—ক্রুদ্ধ, সন্দেহপূর্ণ দৃষ্টি।

মনোতোষ এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল তার সামনে, তার দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ। খাপ্পা হয়ে সে বললে, 'কে তুমি, নাম আর পরিচয় লুকিয়ে আমাদের দলে এসে যোগ দিয়েছ?'

মহেন্দ্র কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হল না, শান্ত অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বললে, 'আপনারা সকলেই আমাকে ভুল বুঝেছেন দেখছি। আমার পরিচয়ও আমি দিতে পারি আর তার প্রমাণও আমি দেখাতে পারি। আমি আগে ছিলুম পুলিশের গোয়েন্দা-বিভাগে, এখনও 'প্রাইভেট ডিটেকটিভে'র কাজ করি। কোনো ব্যক্তি এই দ্বীপে আসবার জন্যে আমাকে নিযুক্ত করেছেন।

চন্দ্রবাবু বললেন, 'কোনো ব্যক্তি মানে? কে সে?'

—'পিছনে কে আছেন আমি তা জানি না, কিন্তু আমাকে নিযুক্ত করেছেন অ্যাটর্নি বিজন বোস। তাঁরই কথামতো আমিও একজন অতিথিরূপে এখানে এসেছি। আমার কর্তব্য হচ্ছে, আপনাদের সকলেরই উপরে সতর্ক দৃষ্টি রাখা। এজন্য আমি যথেষ্ট পারিশ্রমিকও পেয়েছি।'

—'আমাদের উপরে দৃষ্টি রাখবার কারণ?'

—'কাননকুন্তলা দেবী বলে কোনো মহিলার এখানে আসবার কথা। তাঁর গায়ে নাকি থাকবে লক্ষাধিক টাকার জড়োয়া গয়না। আসলে আমাকে পাহারা দিতে হবে তাঁর জন্যেই। কিন্তু আমার কী বিশ্বাস জানেন? কাননকুন্তলা দেবী হচ্ছেন কাল্পনিক মহিলা, সুতরাং কোনোদিনই তিনি এখানে আসবেন না।'

চন্দ্রবাবু বললেন, 'আপনার বিশ্বাস বোধহয় ভুল নয়।'

স্বপ্না বলে উঠল, 'কিন্তু ব্যাপারটা মনে হচ্ছে যেন ডাহা পাগলামি!'

চন্দ্রবাবু ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে বললেন, 'আমারও তাই মনে হয়। আমরা কোনো বিপজ্জনক পাগলের পাল্লায় পড়েছি।'

॥ চতুর্থ পরিচ্ছেদ ॥

ক

কিছুক্ষণ কেউ কোনো কথা কইলে না।

তারপর চন্দ্রবাবু আবার ঘটনার সূত্র ধরে বললেন, 'এইবারে এর পরের কথা। আগে আমার নিজের বক্তব্যই বলি। প্রায় একযুগ আগে চারুশীলা দেবী নামে এক ভদ্রমহিলার সঙ্গে আমার কিছু ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। তাঁরই কাছ থেকে এক আমন্ত্রণলিপি পেয়ে আমি এখানে এসেছি। এখন আমি বেশ আন্দাজ করতে পারছি যে ওই রকম কোনো আমন্ত্রণ-লিপি বা কোনো ওজর দেখিয়ে আপনাদেরও সবাইকে এই দ্বীপে ভুলিয়ে আনা হয়েছে। যার কথায় আজ আমরা এই ফাঁদে পা দিয়েছি, নিশ্চয়ই সে আমাদের পূর্ব-জীবনের সঙ্গে পরিচিত। সেই জন্যেই সে আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে সাহস করেছে।'

মেজর সেন ক্রুদ্ধস্বরে বললেন, 'মিথ্যা অভিযোগ—যাকে বলে একেবারে বাজে ধাপ্পা!'

স্বপ্না বললে, 'এসব অভিযোগের কোনো মানেই হয় না।'

নিত্যানন্দ প্রায় অবরুদ্ধ কণ্ঠে বললে, 'মিথ্যা কথা—রাবিশ মিথ্যা কথা! আমরা কেউই নিশ্চয়ই কোনো অপকর্ম করিনি।'

মনোতোষ গজরাতে গজরাতে বললে, 'যে এইসব অভিযোগ করেছে, সেই মিথ্যুকটা কী বলতে চায় আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

চন্দ্রবাবু হাত তুলে সবাইকে শান্ত হবার জন্যে ইঙ্গিত করলেন। তারপর ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন, 'আমি যা বলতে চাই, তা হচ্ছে এই। আমাদের অজানা বন্ধু আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন, আমি নাকি বরেন্দ্রনাথ বসুর মৃত্যুর জন্যে দায়ী। আমি তখন হাইকোর্টের জজ ছিলুম। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে আমার কোর্টে বরেন্দ্রনাথ বসুকে বিচারের জন্যে আনা হয়—সে অভিযুক্ত হয়েছিল কোনো স্ত্রীলোককে হত্যা করার জন্যে। তার পক্ষে ছিলেন একজন বিখ্যাত ব্যারিস্টার, তিনি এমন সুকৌশলে তার পক্ষ সমর্থন করলেন যে জুরিরা প্রথমটা সায় দিলেন তাঁর কথাতেই। কিন্তু প্রমাণাদি দেখে আমি বেশ বুঝতে পারলুম, বরেনই হচ্ছে অপরাধী। জুরিদের শুনিয়ে সেই সব কথা আমি যখন বললুম, তাঁরা তখন আমার কথারই সমর্থন করলেন, দোষী বলেই সাব্যস্ত হল বরেন

বসু। আমি দিলুম তাকে মৃত্যুদণ্ড। সে পরে আপিল করেছিল, কিন্তু তা বাতিল হয়ে যায়। বরেন বসুর ফাঁসি হয়। আমার সম্বন্ধে এইটুকুই বলতে পারি— আমার পক্ষে গোপন করবার কিছুই নেই। আমি মৃত্যুদণ্ড দিয়েছি এক হত্যাকারীকেই।'

ডাক্তার বোসেরও মনে পড়ে গেল আগেকার কথা। বরেন বসুর মামলা। বিচারকের রায় শুনে সকলেই অবাক হয়ে গিয়েছিল। রায় দেবার আগে বরেনের পক্ষের ব্যারিস্টার তাঁর কাছে স্পষ্ট ভাষায় বলেছিল, 'আসামি নিশ্চয়ই খালাস পাবে।' কিন্তু তার প্রাণদণ্ডের হুকুম হবার পর সে বলে, 'আসামির উপরে জজের কোনো ব্যক্তিগত আক্রোশ আছে। আইনে জজ চন্দ্রকান্ত একজন পাকা লোক, এ বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই। তিনি অবিচার করেননি বটে, কিন্তু বিচার করেছিলেন নিতান্ত নির্দয়ভাবে, সেইজন্যেই আসামি মুক্তি পেলে না।'

ডাক্তার বোস জিজ্ঞাসা করলেন, 'চন্দ্রবাবু, ওই মামলার আগে আপনি বরেন বসুকে চিনতেন?'

চন্দ্রবাবুর সরীসৃপের মতো ক্রুর দৃষ্টি ডাক্তারের মুখের উপর স্থির হয়ে রইল এক কি দুই সেকেন্ডের জন্যে। তারপর তিনি বললেন, 'না, আগে আমি তাকে চিনতুম না।'

ডাক্তার নিজের মনে মনে বললেন, লোকটা যে মিছে কথা বলছে, ওর মুখ দেখেই তা বোঝা যাচ্ছে।

খ

স্বপ্না কম্পিত স্বরে বললে, 'আমারও কিছু বক্তব্য আছে। নীরেন্দ্রনারায়ণ নামে একটি নয়-দশ বছরের বালককে লালন-পালন করবার ভার ছিল আমার উপরে। একদিন তাকে নিয়ে পুরীর সমুদ্রে আমি স্নান করতে নেমেছিলুম। সেই সময়ে আমার অজান্তেই হঠাৎই সে সাঁতার কাটতে কাটতে খানিক দূর এগিয়ে যায়। পরে তাকে দেখতে পেয়ে আমিও সাঁতার কেটে তাকে ধরবার চেষ্টা করেছিলুম বটে, কিন্তু তার নাগাল ধরতে পারিনি। নীরেন ডুবে যায়। আমার কোনোই দোষ ছিল না। করোনারও তা স্বীকার করেছিলেন। তার বাবা কুমার নরেন্দ্রনারায়ণও আমার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ করেননি। তবে এতদিন পরে আমার বিরুদ্ধে এই ভয়ানক অভিযোগ আনা হয়েছে কেন? এ অন্যায়—

অত্যন্ত অন্যায়!' বলতে বলতে তার দুই চক্ষু পূর্ণ হয়ে উঠল অশ্রুজলে।

মেজর সেন তার পিঠ চাপড়ে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে বললেন, 'কাতর হবেন না স্বপ্না দেবী! নিশ্চয় এ অভিযোগ মিথ্যা। পাগল ছাড়া আর কেউ এমন কথা বলতে পারে না। সোজা ব্যাপারকে উলটে সে দেখবার চেষ্টা করেছে বিকৃতভাবে।'

তারপরই তিনি সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে অবিচলিত কণ্ঠে বললেন, 'আমি নাকি সুরেন্দ্রনাথ পালকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে পাঠিয়ে দিয়েছি! আমাদের পরিবারের সঙ্গে সুরেনের আলাপ ছিল বটে। সে ছিল আমার স্ত্রীর দূর-সম্পর্কীয় ভাই। কিন্তু কেন জানি না, আমাকে সে দু-চক্ষে দেখতে পারত না—অবশ্য এটা আমি জানতে পেরেছিলুম পরে। আমার স্ত্রীকে সে দীর্ঘকাল ধরে গোপনে আমার বিরুদ্ধে এমন উত্তেজিত করে তুলেছিল যে, অবশেষে স্ত্রীর সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। তার কিছুদিন পরেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়, আমাকেও যেতে হয় উত্তর-আফ্রিকার রণক্ষেত্রে। সুরেন ছিল আমার অধীনে এক লেফটেন্যান্ট। একদিন খবর পাই, একদল ইতালীয় সৈন্য অতর্কিতে আমাদের আক্রমণ করবার জন্যে কোনো এক জায়গায় লুকিয়ে আছে। কয়েকজন সেপাইয়ের সঙ্গে সুরেনকে সেই খোঁজ নেবার জন্যে পাঠিয়ে দিই। তারপর সে মারা পড়ে। এ হচ্ছে যুদ্ধক্ষেত্রের সাধারণ ঘটনা, এর জন্যে আমার কোনো দায়িত্ব নেই।'

এইবারে কথা কইলে অমলেন্দু। তার চক্ষে কৌতুকের ইঙ্গিত। সে বললে, 'যে তামিল লোকগুলোর মৃত্যুর জন্যে আমাকে দায়ী করা হয়েছে—'

মনোতোষ শুধোলে, 'তামিল লোকগুলো মানে?'

অমলেন্দু হাসিমুখেই বললে, 'আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ একেবারে মিথ্যা নয়। সিংহলের বিজন অরণ্যে একবার আমরা পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম। সর্বসমেত দলে আমরা ছিলুম বাইশ জন লোক—আমি ছাড়া আর সবাই জাতে তামিল। হয়তো সেই নিবিড় অরণ্যে পথ হারিয়ে আমিও মারা পড়তুম, কারণ আমাদের সঙ্গে যে খাবার ছিল, বাইশ জন লোক মিলে খেলে তা ফুরিয়ে যেত তিন দিনেই। কাজেই লুকিয়ে সেই খাবারগুলো নিয়ে এক রাত্রে আমি সেখান থেকে সরে পড়লুম।'

মেজর সেন কঠোর কণ্ঠে বললেন, 'একুশ জন লোককে অনাহারে মৃত্যুমুখে ফেলে রেখে একলা আপনি পালিয়ে এলেন?'

অমলেন্দু কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হয়েই বললে, 'লোকালয়ে বসে আমার এই আচরণকে খুব সঙ্গত বলে মনে হবে না বটে। কিন্তু উপায় কী? আত্মরক্ষার চেষ্টা হচ্ছে জীবের স্বাভাবিক ধর্ম। পথ হারিয়ে সেই অপ্রচুর খোরাক নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে থাকলে আমাদের সকলকেই মারা পড়তে হত নিশ্চয়ই! কিন্তু পালিয়ে এসেছি বলে বেঁচে গিয়েছি আমি—বাকি সবাই হয়তো সত্য সত্যই মারা পড়েছে।'

মনোতোষ বললে, 'তাহলে আমার কথাও শুনুন। সুকুমার আর তার বোন অতসীকে দুর্ভাগ্যক্রমে একদিন আমার মোটরগাড়ির তলায় পড়ে মারা পড়তে হয়েছিল।'

চন্দ্রবাবু নীরস কণ্ঠে বললেন, 'দুর্ভাগ্যটা কার—আপনার, না তাদের?'

—'আমারও, তাদেরও; কিন্তু এ হচ্ছে আকস্মিক দুর্ঘটনা। অবশ্য এই দুর্ঘটনার ফলে আমার গাড়ি চালাবার লাইসেন্স এক বছরের জন্য বাতিল করা হয়েছিল বটে।'

গ

নিত্যানন্দ বাধো বাধো গলায় বললে, 'আমি কি দু-একটা কথা বলতে পারি?'

চন্দ্রবাবু বললেন, 'নিশ্চয়ই বলতে পারো।'

নিত্যানন্দ বললে, 'আমাকে আর আমার স্ত্রীকে দায়ী করা হয়েছে নিস্তারিণী দেবীর মৃত্যুর জন্যে। নিস্তারিণী দেবীর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর, আত্মীয়স্বজন বলতে তাঁর কেউ ছিল না। তাঁর পরিচর্যার ভার ছিল আমাদের দুজনেরই উপরে। তাঁর স্বাস্থ্য একেবারেই ভালো ছিল না, তিনি বাস করতেন তাঁর মফস্সলের বাড়িতে। এক রাত্রে হঠাৎ তাঁর ভীষণ জ্বর হয়—জ্বরের মাত্রা ১০৪ ডিগ্রি ছাড়িয়ে যায়। সে-এক বিষম দুর্যোগের রাত, প্রবল ঝড়ের সঙ্গে এসেছিল প্রচণ্ড বন্যা। সে গ্রামে ডাক্তার ছিল না, ডাক্তার থাকতেন ভিন্ন গ্রামে, প্রায় আট মাইল দূরে। তবুও আমি সেই ঝড়-বৃষ্টি-বন্যার ভিতরেই পায়ে হেঁটে ডাক্তারের বাড়ি যাবার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করি, কিন্তু আমার চেষ্টা সফল হয়নি। নিস্তারিণী দেবী মারা যান শেষ রাত্রে।'

মহেন্দ্র কতকটা ব্যঙ্গভরা কণ্ঠে বলল, 'নিস্তারিণী দেবী পরলোকে যান, ইহলোকে ফেলে অল্পবিস্তর সম্পত্তি, কী বলো নিত্যানন্দ?'

নিত্যানন্দ বললে, 'নিস্তারিণী দেবী বেঁচে থাকতেই আমাদের তাঁর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করে গিয়েছিলেন। এ জন্যে কেউ কোনোই অভিযোগ করতে পারে না। পুলিশও অভিযোগ করেনি।'

অমলেন্দু বললে, 'মহেন্দ্রবাবু, অভিযুক্তদের তালিকায় আপনার নামও আছে।'

মহেন্দ্র বললেন, 'হ্যাঁ, জানি, আমার জন্যেই নাকি জ্যোতির্ময় মারা পড়েছে। জ্যোতির্ময় ছিল একদল ডাকাতের দলপতি। সদলবলে সে এক ব্যাঙ্কের ওপর গিয়ে হানা দেয়। তারই রিভলভারের গুলিতে মারা পড়ে ব্যাঙ্কের দারোয়ান, কিন্তু পালাবার আগেই পুলিশের হাতে সে ধরা পড়ে। তখন আমি গোয়েন্দা-বিভাগে, এই মামলাটা পড়ে আমার হাতেই। তদন্ত করে আমি যে রিপোর্ট দিই, সেই অনুসারেই জ্যোতির্ময়ের হয় মৃত্যুদণ্ড। আমি নিজের কর্তব্যপালন ছাড়া আর কিছুই করিনি।'

অমলেন্দু খিলখিল করে হেসে উঠে বললে, 'ওঃ, এখানে আমি ছাড়া আর সকলেই কী কর্তব্যপরায়ণ! তারপর ডাক্তারবাবু, এখনও আপনার কথা শোনা হয়নি। কর্তব্যপালন করতে গিয়ে আপনিও কি কোনোদিন বেহিসেবি কাজ করে ফেলেননি? লতিকা রায়চৌধুরি মারা পড়েছেন কেন?'

ডাক্তার কিছুমাত্র অপ্রস্তুত হলেন না, বেশ শান্তস্বরেই বললেন, 'ভালো করে আমার কিছুই মনে পড়ছে না। অভিযোক্তার মতে, ঘটনাটা ঘটেছিল বিশ বৎসর আগে। লতিকা দেবী কে? জীবনে শতশত রোগী দেখেছি, এতদিন পরে লতিকা দেবীকে আমি স্মরণ করতে পারছি না। আমি হচ্ছি সার্জন, খুব সম্ভব অস্ত্রোপচারের ফলে লতিকা নামে কোনো নারী মারা পড়ে। এসব ক্ষেত্রে চিকিৎসককে দায়ী করাই হচ্ছে সাধারণ লোকের স্বভাব। এ ছাড়া আমার আর কিছুই বলবার নেই।'

কিন্তু তিনি নিজের মনে মনে বললেন, লতিকার নাম এ জীবনে আমি ভুলতে পারব না। তখন মদ্যপান করতুম। সেদিন অস্ত্রোপচারের সময়ে আমি ছিলুম বেহেড মাতাল। আমার হাত এত কাঁপছিল যে, ভালো করে ছুরিই ধরতে পারছিলুম না। হয়তো আমার দোষেই লতিকা মারা পড়েছে। কিন্তু বিশ বৎসর আগেকার সেই দুঃস্বপ্ন, আজ এতদিন পরে আবার আমার সামনে টেনে আনতে চেয়েছে কে?

ঘ

প্রত্যেকেরই বক্তব্য শেষ হল, কেবল সৌদামিনী দেবী ছাড়া। সকলে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাতে লাগল তাঁর মুখের দিকে।

সৌদামিনী দুই ভুরু কুঁচকে বললেন, 'আপনারা কি আমার মুখ থেকেও কিছু শুনতে চাইছেন? আমার কোনো বক্তব্যই নেই।'

চন্দ্রবাবু বললেন, 'কোনো বক্তব্যই নেই?'

—'কিছু না।'

—'আপনি কি এর পরে আত্মপক্ষ সমর্থন করবেন?'

—'আমি কোনো পক্ষই সমর্থন করব না। আমি যখনই যা করেছি, নিজের বিবেক-বুদ্ধি অনুসারেই করেছি। আমার মনে কোনো পাপ নেই।' সৌদামিনীর ওষ্ঠ ও অধর দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত হল পরস্পরের সঙ্গে।

চন্দ্রবাবু দু-তিন বার কেশে নিজের কণ্ঠকে আবার পরিষ্কার করে নিলেন। তারপর বলেন, 'আপাতত, আমাদের তদন্ত এইখানেই শেষ হল। নিত্যানন্দ, এই দ্বীপে আমরা ছাড়া আর কেউ আছে?'

—'কেউ না, একেবারেই কেউ না।'

চন্দ্রবাবু গলা আর-একটু তুলে বলেন, 'কোনো এক অজ্ঞাত ব্যক্তি কী জন্যে আমাদের এখানে আমন্ত্রণ করে এনেছে, তা কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। তবে তার মস্তিষ্ক যে বিকৃত, এ-বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই! হয়তো সে হচ্ছে অত্যন্ত বিপজ্জনক ব্যক্তি। আমার মত হচ্ছে, অবিলম্বেই এই দ্বীপ ত্যাগ করা উচিত। আজ রাত্রেই।'

নিত্যানন্দ বললে, 'কিন্তু হুজুর, কীসে করে যাবেন? সেই মোটরলাঞ্চ আর বোট দুখানাই এখান থেকে চলে গিয়েছে। শুনেছি, ইব্রাহিম কালকেই আবার এই দ্বীপের মালিককে নিয়ে ফিরে আসবে।'

—'তাহলে আমাদের কাল পর্যন্তই অপেক্ষা করতে হবে।'

মনোতোষ ছাড়া আর-সকলেই সায় দিলে এই প্রস্তাবে।

মনোতোষ বললে, 'সেটা হবে কাপুরুষের কাজ। এখান থেকে চলে যাবার আগে সমস্ত রহস্যটা আমি তলিয়ে বুঝতে চাই। ব্যাপারটা হয়ে উঠেছে ঠিক যেন ডিটেকটিভ গল্পের মতো। অত্যন্ত রোমাঞ্চকর!'

চন্দ্রবাবু তিক্তস্বরে বললেন, 'আমার এই বয়সে রোমাঞ্চকর কিছু নিয়ে মাথা ঘামাতে আমি রাজি নই।'

মনোতোষ উঠে দাঁড়িয়ে উৎফুল্ল কণ্ঠে বললে, 'আপনি হচ্ছেন বৃদ্ধ, আমি হচ্ছি যুবক, আমি চাই জীবন—রোমাঞ্চকর ঘটনাচঞ্চল বেগবান জীবন!'

তারপর সে এগিয়ে গেল জানালার সামনের টেবিলটার দিকে। একটি গেলাসে ঢালা ছিল খানিকটা লেমোনেড। মনোতোষ গেলাসটা তুলে নিয়ে ঊর্ধ্বমুখে এক নিশ্বাসে সমস্ত জলটাই পান করে ফেললে। সঙ্গে সঙ্গে আচম্বিতে তার দম যেন বন্ধ হয়ে গেল, সমস্ত মুখখানা হয়ে উঠল রক্তবর্ণ। সে জোর করে নিশ্বাস টানবার চেষ্টা করলে এবং পরমুহূর্তেই তার দেহ আর হাতের গেলাসটা মাটির উপরে আছড়ে পড়ল সশব্দে।

॥ পঞ্চম পরিচ্ছেদ ॥

ক

ঘটনাটা ঘটে গেল অত্যন্ত আচমকা। সকলেই শ্বাস রোধ করে নির্বোধের মতো মনোতোষের ভূপতিত দেহটার দিকে তাকিয়ে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল!

তারপর ডাক্তার বোস তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে নিশ্চেষ্ট দেহটার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন। মনোতোষের বুকের উপরে একবার হাত রেখে বিভ্রান্ত চোখে সভয়ে প্রায় অবরুদ্ধ স্বরে বলে উঠলেন, 'ভগবান! এ দেহে যে জীবনের কোনো লক্ষণই নেই!'

কেউ যেন সে কথা বিশ্বাসই করতে পারলে না। জীবনের কোনো লক্ষণই নেই? মৃত? মূর্তিমন্ত তরুণ যৌবনের মতো মনোতোষ, অমন স্বাস্থ্য-সবল আদর্শ দেহ, এমন আচম্বিতে এত স্বল্প সময়ের মধ্যে তার মৃত্যু হতে পারে কখনো?

না, বিশ্বাস করা অসম্ভব। ডাক্তার বোস মৃতের উপরে করলেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত। তারপর তার হাতের আধভাঙা গেলাসটা তুলে নিয়ে পরীক্ষা করতে লাগলেন।

মেজর সেন শুধোলেন, 'মৃত? আপনি কি বলতে চান মনোতোষবাবুর দম বন্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে?'

ডাক্তার বললেন, 'শ্বাস রোধ হওয়ার ফলে মনোতোষবাবু মারা পড়েছেন।'

তিনি খুব সাবধানে গেলাসের ভিতরে যে কয়েক ফোঁটা পানীয় ছিল, আঙুলে করে তা তুলে নিয়ে একবার দেখলেন। সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেল তাঁর মুখের ভাব!

মেজর সেন বললেন, 'কোনো মানুষ যে এমনভাবে মারা পড়তে পারে আমার তা জানা ছিল না।'

সৌদামিনী বললেন, 'জীবনের মধ্যেই আমরা পাই মৃত্যুর আলিঙ্গন।'

ডাক্তার উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'না, এমনভাবে বিষম লেগে হঠাৎ মানুষ মারা পড়তে পারে না। মনোতোষবাবুর স্বাভাবিক মৃত্যু হয়নি।'

স্বপ্না প্রায় চুপি চুপি বললে, 'তাহলে ওই গেলাসের ভিতরে কি বিষটিষ কিছু ছিল?'

ডাক্তার মাথা নেড়ে বললেন, 'হ্যাঁ, তবে নিশ্চয় করে কিছু বলতে পারি না। মনে হচ্ছে 'সায়ানাইড'। প্রুসিক অ্যাসিডের স্পষ্ট গন্ধ নেই, সম্ভব পোটাসিয়াম সায়ানাইড। মুহূর্তের মধ্যে কাজ করে।'

চন্দ্রবাবু তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন, 'বিষ কি গেলাসের ভিতরে ছিল?'

—'হ্যাঁ।'

অমলেন্দু বললে, 'আপনি কি বলতে চান, গেলাসের ভিতরে বিষ রেখেছিলেন মনোতোষবাবু নিজেই?'

—'তা ছাড়া আর কী বলব?'

মহেন্দ্র বললে, 'আত্মহত্যা? আশ্চর্য!'

স্বপ্না থেমে থেমে বললে, 'মনোতোষবাবু যে আত্মহত্যা করেছেন, এ কথা ভাবতেই পারা যায় না। তাঁর কথাবার্তা, ভাবভঙ্গির ভিতরে ছিল জীবনের প্রবল উচ্ছ্বাস। পৃথিবী ছিল তাঁর কাছে পরম উপভোগ্য।'

ডাক্তার বললেন, 'কিন্তু এখানে আত্মহত্যা ছাড়া আর কোনো কিছুর কথা মনে ওঠে কি?'

সকলেই মাথা নাড়লে। ঘরের ভিতরে বাইরের কোনো লোকই আসেনি, সকলেই স্বচক্ষে দেখেছে যে, মনোতোষ নিজেই গেলাসটা তুলে নিয়ে লেমোনেডটা পান করেছে। গেলাসের মধ্যে যদি 'সায়ানাইডের' অস্তিত্ব থাকে, তাহলে তার জন্যে মনোতোষ ছাড়া আর কেউই দায়ী হতে পারে না।

কিন্তু—কিন্তু মনোতোষ আত্মহত্যা করবে কেন?

মহেন্দ্র বললে—চিন্তিতভাবেই বললে, 'ডাক্তার আপনার কথা কিন্তু আমার মনে ঠিক লাগছে না। আত্মহত্যা করার দিকে যে শ্রেণির লোকের ঝোঁক থাকে, মনোতোষবাবুকে দেখলে সে শ্রেণির লোক বলে মনে হয় না।'

ডাক্তার বললেন, 'আমিও আপনার কথাই মানি। এ হচ্ছে অদ্ভুত রহস্য!'

খ

ডাক্তারের সঙ্গে অমলেন্দু মনোতোষের অসাড় দেহটাকে ধরাধরি করে তুলে নিয়ে গিয়ে রেখে এল তার শয়নগৃহে।

তারা যখন ফিরে এল, প্রত্যেকেই তখন দাঁড়িয়ে উঠেছে। রাত্রি ঠান্ডা নয়, কিন্তু দেখলে মনে হয় প্রত্যেকেরই দেহ যেন শীতার্তের মতোই কম্পমান।

সৌদামিনী বললেন, 'রাত হল, এখন আমাদের ঘুমুতে যাওয়া উচিত।' বড়ো ঘড়িটার দিকে সবাই তাকিয়ে দেখলে। বেজে গেছে রাত বারোটা। সৌদামিনীর কথায় সবাই মনে মনে সায় দিল বটে, কিন্তু কেউই যেন দল ছাড়া হতে প্রস্তুত নয়। তারা কেউ যেন শয়নগৃহে গিয়ে একলা হতে চায় না। কিন্তু চন্দ্রবাবু দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, 'আমাদের সকলেরই এখন খানিকটা ঘুমের দরকার।' বলে তিনি নিজেই অগ্রসর হলেন।

আর-সকলে তখন তাঁর পিছনে পিছনে অগ্রসর হতে লাগল।

নিঝুম রাত্রি। দূর থেকে সমুদ্রের তরঙ্গ-কোলাহল ছাড়া আর কোনো শব্দই ভেসে আসছে না। প্রত্যেকের পায়ের চাপে কাঠের সিঁড়িটা যেন আর্তনাদ করে ভেঙে দিতে লাগল বাড়ির ভিতরকার স্তব্ধতা। কোণে কোণে দেখা যাচ্ছে কালো কালো ছায়া, দেখলেই ছাঁৎ ছাঁৎ করে ওঠে মন। কিন্তু এ হচ্ছে একেবারে আধুনিক বাড়ি—শক্তিশালী পেট্রোলের ল্যাম্পের আলোকপ্রবাহে সমুজ্জ্বল। কোথাও লুকোচুরির কোনো জায়গাই নেই। তবু একটা অপার্থিব ভাব মনকে দিতে চায় আচ্ছন্ন করে এবং এইটেই হচ্ছে সবচেয়ে ভয়াবহ!

গ

ভূতপূর্ব জজ নিজের শয়নগৃহে প্রবেশ করে আগে করলেন জামাকাপড় পরিবর্তন।

সোফার উপরে তিনি তাঁর পাইপে তামাক ভরে অগ্নিসংযোগ করলেন।

তাঁর চোখের সামনে জেগে উঠল আসামি বরেন বসুর মূর্তি—যার ফাঁসি হয়েছিল তাঁরই হুকুমে।

তাঁর স্পষ্ট মনে আছে বরেন বসুর চেহারা। দেখতে ছিল সে সুপুরুষ। আর তার সেই সপ্রতিভ, অকপট দুটি চোখ। অত্যন্ত সরলভাবে সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে সে প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিল একটুও সঙ্কুচিত না হয়ে। সেই জন্যেই জুরিরা তার পক্ষপাতী হয়ে পড়েছিল। কিন্তু তিনি পুরাতন ব্যবহারজীবী—আগে ছিলেন বিখ্যাত ব্যারিস্টার, তারপর হয়েছিলেন জজ। জীবনে অসংখ্য অপরাধীর সঙ্গে পরিচয় হয়েছে তাঁর, সুন্দর সরল মুখ দেখে ভোলবার পাত্র নন তিনি।

তিনি দিয়েছিলেন তাকে প্রাণদণ্ড, আইনের দিক দিয়ে তা কিছুমাত্র অসঙ্গত হয়নি।

মনে মনে তিনি মৃদুহাস্য করলেন। তারপর জলভরা গেলাসের ভিতরে নিজের বাঁধানো দাঁতের পাটি খুলে রেখে দিলেন। তাঁর মুখের নীচের দিকটা চুপসে গেল। অতিশয় নিষ্ঠুর দেখাতে লাগল তাঁর মুখের নীচের দিকটা। আবার হাসতে হাসতে মৃদুস্বরে তিনি বললেন, 'বরেনের প্রাণদণ্ড দিয়েছি, বেশ করেছি!' তারপর সোফা থেকে উঠে আলো নিবিয়ে শয্যায় গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করলেন।

ঘ

নীচেকার হলঘরে তখনও দাঁড়িয়ে ছিল মহেন্দ্র। তাকে দেখাচ্ছিল হতভম্বের মতো।

এক কোণে টেবিলের উপরে যেখানে তথাকথিত হারাধনের ছেলের মূর্তিগুলো ছিল, সেইদিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ করে তার চোখ দুটো হয়ে উঠেছে বিস্ফারিত।

সে অস্ফুট স্বরে বললে, 'এ আবার কী কাণ্ড! আমি হলপ করে বলতে পারি, এখানে একটু আগে ছিল ঠিক দশটা পুতুল!'

ঙ

মেজর সেনের চোখে ঘুম নেই—বিছানায় শুয়ে এপাশ-ওপাশ করছিলেন তিনি।

আলোকহীন অন্ধকার ঘর—কিন্তু সেই অন্ধকারেও তাঁর চোখের সামনে জেগে উঠেছে সুরেন্দ্রনাথ পালের মূর্তি।

প্রথমটা তিনি সুরেনকে পছন্দ করতেন। কিন্তু স্ত্রীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হবার পর যখন তিনি জানতে পারলেন যে, এই পারিবারিক দুর্ঘটনার মূলে ছিল সুরেনেরই চক্রান্ত, তখন তার নাম মনে করলেও তাঁর মন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠত দারুণ ক্রোধে।

তারপর উত্তর-আফ্রিকার সেই যুদ্ধক্ষেত্রের কথা। হ্যাঁ, সুরেন যে আর জীবন নিয়ে ফিরে আসতে পারবে না, সেটা ভালো করে জেনেই তিনি তাকে পাঠিয়েছিলেন শত্রুদের বিরুদ্ধে। কেন পাঠাবেন না? তার জঘন্য চক্রান্তের ফলেই ছারখার হয়ে গিয়েছে তাঁর সংসার, বিষময় হয়ে উঠেছে তাঁর জীবন। সে-রকম নিকৃষ্ট জীবকে পৃথিবী থেকে লুপ্ত করে দিলে মানুষের উপকার করাই হয়।

সেই সময়ে ফৌজের কোনো কোনো লোক তাঁকে সন্দেহ করেছিল। কানা-ঘুষায় তিনি শুনলেন, সুরেনের মৃত্যুর জন্য দায়ী করা হয়েছে তাঁকেই। কিন্তু সে-খবর তো ফৌজের বাইরের আর কারুর জানবার কথা নয়। সুদীর্ঘ দশ বৎসর আগেকার কথা, আজ আবার নতুন করে ওঠে কেন?

চ

বিনিদ্র স্বপ্নাও বিস্ফারিত নেত্রে তাকিয়ে আছে কড়িকাঠের দিকে।

ঘরের আলো জ্বলছে। অন্ধকারে থাকতে তার ভয় করে।

সে ভাবছে : নীরেন্দ্রনারায়ণ, নীরেন্দ্রনারায়ণ! আজ রাত্রে কেন আমার মনে হচ্ছে, তুমি আবার আমার খুব কাছে এসে দাঁড়িয়েছ? সাগর-সমাধি ছেড়ে কেন তুমি আবার উঠে এসেছ?

সেদিন চোখের সামনে দেখলুম, তলিয়ে গেলে তুমি অতল জলে! ভেবেছিলুম তোমার স্মৃতিটুকু পর্যন্ত আর আমার মনকে পীড়া দিতে পারবে না।

আবার—তুমি কে? কুমার নরেন্দ্রনারায়ণ? তুমিও কি তোমার হারা ছেলেকে খুঁজতে এসেছ এখানে?

লোকে কী বলে শুনেছিলে তো? আমার কাছে তুমি করেছিলে বিবাহের প্রস্তাব। আমিও রাজি হয়েছিলুম। তার অল্পদিন পরেই নীরেন্দ্রনারায়ণ জলে ডুবে মারা যায়। শুনেছি কেউ কেউ সন্দেহ করেছিল যে, যাতে সে তোমার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়, সেই উদ্দেশ্যেই আমি ইচ্ছা করেই সমুদ্রের কবল থেকে উদ্ধার করিনি তাকে।

তুমিও কি এইসব কথা শুনেছিলে? শুনে কি বিশ্বাস করেছিলে? জানি না।

জানবার অবসরও আর পাইনি। তোমার সঙ্গে আমার বিবাহও হয়নি। কারণ পুত্রশোকে তুমি যে শয্যা নিলে, সেই শয্যাই হল তোমার মৃত্যুশয্যা।

॥ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ॥

ক

পরদিনের প্রভাত। জানলা দিয়ে ঘরের ভিতরে এসে পড়েছে খানিকটা সূর্যালোক।

ডাক্তার বোস বিছানার উপর উঠে বসেই শুনতে পেলেন, বাইরের থেকে সজোরে দরজা ঠেলতে ঠেলতে নিত্যানন্দ ডাকছে, 'ডাক্তারবাবু, ডাক্তারবাবু!'

তাড়াতাড়ি খাট থেকে নেমে দরজা খুলে দিয়ে তিনি বললেন, 'ব্যাপার কী নিত্যানন্দ?'

নিত্যানন্দ কাঁপতে কাঁপতে বললে, 'ডাক্তারবাবু, আমার স্ত্রীর কী হয়েছে! আমি তাকে জাগাতে পারছি না। আমি তাকে কিছুতেই জাগাতে পারছি না!'

শীঘ্রহস্তে একটা জামা পরে নিয়ে নিত্যানন্দের সঙ্গে ডাক্তার তার ঘরে গিয়ে হাজির হলেন।

বিছানায় শুয়ে আছে সত্যবালা। ডাক্তার তার মাথার উপরে হাত রাখলেন। অস্বাভাবিক কনকনে ঠান্ডা! মিনিটখানেক পরীক্ষার পর ডাক্তার ফিরে দাঁড়ালেন।

সন্দিগ্ধস্বরে নিত্যানন্দ থেমে থেমে বললেন, 'তবে কি—তবে কি—'

ডাক্তার ঘাড় নেড়ে বললেন, 'হ্যাঁ। তোমার স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে!'

—'তাহলে কি ওর হার্টফেল করেছে?'

—'তোমার স্ত্রীর কি বুকের কোনো অসুখ ছিল?'

—'কই, আমি তো কখনো শুনিনি।'

—'কাল রাত্রে ঘুমোবার আগে তোমার স্ত্রী কী খেয়েছিল?'

—'কিছু না। আপনি যে ওষুধ দিয়েছিলেন, তারপরে আর কিছুই খায়নি।'

খ

বৈঠকখানায় আসন গ্রহণ করে চন্দ্রবাবু ও মেজর সেন দেশের বর্তমান

রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করছিলেন। অমলেন্দু, মহেন্দ্র ও স্বপ্না সকলেই উঠে গিয়েছিল বাড়ির বাইরে। ফিরে এসে তারা তিন জনেও গিয়ে বসল, বৈঠকখানায়।

সৌদামিনী এতক্ষণ পরে উপরে থেকে নেমে এসে শুধোলেন, 'মোটরলাঞ্চখানা ফিরে এসেছে কি?'

স্বপ্না বললে, 'না।'

ডাক্তার ঘরের ভিতরে ঢুকে বললেন, 'চা আর খাবার তৈরি করে নিত্যানন্দ এখনই আপনাদের ডাকবে। আজ তার কাজে কিছু গলদ হলে আপনারা যেন কিছু মনে করবেন না।'

সৌদামিনী বললেন, 'তার মানে?'

—'আগে আমাদের চা-টা খাওয়া হয়ে যাক, তারপর কারণ কী শুনবেন।'

কেউ আর কিছু বললে না। এমন সময়ে নিত্যানন্দ একটা দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলল, 'আপনাদের চা প্রস্তুত। অনুগ্রহ করে খাবার ঘরে চলুন।' তার মুখ সম্পূর্ণ ভাবহীন।

চা-পানের পর সবাই আবার বৈঠকখানায় এসে আসন গ্রহণ করলে।

ডাক্তার বললেন, 'এইবারে আপনাদের একটা কথা বলা দরকার। সত্যবালা কাল রাত্রে ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই মারা পড়েছে।'

সকলেই চমকে অস্ফুট শব্দ করে উঠল।

স্বপ্না আর্তকণ্ঠে বললে, 'কী ভয়ানক! আবার মৃত্যু? এক দিনে দুই জনের মৃত্যু?'

চন্দ্রবাবু বললেন, 'অসাধারণ ব্যাপার বটে। সত্যবালার মৃত্যুর কারণ কী?'

ডাক্তার বললেন, 'শবব্যবচ্ছেদ না করলে তা বলা সহজ নয়।'

স্বপ্না বললে, 'সত্যবালাকে দেখেই আমি বুঝেছিলুম, তার স্বাস্থ্য ভালো নয়। কালকেই সেই দুর্ঘটনার জন্যে হয়তো তার হার্টফেল করেছে।'

ডাক্তার বললেন, 'তার হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হয়েছে, কিন্তু কী জন্য তা বন্ধ হয়েছে সেইটেই এখন বিবেচ্য।'

সৌদামিনী বললেন, 'বিবেক!'

ডাক্তার তাঁর দিকে ফিরে বললেন, 'আপনার কথার অর্থ কী সৌদামিনী দেবী?'

সৌদামিনী বললেন, ‘আপনারা সবাই তো শুনেছেন! নিস্তরিণী দেবীর মৃত্যুর জন্যে দায়ী সে আর তার স্বামী।’

—‘আপনিও তাই মনে করেন নাকি?’

—‘হ্যাঁ। আমি এই অভিযোগ সত্য বলেই মনে করি। অভিযোগের কথা শুনেই সে ভয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। সেই ভয় সামলাতে না পেরেই তার হার্ট ফেল করেছে। এ হচ্ছে ভগবানের বিচার।’

চন্দ্রবাবু বললেন, ‘ভগবান বিচার করেন মানুষের সাহায্যেই। কিন্তু এখানে এমন কে মানুষ থাকতে পারে?’

মহেন্দ্র বললেন, ‘ঘুমোবার আগে সত্যবালা কী খেয়েছে, আর কী পান করেছে?’

ডাক্তার বললেন, ‘কিছু না।’

—‘কিছু না? এক পেয়ালা চা? এক গেলাস জল? নিশ্চয়ই সে কিছু না কিছু খেয়েছে?’

‘নিত্যানন্দ বলে, ঘুমোবার আগে কাল সে কিছুই খায়নি বা পান করেনি।’

কতকটা ব্যঙ্গের স্বরে মহেন্দ্র বললে, ‘ওঃ নিত্যানন্দ! সে তো বলবেই এ কথা!’

অমলেন্দু বললে, ‘মহেন্দ্রবাবু, আপনি কি নিত্যানন্দকেই সন্দেহ করেন?’

—‘কেন করব না? কাল আমরা সবাই শুনেছি সেই অভিযোগের কথা। হতে পারে তা অমূলক, হতে পারে তা পাগলের প্রলাপ! কিন্তু, হতেও পারে তা সত্য কথা। সত্যবালা স্ত্রীলোক, অভিযোগ শুনেই মূর্ছিত হয়ে পড়েছিল। নিত্যানন্দের মনে এই ভয় হওয়া স্বাভাবিক যে, শেষ পর্যন্ত সত্যবালা হয়তো সব কথা ফাঁস করে দেবে। তারপর—বুঝতেই পারছেন তো? নিজের গলা বাঁচাবার জন্যে সে তার স্ত্রীর মুখ চিরদিনের জন্যে বন্ধ করে দিয়েছে।’

এমন সময় ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়াল নিত্যানন্দ।

মেজর সেন বললেন, ‘তোমার স্ত্রী মৃত্যুর কথা শুনে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছি!’

নিত্যানন্দ কেবল নিজের কপালে হাত দিয়ে বললে, ‘অদৃষ্ট!’

আর সবাই চুপ করে রইল!

গ

বাড়ির বাইরেকার চত্বরে দাঁড়িয়েছিল অমলেন্দু ও মহেন্দ্র।

অমলেন্দু বললে, 'এই মোটরলাঞ্চ—' বলতে বলতে সে থেমে গেল।

মহেন্দ্র বললে, 'আপনি কী ভাবছেন, আমি বুঝতে পেরেছি। আমারও মনে জেগেছে ওই প্রশ্ন। এতক্ষণে লাঞ্চখানার এখানে আসা উচিত ছিল। কিন্তু তা আসেনি। কেন?'

অমলেন্দু বললে, 'ওই প্রশ্নের কোনো উত্তর পেয়েছেন?'

—'আমার মতে লাঞ্চখানা না-আসা কোনো দৈব ঘটনা নয়।'

—'অর্থাৎ আপনি বলতে চান, লাঞ্চখানা আর আসবে না?'

পিছন থেকে অধীর কণ্ঠে শোন গেল—'না, না। মোটরলাঞ্চ আর ফিরে আসবে না!'

দুজনেই একসঙ্গে ফিরে দাঁড়িয়ে দেখলে, মেজর সেন।

মহেন্দ্র বললে, 'মেজরসাহেব, আপনারও তাই বিশ্বাস?'

মেজর সেন গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'নিশ্চয়ই তা আসবে না। আমরা সেখানাকে চাই এই দ্বীপ থেকে প্রস্থান করবার জন্যে। কেমন? কিন্তু এই দ্বীপ থেকে আর কোনোদিনই আমরা চলে যেতে পারব না। যতক্ষণ বেঁচে আছি, এই দ্বীপেই আমাদের থাকতে হবে।' বলতে বলতে তিনি হনহন করে এগিয়ে চললেন একদিকে। সেই দিকে সিধে এগিয়ে গেলে পাওয়া যাবে সমুদ্রতীর।

তাঁর এলোমেলো গতি দেখলে মনে হয়, তিনি যেন অগ্রসর হচ্ছেন অর্ধ-জাগ্রত অবস্থায়।

মহেন্দ্র খানিকক্ষণ সেইদিকে তাকিয়ে থেকে চিন্তিতমুখে বললে, 'আর-একজনেরও মাথা খারাপ হবার উপক্রম হয়েছে। শেষ পর্যন্ত হয়তো আমাদের সকলেরই অবস্থা হবে ওই রকম।'

অমলেন্দু বললে, 'কিন্তু আপনার মাথা ঠিকই থাকবে বলে মনে হচ্ছে।'

গোয়েন্দা বিভাগের ভূতপূর্ব কর্মচারী মহেন্দ্র আনন্দহীন হাস্য করে বললে, 'প্রচুর কাঠ-খড় না পুড়লে আমার মাথা খারাপ হবে না। আর আমার মনে হচ্ছে, আপনার সম্বন্ধেও যেন ওই-কথাই বলা যায়।'

অমলেন্দু বললে, 'অন্তত এখনও পর্যন্ত আমি পাগল হইনি।'

ঘ

চত্বরে এসে দাঁড়ালেন ডাক্তার বোস—তাঁর পিছনে পিছনে নতমস্তকে চন্দ্রবাবু।

মহেন্দ্র ও অমলেন্দুর দিকে এগিয়ে ডাক্তার কী বলতে উদ্যত হয়েছেন, এমন সময়ে দ্রুতপদে সেখানে এসে নিত্যানন্দ বললেন, 'আমার একটা কথা শুনবেন কি?'

ডাক্তার ফিরে দাঁড়ালেন। কিন্তু নিত্যানন্দের মুখ দেখেই তাঁর দৃষ্টি হয়ে উঠল সচকিত। সে মুখ মড়ার মতো সাদা, থরথর করে কাঁপছে আর সর্বাঙ্গ! নিত্যানন্দ বললে, 'আপনারা দয়া করে একবার বৈঠকখানায় চলুন। আপনাদের একটা ব্যাপার দেখাতে চাই।'

সকলে আবার বৈঠকখানায় গিয়ে দাঁড়াল।

ডাক্তার বললেন, 'নিত্যানন্দ, তুমি অত কাঁপছ কেন? হয়েছে কী?'

নিত্যানন্দ ভয়ার্তস্বরে বললে, 'এই বাড়ির ভিতরে এমন সব ব্যাপার হচ্ছে, যার মানে আমি বুঝতে পারছি না!'

—'ব্যাপার? কী ব্যাপার?'

—'আপনারা হয়তো আমাকে পাগল বলে ভাববেন! কিন্তু এই ব্যাপারের কোনো অর্থই আমি খুঁজে পাচ্ছি না!'

—'আরে বাপু, আসল কথা কী, তাই বলো?'

নিত্যানন্দ বললে, 'ওই টেবিলের মাঝখানে কালকে দশটা পুতুল দাঁড় করানো ছিল। আমি স্বচক্ষে দেখেছি। ঠিক দশটা!'

ডাক্তার বললেন, 'হ্যাঁ, দশটা পুতুলই ছিল বটে। কাল আমরাও তা গুনে দেখেছিলুম।'

নিত্যানন্দ বললেন, 'তাহলে শুনুন। কাল রাত্রে আপনারা উপরে যাবার পর আমি যখন ঘরের জানলা-দরজা বন্ধ করছিলুম, টেবিলের উপরে তখন দেখছিলুম মোটে নয়টা পুতুল। কিন্তু আবার এখন কী দেখছি জানেন? যদি বিশ্বাস না করেন, নিজেরাই গুনে দেখুন।'

—'এখানে রয়েছে মাত্র আটটা পুতুল! মাত্র আটটা! এর কি কোনো মানে হয়? মাত্র আটটা?'

॥ সপ্তম পরিচ্ছেদ ॥

ক

সৌদামিনী বললেন, 'স্বপ্না, চলো আমরা একটু বেড়িয়ে আসি।'

স্বপ্না আপত্তি করলে না। তারা দুজনে বাড়ি থেকে বেরিয়ে দ্বীপের একদিকে অগ্রসর হল। খানিক পরেই তারা একেবারে জলের ধারে গিয়ে দাঁড়াল।

সৌদামিনী বললেন, 'মোটরলাঞ্চ এখনও আসেনি দেখছি।'

স্বপ্না বললে, 'এলে আমি বাঁচতুম। আমি—আমি এখান থেকে চলে যেতে চাই।'

সৌদামিনী বললেন, 'আমরা সকলেই যে এখান থেকে চলে যেতে চাই, সে বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই।' একটু থেমে তিনি আবার বললেন, 'যে চিঠিখানা লিখে আমাকে এখানে আসবার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল, এখন মনে হচ্ছে তার কোনো কোনো জায়গায় গলদ ছিল। তখন বুঝতে পারিনি, এখন বুঝতে পারছি। আমার এখানে আসা উচিত হয়নি।'

স্বপ্না বললে, 'সকালে আপনি যা বলেছিলেন, সেটা কি আপনার মনের কথা?'

—'কোন কথা?'

—'আপনি কি সত্যিই বিশ্বাস করেন যে, সত্যবালার মৃত্যুর জন্য নিত্যানন্দই দায়ী?'

—'হ্যাঁ, আমি তাই বিশ্বাস করি। তোমার কী মত?'

—'আমার মতামত কিছুই নেই।'

সৌদামিনী সমুদ্রের উপর দিয়ে দৃষ্টিচালনা করে বললেন, 'মনে করে দ্যাখো, অভিযোগ শুনেই সত্যবালা কীভাবে মূর্ছিত হয়ে পড়ে। নিত্যানন্দের হাত থেকেও কফির ট্রে পড়ে গিয়েছিল, এটাও ভুলো না। ওরা যে অপরাধী, এ-কথা অনুমান করা যায় খুব সহজেই। নিস্তারিণী দেবীর সম্পত্তির লোভেই ওরা সেই অপরাধ করেছিল।'

—'কিন্তু আর-সকলের সম্বন্ধে আপনার মত কী?'

—'মানে?'

—'আর-সকলের বিরুদ্ধেও যেসব অভিযোগ করা হয়েছে তা যদি মিথ্যা হয়, তাহলে নিত্যানন্দের বেলাতেই বা তা সত্য হবে কেন?'

সৌদামিনী বললেন, 'ওঃ, তুমি যা বলতে চাও বুঝতে পেরেছি। আচ্ছা, প্রথমে অমলেন্দুবাবুর কথাই ধরো। সিংহলের গহন বনে একুশ জন লোকের মৃত্যুর জন্যে তিনিই যে দায়ী, অমলেন্দুবাবু তো নিজের মুখেই একথা স্বীকার করেছেন। অবশ্য কোনো কোনো অভিযোগ হচ্ছে হাস্যকর। চন্দ্রবাবুর কথাই ধরো। আগে তিনি ছিলেন হাইকোর্টের বিচারপতি। প্রমাণ পেলে অপরাধীকে তিনি দণ্ড দিতে বাধ্য। তারপর মহেন্দ্রবাবু, তিনি ছিলেন ডিটেকটিভ। তিনি যদি সত্য সাক্ষ্য দিয়ে থাকেন, আর তার জন্যে কারুর প্রাণদণ্ড হয়, তবে তাঁকেও দোষী বলা চলে না। আমার নিজের সম্বন্ধেও আমি অনেকটা ওই রকম কথাই বলতে পারি।'

স্বপ্না জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে রইল সৌদামিনীর মুখের পানে।

সৌদামিনী বললেন, 'অমলা নামে একটি গরিবের মেয়ে আমার কাছে থাকত। আমি তাকে যথেষ্টই স্নেহ-যত্ন করতুম। হঠাৎ একদিন আমার বাক্স থেকে একশো টাকার একখানা নোট চুরি গেল। তারপর সেই নোট পাওয়া গেল অমলারই কাছে। সে কেঁদেকেটে আমার পায়ে ধরে বললে, 'আমার দাদার অত্যন্ত অসুখ হয়েছে, পয়সার অভাবে তাঁর চিকিৎসা হচ্ছে না, সেইজন্যে দায়ে পড়ে আমি ওই নোটখানা নিয়েছিলুম।' তারপর আমি রাগ করে তাকে আমার বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিই। মনের দুঃখে সে করে আত্মহত্যা। তুমিই বলো স্বপ্না, অমলার মৃত্যুর জন্যে কি আমি দায়ী?'

স্বপ্না বললে, 'অমলার মৃত্যুর পরে আপনি কি অনুতপ্ত হননি?'

সৌদামিনী কঠিন কণ্ঠে বললেন, 'অনুতপ্ত হব? কোনো অন্যায় করিনি, অনুতপ্ত হব কেন?'

খ

চত্বরের উপরে ইজিচেয়ারে বসে চন্দ্রবাবু চুপ করে তাকিয়ে ছিলেন সমুদ্রের দিকে। খানিক তফাতে একটা গাছতলায় দাঁড়িয়ে নীরবে সিগারেটের ধূমপান করছিল অমলেন্দু ও মহেন্দ্র।

ডাক্তার বোস বাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে তাদের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। বললেন, 'অমলেন্দুবাবু, আপনার সঙ্গে আমি দু-চারটে কথা কইতে পারি কি?'

—'নিশ্চয়।'

অমলেন্দুকে নিয়ে ডাক্তার বোস খানিক দূর অগ্রসর হয়ে আবার দাঁড়িয়ে পড়ে

বললেন, 'অমলেন্দুবাবু, আমি আপনার সঙ্গে কিছু পরামর্শ করতে চাই।'

—'কী বিষয় নিয়ে?'

—'আমাদের বর্তমান অবস্থা নিয়ে। মহেন্দ্রবাবুর বিশ্বাস, সত্যবালার মৃত্যুতে নিত্যানন্দের হাত আছে। আপনি কী বলেন?'

অমলেন্দু একমুখ সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বললে, 'কিছুই অসম্ভব নয়। তাদের জন্যেই যদি নিস্তারিণী দেবী মারা পড়ে থাকেন, তাহলে পাছে তার স্ত্রী ভয়ে সেই কথা প্রকাশ করে ফেলে, তাই ভেবেই নিত্যানন্দ হয়তো সত্যবালাকে ইহলোক থেকে সরিয়ে দিয়েছে। সত্যবালার যে স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে, একথা আমি বিশ্বাস করি না। তার মৃত্যু হতে পারে দুটি কারণে। হয় নিত্যানন্দ বিষ-টিষ খাইয়ে তাকে মেরে ফেলেছে, নয় সত্যবালা নিজেই ভয়ে আত্মহত্যা করেছে। কিন্তু এক দিনেই এক বাড়িতেই দু-দুটো আত্মহত্যা কেমন যেন খাপ খায় না। তার একটু আগেই মনোতোষবাবুর মৃত্যু হয়েছে, আর সেটাও নাকি আত্মহত্যা! কিন্তু—'

—'থামলেন কেন? কী বলছিলেন বলুন।'

—'কিন্তু আমার বিশ্বাস, মনোতোষবাবু আত্মহত্যা করেননি, কেউ তাঁকে হত্যা করেছে। সত্য করে বলুন দেখি, আপনিও কি মনে মনে এই কথাই বিশ্বাস করেন না?'

ডাক্তার বোস স্তব্ধ হয়ে রইলেন গম্ভীর মুখে। খানিকক্ষণ পরে তিনি ধীরে ধীরে বললেন, 'আর ওই টেবিলের উপরে যে হারাধনের দশটি ছেলের মূর্তি রাখা হয়েছে, তারই বা রহস্য কী? প্রত্যেক ঘরের দেওয়ালে একটা বাজে ছেলে-ভুলানো ছড়াই বা টাঙিয়ে রাখা হয়েছে কেন? আজ নিত্যানন্দ আমাকে আরও কী দেখিয়েছে জানেন? টেবিলের উপর থেকে দুটো মূর্তিই কোথায় অদৃশ্য হয়েছে, সেখানে এখন আছে কেবল আটটা পুতুল।'

অমলেন্দু বিস্মিত স্বরে বললে, 'কিন্তু কাল আমি স্বচক্ষেই দেখেছি, টেবিলের উপরে দশটা পুতুল ছিল।'

ডাক্তার গড়গড় করে বলে গেলেন :

'হারাধনের দশটি ছেলে
ঘোরে পাড়াময়,
একটি কোথা হারিয়ে গেল

রইল বাকি নয়।
হারাধনের নয়টি ছেলে
কাটতে গেল কাঠ,
একটি কেটে দুখান হল
রইল বাকি আট।'

—রইল বাকি আট। আমাদের দলের দুজন লোকের মৃত্যু হয়েছে, টেবিলের উপর থেকেও অদৃশ্য হয়েছে দুটো পুতুল। এ থেকে ভবিষ্যতের কোনো সম্ভাবনার ইঙ্গিত পাচ্ছেন কি?'

অমলেন্দু বললে, 'পাচ্ছি বই কি! ভয়াবহ ইঙ্গিত! কিন্তু মূর্তি দুটো সরালে কে?'

—'নিত্যানন্দ বলে, আমরা কয়জন ছাড়া এই দ্বীপে আর জনপ্রাণী নেই।'

—'নিত্যানন্দ ভুল বলেছে। কিংবা সে মিথ্যা কথা বলেছে!'

—'কিন্তু সে মিথ্যা বলেছে বলে আমার মনে হয় না। তার মুখ ভয়ে একেবারে সাদা হয়ে গিয়েছে।'

অমলেন্দু বললে, 'দেখুন, মোটরলাঞ্চও আর ফিরল না। সবই সন্দেহজনক!! বাতাস কোনদিকে বইছে, বেশ বোঝা যাচ্ছে না কি? এখানে কীভাবে অতিথি সৎকার হবে, সেটাও ভাববার সময় এসেছে। শেষ পর্যন্ত হয়তো আমাদের মৃতদেহ সৎকারের লোকই খুঁজে পাওয়া যাবে না।'

ডাক্তার বোস বললেন, 'অথচ আমরা ছাড়া দ্বীপে আর কেউ নেই!'

অমলেন্দু দৃঢ়কণ্ঠে বললে, 'নিশ্চয়ই কেউ আছে! নইলে একে একে দুটো পুতুল সরিয়ে রাখলে কে? ছোটো দ্বীপ, এটাকে তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখতে বেশি বেগ পেতে হবে না।'

—'কিন্তু সত্যই যদি কারুকে খুঁজে পাওয়া যায়, সে হবে বিপজ্জনক মারাত্মক শত্রু। আমাদের সে ক্ষমা করবে না।'

অমলেন্দু বললে, 'কারুর সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হলে তার চেয়ে আমরাই হব বেশি মারাত্মক। মহেন্দ্রবাবুকেও আমাদের সঙ্গে নিতে হবে। এরকম কাজের পক্ষে তিনি হচ্ছেন যোগ্য ব্যক্তি। এসব কথা আর কারুর কাছে বলবার দরকার নেই, অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট হয়।'

॥ অষ্টম পরিচ্ছেদ ॥

ক

দ্বীপটা খুঁজে দেখবার প্রস্তাব শুনে মহেন্দ্র সায় দিলে সানন্দে। বললে, 'পুতুল দুটো অদৃশ্য হওয়া অত্যন্ত সন্দেহজনক ব্যাপার। ধরলুম, নিত্যানন্দই তার স্ত্রীকে হত্যা করেছে। কিন্তু মনোতোষবাবুর মৃত্যুকে আপনারা কি আত্মহত্যা বলে মনে করেন?'

ডাক্তার বোস বললেন, 'না। আত্মহত্যা করবার জন্যে কেউ এই বিজন দ্বীপে আমন্ত্রণ রক্ষা করতে আসে না। মনোতোষবাবু ছিলেন জীবন্ত যৌবনের প্রতিমূর্তি, একেবারে আনন্দময় পুরুষ। তিনি যে পকেটে করে 'সায়ানাইড' বিষ নিয়ে এখানে এসেছিলেন, একথা কল্পনা করাও অসম্ভব।'

মহেন্দ্র বললে, 'হ্যাঁ আমি সে-কথা মানি। মনোতোষবাবুর মতো মানুষ পকেটে বিষ নিয়ে আমোদ করে বেড়াতে আসতে পারে না। কিন্তু তাঁর গেলাসে বিষ গেল কী করে?'

অমলেন্দু বললে, 'সেটাও আমি ভেবে দেখেছি। মনোতোষবাবু খানিকটা লেমোনেড পান করে গেলাসটা টেবিলের উপরে রেখে আমাদের কাছে এসেছিলেন। টেবিলটা ছিল খোলা জানলার সামনে। সেই সময়ে বাইরের কোনো লোক নিশ্চয়ই জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে 'সায়নাইড' ফেলে দিয়েছিল গেলাসের ভিতরে। তারপর মনোতোষবাবু আবার গেলাসে চুমুক দিতে যান আর মারা পড়েন সঙ্গে সঙ্গেই।'

অবিশ্বাসের স্বরে মহেন্দ্র বললে, 'জানলা দিয়ে কেউ গেলাসে বিষ ফেলে দিলে আর আমরা তাকে দেখতে পেলুম না?'

অমলেন্দু বললে, 'আমরা সকলেই তখন দ্বীপের ব্যাপার নিয়ে যথেষ্ট অন্যমনস্ক হয়ে ছিলুম।'

ডাক্তার বললেন, 'সে কথা সত্য। আমাদের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ শুনে আমরা তখন সকলেই উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলাম। সে সময়ে আমাদের কারুরই দৃষ্টি ছিল না জানলার দিকে।'

মহেন্দ্র বললে, 'আমার যা বিশ্বাস তাই বললুম। আচ্ছা, এইবারে আমাদের অন্বেষণা শুরু করা যাক। আমাদের কারুর কাছে অন্তত একটা 'রিভলভার' থাকলে ভালো হত। কিন্তু সে আশা করা বৃথা।'

অমলেন্দু নিজের পকেটের উপরে হাত রেখে বললে, 'আমার কাছে একটা রিভলভার আছে।'

দুই চক্ষু অত্যন্ত বিস্ফারিত করে মহেন্দ্র বললে, 'আপনি সর্বদাই সঙ্গে রিভলভার রাখেন?'

অমলেন্দু বললে, 'সাধারণত তাই রাখি বটে। জীবনে বারবার আমাকে বিপদ-আপদের মধ্যে গিয়ে পড়তে হয়েছে। কাজেই এটা অভ্যাসের মধ্যেই দাঁড়িয়ে গেছে।'

মহেন্দ্র বললে, 'তাই নাকি? তা এখানকার মতো ভয়াবহ বিপদের মাঝখানে আমরা বোধহয় আর কখনো পড়িনি। যদি এই দ্বীপের কোথাও কোনো উন্মাদগ্রস্ত হত্যাকারী লুকিয়ে থাকে, তাহলে সে দু-একটা রিভলভার কি ছোরাছুরি নয়, দস্তুরমতো একটা অস্ত্রশালার অধিকারী হতে পারে।'

ডাক্তার বললেন, 'আপনার এ-অনুমান হয়তো ঠিক নয়। আমি দেখেছি এ শ্রেণির হত্যা-ব্যাধিগ্রস্ত পাগলকে চোখে দেখলে চেনা যায় না। মনে হয়, তারা বেশ নিরীহ ব্যক্তি।

মহেন্দ্র বললে, 'কিন্তু এই দ্বীপবাসী উন্মত্ত যে নিরীহ ব্যক্তি, আমার তা মনে হয় না।'

খ

তারা তিন জনে দ্বীপটা ভালো করে খুঁজে দেখবার জন্যে বেরিয়ে পড়ল। ছোটো দ্বীপ। মাঝে মাঝে বনজঙ্গল থাকলেও তা খুব গভীর ও দুর্ভেদ্য নয়। চারিদিকটা ঘুরে আসতে গেলে খুব দীর্ঘকালের দরকার হবে না।

খুঁজতে খুঁজতে এক জায়গায় তারা জলের ধারে এসে পড়ল। সেইখানে প্রায় সমুদ্রের মতো বিশাল নদীর মোহনার দিকে মুখ করে মূর্তির মতো বসে আছেন মেজর সেন। তাঁর দৃষ্টি দিকচক্রবালরেখার দিকে বিস্তৃত। আগন্তুকদের পদশব্দেও তিনি একবারও ফিরে তাকালেন না। সেখানে তিনি ছাড়া যে আর কারও অস্তিত্ব আছে, এ সম্বন্ধেও যেন তাঁর কোনো চেতনাও নেই!

মহেন্দ্র ভাবলে, এটা যেন কেমন অস্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে। মেজর সেন কি সমাধিগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন? গলা তুলে সে বললে, 'বাঃ আপনি তো বেশ শান্তিপূর্ণ জায়গাটি বেছে নিয়েছেন!'

দুই ভুরু সঙ্কুচিত করে মেজর কাঁধের উপর দিয়ে মুখ ফিরিয়ে তাকিয়ে দেখলেন। বললেন, 'আর সময় নেই, হাতে আর বেশি সময় নেই। এখন আমাকে কেউ যেন বিরক্ত না করে।'

মৃদুকণ্ঠে মহেন্দ্র বললে, 'আমরা আপনাকে বিরক্ত করতে আসিনি। দ্বীপটা খুঁজে দেখছি, হয়তো ঝোপঝাপের ভিতরে কোনো শত্রু লুকিয়ে থাকতে পারে।'

মেজর সেন আবার ভুরু সঙ্কুচিত করে বললেন, 'আপনারা বুঝতে পারবেন না—আপনারা কিছুই বুঝতে পারবেন না। দয়া করে আমাকে একলা থাকতে দিন।'

মহেন্দ্র তাঁর কাছ থেকে ফিরে আসতে আসতে বললে, 'ভদ্রলোকের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। ওঁর সঙ্গে কথা কয়ে লাভ নেই।'

অমলেন্দু কৌতূহলী হয়ে শুধোলে, 'উনি কী বললেন?'

—'ওঁর হাতে আর সময় নেই। আমরা যেন ওঁকে আর বিরক্ত না করি।'

ডাক্তার চিন্তিত মুখে বলেন, 'আশ্চর্য! এ আবার কী কথা?'

গ

সারা দ্বীপটা তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কারুর পাত্তা পাওয়া গেল না।

তারা তিন জনে নদীর অতিদূরবর্তী অস্পষ্ট সীমারেখার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কোথাও একখানা নৌকা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। বাতাস ক্রমেই প্রবল হয়ে উঠছে।

অমলেন্দু বললে, 'বোধ হচ্ছে ঝড় উঠবে। নিকুচি করেছে, এখান থেকে ওপারের কোনো গ্রাম পর্যন্ত দেখা যায় না। অথচ তীরের কাছাকাছি খাজুরী আর নন্দীগ্রাম বলে দুটো পল্লি আছে। আমরা কি আগুন-টাগুন জ্বেলে গ্রামবাসীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারি না?'

মহেন্দ্র বললে, 'শুকনো বনে আগুন লাগিয়ে দেখলে হয়।'

অমলেন্দু বললে, 'কিন্তু আমার মনে হয় সে গুড়েও বালি। যে শয়তান এমন আটঘাট বেঁধে আমাদের এই দ্বীপে এনে ফেলেছে, সে কি ও কথাও ভেবে দেখেনি?'

মহেন্দ্র বললে, 'আপনার কথার মানে?'

—'ঠিক মানে যে কী তাও বলা কঠিন। হয়তো গ্রামবাসীদের আগে থাকতেই

জানিয়ে রাখা হয়েছে, দ্বীপ থেকে আমরা কেউ নিশানা বা সংকেত করলেও তারা যেন কিছুই গ্রাহ্যের মধ্যে না আনে।'

—'আর গ্রামবাসীরা সুবোধ বালকের মতো এই প্রস্তাবে সায় দেবে?'

—'হয়তো তাদের বলা হয়েছে, জয়কয়েক লোককে ঠাট্টা করে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে এই দ্বীপের মধ্যে, একটা বাজি জেতবার জন্যে।'

ঘ

স্বপ্নার আর ভালো লাগছিল না সৌদামিনীকে। কী কঠিন স্ত্রীলোক। তাঁর দ্বারা অপমানিত হয়ে এক অভাগি আত্মহত্যা করলে, তবু তিনি অনুতপ্ত নন? তাঁর মনে দুঃখের লেশ নেই?

সৌদামিনী তার সামনে সিধে হয়ে বসে নির্বাক মুখে বুনে যাচ্ছিলেন পশমের কী একটা জিনিস। তাঁর সান্নিধ্য স্বপ্নার আর সহ্য হল না। সে উঠে পড়ে বাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে গেল। তারপর লক্ষ্যহীনের মতো বেড়াতে বেড়াতে গিয়ে পড়ল দ্বীপের কিনারায়। সেখানে তেমনি নিশ্চল হয়ে বসেছিলেন মেজর সেন।

স্বপ্না যখন তাঁর কাছে দিয়ে দাঁড়াল, তিনি মুখ তুলে কী রকম একটা উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে দেখলেন। কেন সে জানে না, তার বুকটা ছাঁৎ করে উঠল।

মেজর বললেন, 'ও তুমি! তুমি এখানে এসেছ?'

স্বপ্না তাঁর পাশে গিয়ে বসে বললে, 'এখানে চুপ করে বসে জলের দিকে তাকিয়ে থাকতে আপনার বুঝি ভালো লাগছে?'

মাথা নেড়ে শান্তভাবে তিনি বললেন, 'হ্যাঁ। বেশ জায়গা। এখানে বসে অপেক্ষা করতে ভালো লাগে।'

স্বপ্না একটু সচকিত ভাবে বললেন, 'অপেক্ষা? কার জন্যে আপনি অপেক্ষা করছেন?'

মেজর তেমনি শান্তভাবেই বললেন, 'আমি অপেক্ষা করছি শেষ পরিণামের জন্যে। একথা কি তুমি জানো না? আমরা সকলেই তো অপেক্ষা করছি শেষ পরিণামের জন্যে।'

স্বপ্নার প্রাণটা ধড়ফড় করে উঠল। সে তাড়াতাড়ি বললে, 'আপনি কী বলতে চান?'

মেজর সেন গম্ভীরকণ্ঠে বললেন, 'আমরা কেউ আর এই দ্বীপ থেকে ফিরে যাব না। শীঘ্রই আমাদের মুক্তির দিন আসছে।'

স্বপ্না উঠে দাঁড়াল। সভয়ে বললে, 'আপনি কী বলতে চান, আমি বুঝতে পারছি না।'

মেজর বললেন, 'আমি বুঝতে পেরেছি বাছা, আমি বুঝতে পেরেছি।'

স্বপ্না উদ্বিগ্ন বললে, 'না, না, আপনি কিছুই বুঝতে পারেননি।'

মেজর আবার জলের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন, কোনো জবাব দিলেন না। সেখানে যে আর কেউ হাজির আছে, একথাও তিনি যেন ভুলে গেলেন।

স্বপ্না আর সেখানে দাঁড়াল না, দ্রুতপদে বাড়ির দিকে আসতে আসতে শুনতে পেলে, মেজর সেন আপন মনেই শান্তকণ্ঠে বলছেন, 'মুক্তি মুক্তি! মুক্তির আর বিলম্ব নেই।'

৬

নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এসেই মহেন্দ্র দেখলে, দোতলার বারান্দার রেলিং ধরে ডাক্তার বোস চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন, সমুদ্রের দিকে প্রসারিত তাঁর দৃষ্টি।

মহেন্দ্রের সাড়া পেয়েই চমক ভাঙল ডাক্তারের। তিনি বললেন, 'মহেন্দ্রবাবু, আমার মনে জেগেছে এক দুর্ভাবনা।'

মহেন্দ্র বললে, 'দুর্ভাবনা নিয়ে আমরা সকলেই তো এখানে ব্যস্ত হয়ে আছি।'

অধীরভাবে হাত নেড়ে ডাক্তার বললেন, 'নিশ্চয়, নিশ্চয়। কিন্তু আমি সকলকার কথা বলছি না। আমি ভাবছি মেজর সেনের কথা।'

—'মেজর সেনের কথা?'

অত্যন্ত নীরসকণ্ঠে ডাক্তার বললেন, 'হ্যাঁ, আমাদের সকলেরই বিশ্বাস, আমরা পড়েছি কোনো উন্মাদগ্রস্ত হত্যাকারীর পাল্লায়। মেজর সেনকে দেখলে আপনার কী মনে হয়?'

সচমকে মহেন্দ্র বলল, 'আপনি কি তাঁকে উন্মাদগ্রস্ত বলে মনে করেন?'

ডাক্তার দ্বিধাভরা কণ্ঠে বললেন, 'হয়তো এ-রকম কথা বলা আমার উচিত হয়নি। আমি ডাক্তার হলেও উন্মাদ রোগ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ নই। মেজরের সঙ্গে এদিক নিয়ে আমরা কোনো কথা হয়নি, সুতরাং আমি নিশ্চিত ভাবে কিছুই বলতে পারি না।'

সেই সময়ে দুজনেই দেখলেন, নীচেকার চত্বর পার হয়ে অমলেন্দু ডান দিকে ফিরে আবার অদৃশ্য হয়ে গেল। ভূতপূর্ব ডিটেকটিভ মহেন্দ্র বললে, 'ডাক্তারবাবু, আমার কী মনে হয় জানেন?'

—'কী?'

—'ওই লোকটি ভালো নয়।'

—'অমলেন্দুবাবু? কেন?'

—'কেন তা আমি ঠিক জানি না। কিন্তু অমলেন্দুবাবুকে আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারব না।'

ডাক্তার বললেন, 'শুনেছি জীবনে উনি অনেক দুঃসাহসিক কাজ করেছেন।'

—'হ্যাঁ, কিন্তু তাঁর কোনো কোনো দুঃসাহসিক কাজের কথা দ্বিতীয় ব্যক্তির কাছে প্রকাশ করা চলে না।' সে একটু চুপ করে থেকে আবার বললে, 'ডাক্তারবাবু, আপনার সঙ্গে কি সর্বদাই 'রিভলভার' থাকে?'

ডাক্তার চমকিত হয়ে বিস্ফারিত চক্ষে বললেন, 'আমার সঙ্গে—কী আশ্চর্য, নিশ্চয়ই নয়! আমি কেন রিভলভার সঙ্গে রাখব?'

মহেন্দ্র বললে, 'কিন্তু অমলেন্দুবাবু সর্বদাই রিভলভার পকেটে রাখেন কেন?'

ডাক্তার বললেন, 'হয়তো এটা হচ্ছে কু-অভ্যাস। যাক ও কথা। সারা দ্বীপ খুঁজেও আপনারা যখন জনপ্রাণীকেও আবিষ্কার করতে পারলেন না, তখন আমার মনে হয়, হয়তো কেউ এই বাড়ির ভিতরেই লুকিয়ে আছে। মস্ত বাড়ি, ঘর। এখানটা তো এখনও খুঁজে দেখা হয়নি।'

মহেন্দ্র বললে, 'বেশ, এইবারে বাড়িটাই খুঁজে দেখা যাক। হয় এখানে কারুকে খুঁজে পাব, নয়তো এই দ্বীপের ভিতরে বাইরের জনপ্রাণী নেই।'

॥ নবম পরিচ্ছেদ ॥

ক

সারা বাড়িখানা তারা পাঁতিপাঁতি করে খুঁজতে বাকি রাখলে না, কিন্তু কোথাও কোনো অচেনা মানুষ তো দূরের কথা, একটা কুকুর-বিড়ালেরও সাড়া পাওয়া গেল না।

অমলেন্দু ধীরে ধীরে মাথা নাড়তে নাড়তে বললে, 'তাহলে আমাদেরই ধারণা

ভ্রান্ত দেখছি। এখানে উপর উপরি দুটো আকস্মিক মৃত্যু হয়েছে বলে আমরা যতসব আজব কল্পনা আর কুসংস্কারের দুঃস্বপ্ন নিয়ে ভেবে সারা হচ্ছি।'

ডাক্তার বোস গম্ভীর স্বরে বললেন, 'কিন্তু আমাদের এই ভয় যুক্তিসঙ্গত। আমি হচ্ছি ডাক্তার, অনেক আত্মঘাতীকে আমি দেখেছি। মনোতোষবাবুর চেহারা আর প্রকৃতি আত্মঘাতীদের মতো ছিল না।'

অমলেন্দু সন্দেহজড়িত কণ্ঠে বললে, 'সেটা দৈব-দুর্ঘটনাও তো হতে পারে।'

মহেন্দ্র সে-কথা আমলে না এনে বলে উঠল, 'আরে রাখুন মশাই আপনার দৈব-দুর্ঘটনা! তাহলে সত্যবালার মৃত্যুও তো একটা দৈবদুর্ঘটনা হতে পারে?'

অমলেন্দু বললে, 'কেমন করে, শুনি?'

মহেন্দ্র কেমন যেন কিন্তু কিন্তু করতে লাগল। একটু চুপ করে থেকে সে হঠাৎ বললে, 'ডাক্তার, সত্যবালাকে আপনি একটা ঘুমোবার ওষুধ দিয়েছিলেন না?'

ডাক্তার বোস তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করে বললেন, 'হ্যাঁ, দিয়েছিলুম বটে।'

—'ওষুধটা কী?'

—'আমি তাকে এক মাত্রা Trional দিয়েছিলুম। অত্যন্ত নির্দোষ জিনিস।'

মহেন্দ্র বললে, 'কিন্তু মাত্রাটা একটু অতিরিক্ত হয়ে যায়নি তো?'

ডাক্তার ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললেন, 'আপনি কী বলতে চান আমি বুঝতে পারছি না।'

—'আমি বলতে চাই যে, ভুল করে মাত্রা আপনি খানিকটা বাড়িয়ে ফেলেছিলেন। এমন ব্যাপারও তো মাঝে মাঝে হয়?'

ডাক্তার তীক্ষ্ণস্বরে বললেন, 'আমি কিছুমাত্র ভুল করিনি। আপনার ইঙ্গিত হচ্ছে হাস্যকর।' বলেই একটু থেমে তিনি আবার কণ্ঠস্বরকে রীতিমতো কর্কশ করে তুলে বললেন, 'আপনি কি বলতে চান যে সত্যবালাকে আমি ইচ্ছা করেই বেশি মাত্রায় ওষুধ দিয়েছি?'

অমলেন্দু তাড়াতাড়ি বললে, 'দেখছি আপনারা দুজনেই উত্তেজিত হয়েছেন। এমন অশোভন বাদ-প্রতিবাদের দরকার কী?'

মহেন্দ্র বললে, 'ডাক্তার বোস হঠাৎ ভুল করে ফেলেছেন, এইটুকুই আমি বলতে চাইছি।'

ডাক্তার জোর করে একটু হাসবার চেষ্টা করে বললেন, 'বন্ধু, ডাক্তারদের এমন ভুল করলে চলে না।'

কিছুমাত্র অপ্রস্তুত না হয়ে মহেন্দ্র বললে, 'ওই গ্রামোফোন রেকর্ডের কথা

বিশ্বাস করলে বলতে হয়, আগেও আপনি এইরকম ভুল করে ফেলেছেন।'

ডাক্তার মুখ হয়ে গেল রক্তহীন। অমলেন্দু উত্তপ্ত কণ্ঠে বললে, 'মহেন্দ্রবাবু এ আপনি কী করছেন? আমরা সকলেই একই ফুটো-নৌকোর যাত্রী। ভুলে যাবেন না, গ্রামোফোন রেকর্ড জ্যোতির্ময় বসুর মৃত্যুর জন্যে দায়ী করেছে আপনাকেই।'

মহেন্দ্র দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ করে এক-পা এগিয়ে গেল। বিকৃত মুখে সে বললে, 'চুলোয় যাক, জ্যোতির্ময় বসু! রাবিশ, মিছে কথা! অমলেন্দুবাবু, আমাকে নিয়ে টানাটানি করবেন না, নিজের কথাটাও ভেবে দেখুন!'

দুই ভুরু উপর দিকে তুলে অমলেন্দু বললে, 'আমার কথা!'

—'হ্যাঁ। আপনি হচ্ছেন এখানকার এক আমন্ত্রিত অতিথি। সামাজিক নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গেলে কেউ কখনো সঙ্গে নিয়ে যায় 'রিভলভার'? আমি এই প্রশ্নের উত্তর চাই।'

মহেন্দ্রের দিকে একটা অত্যন্ত বিতৃষ্ণা-ভরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করে অমলেন্দু বললে, 'তাই নাকি? এই প্রশ্নের উত্তর চান আপনি?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ মশাই!'

অমলেন্দু অপ্রত্যাশিতভাবে বললে, 'দেখুন মহেন্দ্রবাবু, আপনাকে যতটা বোকা দেখায় আপনি ততটা বোকা নন।'

—'হতে পারে। কিন্তু 'রিভলভার' সম্বন্ধে আপনি কী বলতে চান?'

এইবার অমলেন্দুর মুখে ফুটল হাসি, সে বললে, 'একটা বিপজ্জনক স্থানে আসতে হবে বলেই সঙ্গে আমি 'রিভলভার' এনেছি।'

অত্যন্ত সন্দিগ্ধস্বরে মহেন্দ্র বললে, 'আপনি এ কথা তো আগে আমাদের বলেননি?'

—'না।'

—'তাহলে আপনি আমাদের উপরে পাহারা দিতে এসেছেন?'

—'ধরুন তাই।'

—'আসল ব্যাপারটা কী, খুলে বলুন দেখি?'

অমলেন্দু আস্তে আস্তে বললে, 'বাইরে আমি সকলকে জানাতে চেয়েছি যে, আর-সকলের মতো আমিও এখানে এসেছি আমন্ত্রিত অতিথির মতো। সেটা ঠিক সত্য কথা নয়। আসল ব্যাপার হচ্ছে এই : অ্যাটর্নি বিজন বোস ডেকে পাঠিয়েছিল

আমাকে। সে বললে, যথেষ্ট বিপদ-আপদেও আমি মাথা ঠিক রেখে কাজ করতে পারি, আমার নাকি এই-রকম খ্যাতি আছে। অতএব আমি যদি এখানে এসে সকলের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখতে পারি, তাহলে আমার লভ্য হবে পাঁচ হাজার টাকা। আমি ধনী নই, লোভে পড়ে রাজি হয়ে গেলুম।'

কিন্তু অমলেন্দুর কথা মহেন্দ্রের মনে লাগল না। সে বললে, 'এসব কথা তো আপনি কালকেই আমাদের জানাতে পারতেন?'

অমলেন্দু শেষটা নাচারের মতন বললে, 'প্রিয় মহেন্দ্রবাবু, এখানে যে কী-রকম অভাবিত কাণ্ড-কারখানা হবে, কাল তা আমি জানব কেমন করে?'

ডাক্তার বোস বললেন, 'তাহলে কালকের ব্যাপার দেখেশুনে আজ আপনার মত বদলে গেছে?'

একটা কালো ছায়া এসে পড়ল অমলেন্দুর মুখের উপর। সে নীরস স্বরে থেমে থেমে বললে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ। আজ জেনেছি আমরা সবাই হচ্ছি একই ফুটো-নৌকোর যাত্রী। ওই পাঁচ হাজার টাকা হচ্ছে একটা বাজে টোপ, আর সেই টোপ গিলেছি আমি নির্বোধ মাছের মতো। আমরা ফাঁদে পা দিয়েছি মশাই, সকলেই একসঙ্গে একই ফাঁদে পা দিয়েছি। মনোতোষবাবুর মৃত্যু! সত্যবালার মৃত্যু! টেবিলের উপর থেকে দু-দুটো পুত্তলিকার অন্তর্ধান! এসবই হচ্ছে ভয়াবহ দুর্লক্ষণ! কিন্তু কে যে এই বিষম ফাঁদ পেতেছে তা আমরা কেউই জানি না, কারণ সেই শয়তান আমাদের সামনে এসে এখনও হয়নি মূর্তিমান!'

খ

দুপুরের আহারের জন্য ডাক এল। সকলে খাবার ঘরে গিয়ে দেখলে, টেবিলের উপরে সারি সারি সাজানো রয়েছে বিবিধ আহার্যের পাত্র।

একপাশে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল নিত্যানন্দ। তার স্থির মুখের পানে তাকালে তার মনের ভাব কিছুই ধরবার জো নেই।

অমলেন্দু বললে, 'লাঞ্চ-ও ফিরে আসেনি, দ্বীপেও হাট-বাজার নেই। লাঞ্চ যদি না আসে, আর এই দ্বীপে যদি আমাদের কিছুদিন বন্দি থাকতে হয়, তাহলে আমাদের খোরাক জুটবে কেমন করে নিত্যানন্দ?'

—'আজ্ঞে, ভাঁড়ার ঘরে অনেক চাল, ডাল, আটা আর অন্যান্য জিনিস মজুত আছে। বিলিতি টিনের খাবারও এনে রাখা হয়েছে যথেষ্ট। বাহির থেকে খাবার না এলেও আমরা বেশ কিছুকাল চালিয়ে নিতে পারব।'

জানালা দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে মহেন্দ্র বললে, 'আকাশে মেঘ তো ক্রমেই পুরু হয়ে জমে উঠছে দেখছি। যদি দু-চার দিন ধরে দুর্যোগ চলে আর বাইরের কেউ এই দ্বীপের নাগাল না ধরতে পারে, তাহলে আমাদের অনাহার করতে হবে না শুনে নিশ্চিন্ত হলুম।'

সৌদামিনী বললেন, 'আমরা তো সবাই হাজির আছি, কিন্তু মেজর সেন কোথা?'

স্বপ্না বললে, 'মেজর সেন সমুদ্রের ধারে বসে আছেন। তাঁকে কেমন অন্যমনস্ক দেখলুম! তাঁর কথাও যেন খাপছাড়া বলে মনে হল।'

ডাক্তার বোস উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আপনারা ডান হাতের ব্যাপার শুরু করে দিন, আমি মেজর সেনকে ডেকে আনছি।'

বাহির থেকে হঠাৎ একটা ঠান্ডা দমকা হাওয়া ঘরের ভিতরে এসে পড়ল।

স্বপ্না বললে, 'ঝড় উঠতে আর দেরি নেই বোধ হয়।'

সকলে খাওয়ার কথা ভুলে উদ্বিগ্ন মুখে দৃষ্টিপাত করলে বাইরের দিকে। বাতাস ক্রমেই ঝোড়ো হয়ে উঠছে, সমুদ্রের কোলাহলও ক্রমেই হয়ে উঠছে উচ্চতর।

নিত্যানন্দ হঠাৎ সচমকে বললে, 'বাইরে কার পায়ের শব্দ হচ্ছে। কে যেন ছুটতে ছুটতে এদিকে আসছে।'

সকলেই শুনতে পেলে চত্বরের উপরে দ্রুত পদশব্দ। সকলেই একসঙ্গে উঠে পড়ে দরজার দিকে ফিরে দাঁড়াল এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলেন ডাক্তার বোস।

হাঁপাতে হাঁপাতে তিনি বলেন, 'মেজর সেন—'

—'মারা পড়েছেন!' কথাগুলো ফস করে বেরিয়ে পড়ল মহেন্দ্রের মুখ থেকে।

ডাক্তার বললেন, 'হ্যাঁ, মেজর সেন মারা পড়েছেন।'

সাত জন লোক তাকিয়ে দেখলে পরস্পরের মুখের দিকে।

গ

মহেন্দ্র ও অমলেন্দু ধরাধরি করে মেজর সেনের দেহ নিয়ে যখন ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলে, ঠিক সেই সময়ে সারা দ্বীপের উপরে জেগে উঠল হু হু করে একটা দুর্দান্ত ঝড়ের দুরন্ত নিশ্বাস।

স্বপ্না খাবার ঘর থেকে বেরিয়ে বৈঠকখানার ভিতরে গিয়ে ঢুকল। তারপর একটা টেবিলের দিকে তাকিয়ে সে তটস্থ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, এমন সময় সেইখানে এসে হাজির নিত্যানন্দ।

সচকিত নেত্রে স্বপ্নার দিকে তাকিয়ে সে বললে, 'আমি এখানে দেখতে এসেছি—'

কেন যে চিৎকার করলে তা সে জানে না, কিন্তু স্বপ্না সচিৎকারেই বলে উঠল, 'বুঝেছি নিত্যানন্দ, আমার মতো তুমিও কী দেখতে এসেছ! দ্যাখো, টেবিলের উপরে আছে এখন মোটে সাতটা পুতুল!'

মেজর সেনের দেহ তাঁর শয়নকক্ষে স্থাপন করে অমলেন্দু ও মহেন্দ্র ফিরে এসে দেখলে সকলেই এসে হাজির হয়েছে বৈঠকখানার ভিতরে। ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নেমেছে তুমুল বৃষ্টি। জানলার বন্ধ শার্সির উপরে দরদর করে ঝরে পড়ছে জল, সেইদিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে স্বপ্না। চেয়ারের উপরে সিধে হয়ে সৌদামিনী বসে আছেন নিষ্কম্প দীপশিখার মতো।

ডাক্তার বোস ঘরের ভিতরে তাড়াতাড়ি পায়চারি করছেন। চন্দ্রবাবু কৌচের উপরে হেলান দিয়ে উপবিষ্ট, তাঁর দুই চক্ষু অর্ধমুদ্রিত।

তারপর সোজা হয়ে বসে চোখ খুলে চন্দ্রবাবু বললেন, 'তারপর, ডাক্তার!'

ডাক্তার পায়চারি বন্ধ করে দাঁড়িয়ে পড়লেন। বিবর্ণমুখে বললেন, 'এবারে আর মৃত্যুর কারণ সম্বন্ধে সন্দেহ করবার কিছুই নেই। মেজর সেনের মাথার পিছন দিকে কোনো কঠিন জিনিস দিয়ে কে প্রচণ্ড আঘাত করেছে!' ঘরের ভিতরে শোনা গেল কয়েকজনের অস্ফুট কণ্ঠস্বর।

চন্দ্রবাবু শান্তভাবেই বললেন, 'যা দিয়ে আঘাত করা হয়েছে, সেটা কি আপনি দেখেছেন?'

—'না।'

—'কিন্তু মৃত্যুর কারণ সম্বন্ধে ত[illegible] নিশ্চিত?'

—'হ্যাঁ।'

চন্দ্রবাবু নিজের কণ্ঠস্বর পরিষ্কার করে নিয়ে বললেন, 'আজ সকালে আমি যখন চত্বরের পরে ইজিচেয়ারে বসেছিলুম, তখন একটা বিষয় লক্ষ করেছি। আপনারা কেউ কেউ আনাগোনা করছিলেন দ্বীপের এদিকে-ওদিকে। কারণটা বুঝতে আমার দেরি হয়নি। আপনারা দ্বীপটা খুঁজে দেখছিলেন, কোনো হত্যাকারী ওইখানে লুকিয়ে আছে কি না?'

অমলেন্দু বললে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনি ঠিক আন্দাজ করেছেন।'

চন্দ্রবাবু বললেন, 'তাহলে আমার মতো আপনারাও বুঝতে পেরেছেন যে, মনোতোষবাবুর আর সত্যবালার মৃত্যু দৈব-দুর্ঘটনা কি আত্মহত্যা নয়। আর এতক্ষণে আপনারা নিশ্চয় এটাও ধারণা করতে পেরেছেন যে, কোন উদ্দেশ্যে আমাদের সকলকে ভুলিয়ে এই দ্বীপে নিয়ে আসা হয়েছে।'

মহেন্দ্র গর্জন করে বললে, 'আমরা কোনো পাগল খুনির পাল্লায় পড়েছি।'

খক খক করে খানিকটা কেশে নিয়ে চন্দ্রবাবু বললেন, 'হয়তো তাই, কিন্তু এখন তা নিয়ে মাথা ঘামানো বৃথা। আপাতত আমাদের ভেবে দেখা উচিত, সবাই কী করে নিজের প্রাণ রক্ষা করতে পারি।'

ডাক্তার বোস কম্পিত কণ্ঠে বললেন, 'কিন্তু দ্বীপে বাইরের আর কেউ নেই! নিশ্চয়ই কেউ নেই!'

নিজের চিবুকের উপরে অঙ্গুলি দ্বারা আঘাত করতে করতে চন্দ্রবাবু বললেন, 'এক হিসাবে আপনার মত ভ্রান্ত নয়। আমিও আজ সকলে ওই সিদ্ধান্তেই পৌঁছেছিলুম। আমাকে জিজ্ঞাসা করলেই আমি আপনাদের বলতে পারতুম, এই দ্বীপের মধ্যে কোনো অজানা খুনিকেই খুঁজে পাওয়া যাবে না। অথচ সেই হত্যাকারী আছে এই দ্বীপের মধ্যেই। আইন যাদের স্পর্শ করতে পারে না, তার নিজের মনগড়া এমন কয়েকজন অপরাধীকেই দিতে চায় সে প্রাণদণ্ড। তার ফলে একে একে তিন জন লোক মারা পড়ল। অতএব আমাদের এই দণ্ডদাতা আছে এই দ্বীপের মধ্যেই—'

—'কিন্তু এই দ্বীপের ভিতরে কেমন করে সে লুকিয়ে আছে? খুব সহজেই এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায়। সে হচ্ছে আমাদেরই একজন।'

ঘ

—'না, না না না!'

চিৎকার করে উঠল স্বপ্না—প্রায় ক্রন্দিত কণ্ঠেই।

কয়েকমুহূর্ত তার মুখের দিকে চুপ করে তাকিয়ে থেকে চন্দ্রবাবু বললেন, 'প্রিয় স্বপ্না দেবী, সত্যের সামনে দাঁড়িয়ে সত্যকে অবহেলা করা চলে না। আমরা ভীষণ বিপদের মাঝখানে এসে পড়েছি। আমাদেরই মধ্যে একজন হচ্ছে হত্যাকারী। কিন্তু সে যে কে, তা আমরা জানি না। আমরা যে দশ জন লোক এই দ্বীপে এসেছি, তাদের ভিতর থেকে মৃত তিন জনকে এখন বলা চলে সন্দেহের অতীত। বাকি আছি আমরা সাত জন।'

চন্দ্রবাবু একে একে প্রত্যেকের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করে আবার বললেন, 'আমি যা বললুম, আপনারা কি তা সত্য বলে মানতে রাজি আছেন?'

ডাক্তার বোস বললেন, 'অদ্ভুত কথা! অথচ আপনার কথা সত্য বলে মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই।'

মহেন্দ্র বললে, 'হ্যাঁ, ওঁর কথাই ঠিক। আর আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করেন তাহলে আমার সন্দেহের কথা আমি বলতে পারি—'

চন্দ্রবাবু হাত তুলে মহেন্দ্রকে স্তব্ধ হবার জন্যে ইঙ্গিত করে বললেন, 'আপনার সন্দেহের কথা নিয়ে পরে আলোচনা করলেও চলবে। আপাতত আমার মতে সকলে সায় দিচ্ছেন তো?'

সৌদামিনী একটুও এপাশে-ওপাশে হেললেন না, ঠিক সিধে হয়ে বসেই বললেন, 'চন্দ্রবাবু, আপনার কথা যুক্তিসঙ্গত বলেই মনে হচ্ছে। আমাদের এক জনের ঘাড়ে চেপেছে শয়তান।'

স্বপ্না অস্ফুটকণ্ঠে বললে, 'আমি একথা বিশ্বাস করতে পারি না। না, এ হচ্ছে অসম্ভব!'

চন্দ্রবাবু বললেন, 'আপনার কী মত অমলেন্দুবাবু?'

—'আমিও আপনার কথায় সায় দিচ্ছি।'

চন্দ্রবাবুর মুখে ফুটল ক্ষীণ হাসির রেখা। তারপর তিনি বললেন, 'এখন প্রমাণগুলো পরীক্ষা করা যাক। আমাদের মধ্যে কোনো এক ব্যক্তিকে বিশেষ সন্দেহ করবার কারণ আছে কি? মহেন্দ্রবাবু, আমার মনে হয় এ-সম্বন্ধে আপনি যেন কিছু বলতে চান?'

মহেন্দ্র জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে বললে, 'অমলেন্দুবাবু পকেটে রিভলভার নিয়ে এখানে এসেছেন। কাল এ-কথা তিনি কারুকে জানাননি। কিন্তু আজ স্বীকার করেছেন।'

অমলেন্দু তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বললে, 'কাল কিছু না বলার কারণ ওঁদের জানিয়েছি, চন্দ্রবাবু। আপনিও কারণটা শুনুন।' চন্দ্রবাবুর কাছে সব কথা সে আবার খুলে বললে।

মহেন্দ্র তীক্ষ্ণকণ্ঠে বললে, 'আপনার কথা যে সত্য তার প্রমাণ কোথায়?'

চন্দ্রবাবু বললেন, 'দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের সকলেরই অবস্থা এক-রকম। একমাত্র প্রমাণ আমাদের মুখের কথাই।' তারপর সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে তিনি আবার বললেন, 'আমরা যে কী রকম অদ্ভুত অবস্থায় এসে পড়েছি, কেউ বোধহয় সেটা এখনও ভালো করে বুঝতে পারছেন না। এখন কাজ করতে হবে মাত্র এক উপায়ে। আমাদের মধ্যে এমন লোক কে কে আছেন, যাঁদের মনে করা যেতে পারে সকল সন্দেহের অতীত?'

ডাক্তার বোস তাড়াতাড়ি বললেন, 'ডাক্তারি পেশায় আমি একজন বিখ্যাত ব্যক্তি। আমার উপরে এমন সন্দেহ কেউই করতে পারবেন না যে—'

চন্দ্রবাবু হাত তুলে তাঁকে স্তব্ধ হতে ইঙ্গিত করে বললেন, 'আমিও একজন বিখ্যাত ব্যক্তি। কিন্তু মশাই, তার দ্বারা কিছুই প্রমাণিত হয় না। ডাক্তাররাও পাগল হয়ে যেতে পারে, বিচারকরাও পাগল হতে পারে। এই হিসাবে—' মহেন্দ্রের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'পুলিশের পক্ষেও পাগল হওয়া অসম্ভব নয়।'

অমলেন্দু বললে, 'আমাদের দলে দুই জন মহিলা আছেন, আশা করি তাঁরা হচ্ছেন সকল সন্দেহের অতীত।'

নীরস কণ্ঠে চন্দ্রবাবু বললেন, 'আপনি কি বলতে চান, মেয়েরা কোনোদিন খুন-খারাপি করেনি?'

অমলেন্দু বিরক্তভাবে বললেন, 'নিশ্চয়ই তা মনে করি না। কিন্তু এক্ষেত্রে এটা বোধহয় অসম্ভব যে—'

চন্দ্রবাবু তাঁর মুখের কথা শেষ হবার আগেই ডাক্তারের দিকে ফিরে বললেন, 'প্রিয় ডাক্তার, মেজর সেনের মাথায় আপনি যে ক্ষতচিহ্ন দেখেছেন, কোনো স্ত্রীলোক কি তাঁকে সে-ভাবে আঘাত করতে পারে?'

ডাক্তার শান্তকণ্ঠে বললেন, 'নিশ্চয়ই পারে, অবশ্য উপযোগী অস্ত্র হতে পেলে।'

চন্দ্রবাবু বললেন, 'এখানকার আর দুটো মৃত্যুর কারণ হচ্ছে, বিষ। পুরুষের মতো বিষ ব্যবহার করতে পারে যে-কোনো স্ত্রীলোকও।'

স্বপ্না ক্রুদ্ধস্বরে বললে, 'চন্দ্রবাবু, আপনিও পাগলের মতো কথা বলছেন!'

তার মুখের দিকে স্থির নেত্রে তাকিয়ে চন্দ্রবাবু ওজন-করা স্বরে বললেন, 'প্রিয় স্বপ্না দেবী, শান্ত হোন। আমি আপনার বিরুদ্ধে কোনোই অভিযোগ করছি না। আর সৌদামিনী দেবী, আমরা প্রত্যেকেই যে সন্দেহভাজন হতে পারি, আমার এ-কথায় আপনিও বোধহয় রাগ করেননি?'

সৌদামিনী বসে বসে শুনছিলেন। মুখ না তুলেই স্থির কণ্ঠে তিনি বলেন, 'আমি যে তিন-তিন জন মানুষকে হত্যা করতে পারি, আমাকে যিনি চেনেন নিশ্চয়ই তিনি এমন অসম্ভব কথা ভাবতে পারবেন না। তবে এটাও ঠিক যে, আমরা প্রত্যেকেই প্রত্যেকের কাছে অপরিচিত, সুতরাং কেউ কারুকেই বিশ্বাস করতে পারিনি। অতএব আমি আগে যা বলেছি এখনও তাই বলছি : আমাদের মধ্যে নিশ্চয়ই এমন কেউ আছে, যে হচ্ছে সত্যিকার শয়তান।'

চন্দ্রবাবু বললেন, 'তাহলে দাঁড়াচ্ছে এই। আমরা কেউই সন্দেহের অতীত নই।'

অমলেন্দু বললে, 'কিন্তু নিত্যানন্দের সম্বন্ধে কী বলতে চান?'

—'তার মানে?'

—'আমার তো মনে হয় নিত্যানন্দের উপরে কোনো সন্দেহ করা যেতে পারে না।'

—'কী হিসাবে শুনি?'

—'প্রথমত, এমন ভয়ানক কাজ করবার মতো বুদ্ধি তার আছে বলে মনে হয় না। দ্বিতীয়ত, তার স্ত্রীও হয়েছে নিহত।'

চন্দ্রবাবু দুই ভুরু কপালের উপরে তুলে বললেন, 'যুবক, আমার সামনে এমন কয়েকজন আসামিকে নিয়ে আসা হয়েছে, যাদের সম্বন্ধে অভিযোগ ছিল স্ত্রীকে হত্যা করা। বিচারে তারাও দোষী সাব্যস্ত হয়েছে।'

—'হতে পারে। পৃথিবীতে, পত্নীকে হত্যা করেছে এমন লোকের অভাব নেই। কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে সে যুক্তি প্রয়োগ করা চলে না। পাছে তার স্ত্রী সব কথা

ফাঁস করে দেয় সেই ভয়ে, অথবা স্ত্রী তার চোখের বালি হয়েছিল বলে নিত্যানন্দ তাকে হত্যা করতে পারে বটে। কিন্তু যে অপরাধ তারা দুজনে মিলেই করেছে, তারই জন্যে সে হত্যা করতে পারে না তার স্ত্রী সত্যবালাকে।'

চন্দ্রবাবু বললেন, 'আপনি শোনা-কথাকে প্রমাণ বলে ধরে নিচ্ছেন। নিত্যানন্দ আর তার স্ত্রী দুজনে মিলে কারুকে যে হত্যা করেছে, এ কথা সত্য না হতেও পারে। হয়তো এটা হচ্ছে মিথ্যা অভিযোগ। সুতরাং—'

—'সুতরাং আপনার কথাই অভ্রান্ত বলে আমাদের গ্রহণ করতে হবে। হত্যাকারী হচ্ছে আমাদেরই একজন। আমরা যে-কেউ হত্যাকারী হতে পারি।'

॥ দশম পরিচ্ছেদ ॥

ক

স্বপ্না জিজ্ঞাসা করলে, 'আপনি কি একথা বিশ্বাস করেন?'

অমলেন্দু ও স্বপ্না জানলার ধারে বসেছিল একখানা কৌচের উপরে। জানলার শার্সি বন্ধ। বাইরে অশ্রান্তভাবে ঝরছিল বৃষ্টিধারা। ঝোড়ো হাওয়া উন্মত্তের মতো গর্জন করতে করতে আছড়ে পড়ে জানলার শার্সির উপরে মারছিল ধাক্কার পর ধাক্কা। দূরে দেখা যাচ্ছিল উত্তাল সমুদ্র-তরঙ্গের উত্তেজিত নৃত্য।

অমলেন্দু বললে, 'সমস্তই হচ্ছে অসম্ভব কাণ্ড! মেজর সেনের শোচনীয় মৃত্যুর পর একটা বিষয়ে নেই কোনোই সন্দেহ। দৈব-ঘটনা বা আত্মহত্যা, এসব হচ্ছে বাজে কথা। খুন, খুন! এখানে তিন-তিনটে লোককে নিশ্চয়ই খুন করা হয়েছে।'

স্বপ্না শিউরে উঠে বললে, 'ওঃ এ হচ্ছে ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন!'

অমলেন্দু গম্ভীর কণ্ঠে বললে, 'হ্যাঁ। আমরা সকলেই বাস করছি দুঃস্বপ্নের রাজ্যে। এর পরে অত্যন্ত সাবধান হয়ে আমাদের এখানে থাকতে হবে।'

স্বপ্না তার কণ্ঠস্বর আরও নামিয়ে বললে, 'ওদের মধ্যে হত্যাকারী কে, আপনি কি তা অনুমান করতে পারেন?'

অমলেন্দুর ওষ্ঠাধরে ফুটল মৃদু হাস্য। সে বললে, 'ওদের মধ্যে? দেখছি ওদের দল থেকে আপনি আমাদের দুজনকেই বাদ দিতে চান। অবশ্য, সেটা মন্দ কথা নয়। নিশ্চিতরূপেই বলতে পারি আমি নই হত্যাকারী। আর মানুষ খুন

করবার মতো পাগলামি যে আপনার ভিতরেও আছে, একথাও আমি মনে করি না।'

স্বপ্না হাসতে হাসতে বললে, 'আপনাকে ধন্যবাদ।'

অমলেন্দু বললে, 'ঠিক ওই কারণেই আপনিও কি আমাকে ধন্যবাদ দিতে পারেন না?'

স্বপ্না একটু ইতস্তত করে বললে, 'আপনার মুখেই আমরা শুনেছি যে, সমস্যায় পড়লে আপনি একুশ জন মানুষের মৃত্যুর জন্যেও দায়ী হতে পারেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও গ্রামোফোন রেকর্ডে যে ব্যক্তি আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে, আপনাকে সেরকম লোক বলে আমার বিশ্বাস হয় না।'

অমলেন্দু বললে, 'যথার্থ কথা। ধরুন, এক জন কি দুই জন লোককে আমি হয়তো হত্যা করতে পারি। কিন্তু তারও একটা উদ্দেশ্য থাকা চাই। কেন আমি একটা কি দুটো নরহত্যা করব? নিশ্চয়ই কোনো লাভের লোভে। কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে আমার বা আপনার কোনোই লাভের আশা নেই। সুতরাং ধরে নেওয়া যাক, আপনি বা আমি এইসব খুনের জন্যে মোটেই দায়ী নই। তাহলে বাকি রইল আর পাঁচ জন মাত্র লোক। তাদের মধ্যে হত্যাকারী কে? আমি যদি চন্দ্রবাবুকে সন্দেহ করি, তাহলে আপনি কি অত্যন্তই অবাক হবেন?'

স্বপ্না সবিস্ময়ে বলে উঠল, 'চন্দ্রবাবুকে সন্দেহ! কেন?'

—'কেন, তা ঠিক বলতে পারি না। তবে ভেবে দেখুন, তিনি হচ্ছেন এক বৃদ্ধ ব্যক্তি, আর বৎসরের পর বৎসর ধরে সর্বশক্তিমান বিচারকের ভূমিকায় অভিনয় করে আসছেন। নিজেকে মনে করেছেন দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। তাঁর একটিমাত্র ইঙ্গিতেই যে-কোনো মানুষ ত্যাগ করতে পারে অন্তিম নিশ্বাস। বিচারকের আসন ছেড়ে আজ তিনি নেমে এসেছেন বটে, কিন্তু নিজের শক্তির দম্ভ আজও ভুলতে পারেননি, কোনো মানুষকে আর প্রাণদণ্ড দেবার সুযোগ না পেয়েই হয়তো আজ তিনি পাগল হয়ে গেছেন!'

স্বপ্না আস্তে আস্তে বললে, 'হয়তো সেটা অসম্ভব নয়।'

অমলেন্দু বললে, 'আপনি কাকে সন্দেহ করেন?'

—'ডাক্তার বোসকে।'

—'ডাক্তারকে কেন?'

—'প্রথম দুই মৃত্যুর কারণ হচ্ছে, বিষ। বিষ নিয়ে নাড়াচাড়া করতে হয়

ডাক্তারদেরই। এটাও মনে রাখবেন, ডাক্তার বোস ঘুমোবার ওষুধ বলে সত্যবালাকে কী একটা পান করতে দিয়েছিলেন।'

—'হ্যাঁ, সে কথা সত্য।'

—'তারপর ডাক্তার যখন মেজর সেনকে ডাকতে যাবার নাম করে বেরিয়ে গিয়েছিলেন, তখন তাঁর সঙ্গে কেউ ছিল না।'

—'হয়তো আপনার এ অনুমান যুক্তিহীন নয়।'

খ

ডাক্তার বোস অধীর কণ্ঠে বললেন, 'আমাদের এখান থেকে বেরিয়ে পড়তেই হবে—যেমন করে হোক বেরিয়ে পড়তেই হবে।'

চন্দ্রবাবু জানলার শার্সির ভিতর দিয়ে মেঘাচ্ছন্ন আকাশ ও বৃষ্টিস্নাত অরণ্যের দিকে তাকিয়ে চিন্তিতমুখে বললেন, 'আবহাওয়া সম্বন্ধে আমার বিশেষ জ্ঞান নেই, তবে আমার মনে হচ্ছে এই জল-ঝড় সম্ভবত আরও চব্বিশ ঘণ্টার ভিতরে থামবে না। এমন দুর্যোগে কোনো নৌকোই এই দ্বীপের কাছে আসতে পারবে না।'

ডাক্তার প্রায় আর্তস্বরে বললেন, 'আর ইতিমধ্যে আমাদের সকলকেই একে একে প্রাণ দিতে হবে?'

চন্দ্রবাবু বললেন, 'প্রাণ যে দিতেই হবে তার কোনো স্থিরতা নেই। যে কোনো বিপদকে এড়াবার জন্যে আমি যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করেছি।'

ডাক্তার বললেন, 'কিন্তু মনে রাখবেন, এর মধ্যেই তিন জন হতভাগ্যকে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হয়েছে।'

—'হ্যাঁ, আমি তা ভুলিনি। কিন্তু তারা কোনো বিপদের জন্য প্রস্তুত ছিল না। আমরা আগে থাকতেই সাবধান হয়ে আছি।'

ডাক্তার অসহায়ভাবে বললেন, 'কিন্তু কী আমরা করতে পারি? আজই হোক আর কালই হোক—' বলতে বলতে তিনি থেমে গেলেন। তারপর আবার বললেন, 'এসব যে কোন পাষণ্ডের কীর্তি, সেকথা পর্যন্ত আমরা জানি না।'

—'জানি না নাকি?'

—'আপনি কি কারুকে সন্দেহ করেছেন?'

—'অবশ্য আমার হাতে আসল প্রমাণ বলে কিছুই নেই। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা

তলিয়ে বুঝে একটা সিদ্ধান্তে আমি উপস্থিত হয়েছি। একজনের কথা আমার বারবার মনে পড়ছে।'

ডাক্তার হতভম্বের মতো তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনি কার কথা বলছেন?'

কিন্তু চন্দ্রবাবু কোনো জবাব দেবার আগেই ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলে অমলেন্দু ও মহেন্দ্র। এবং তারা আসন গ্রহণ করবার পরেই ঘরের ভিতরে হন্তদন্তের মতো এসে দাঁড়াল নিত্যানন্দ।

সে বাধো বাধো গলায় বললে, 'আপনারা কিছু মনে করবেন না, কিন্তু কেউ কি বলতে পারেন, স্নানঘরের দরজার পর্দাখানা কোথায় গেল?'

অমলেন্দু বললে, 'স্নানঘরের দরজার পর্দা? তুমি কী বলতে চাও?'

—'পর্দাখানা আর খুঁজে পাচ্ছি না।'

চন্দ্রবাবু বললেন, 'আজ সকালে সেখানা কি যথাস্থানেই ছিল?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

মহেন্দ্র বললেন, 'কী রকম পর্দা?'

—'স্নানঘরের দেওয়াল আর মেজের রং লাল। তার সঙ্গে মিলিয়ে দরজায় ঝোলানো ছিল একখানা লাল রঙের পর্দা।'

অমলেন্দু বললে, 'পর্দাখানা তুমি আর খুঁজে পাচ্ছ না?'

—'আজ্ঞে না।'

মহেন্দ্র শুকনো হাসি হেসে বললে, 'পর্দাখানা তাহলে আপনা আপনিই অদৃশ্য হয়েছে? কথাটা পাগলের মতন শোনাচ্ছে বটে, কিন্তু এ হচ্ছে পাগলেরই বাড়ি। পর্দাখানা নেই বলে কোনো দরকার নেই আর মাথা ঘামাবার। তার কথা ভুলে যাও। একখানা লাল রঙের পর্দা দিয়ে কেউ কারুকে খুন করতে পারে না।'

আর কিছু না বলে নিত্যানন্দ ধীরে ধীরে ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে গেল। ঘরের ভিতরে বসে প্রত্যেকেই তাকাতে লাগল প্রত্যেকের মুখের দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে।

রাত্রে সবাই মৌনমুখে আহার করতে বসল।

বাইরের অন্ধকার থেকে ভেসে আসছে মেঘের আর ঝড়ের গর্জন। ঘরের

ভিতরে জ্বলছে বটে পেট্রলের সমুজ্জ্বল আলো, কিন্তু তবু চারিদিকে যেন ঘনিয়ে আছে একটা থমথমে ভয় ভয় ভাব!

অমলেন্দু হঠাৎ স্তব্ধতা ভঙ্গ করে বললে, 'উপরে তিনটে ঘরে রয়েছে তিনটে মৃতদেহ। সৎকারের কোনো ব্যবস্থাই হল না।'

চন্দ্রবাবু বললেন, এই দুর্যোগে সৎকারের কোনো ব্যবস্থাই হতে পারে না। উপরন্তু যতক্ষণ আমরা বাইরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন না করতে পারি ততক্ষণই ওই দেহগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করা যুক্তিসঙ্গত নয়। আগে পুলিশে খবর দিতে হবে তারপর অন্য কথা।'

সৌদামিনীর সঙ্গে স্বপ্নাও চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে বললে, 'রাত বাড়ছে, আমরা এখন ঘুমোতে যাই।'

মহেন্দ্র বললে, 'কিন্তু ঘুমোবার আগে কেউ যেন ঘরের দরজা বন্ধ করতে ভুলবেন না।'

চন্দ্রবাবুও উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমাদেরও ঘুমোবার সময় হয়েছে। চলুন সবাই, আশা করি কাল সকালেই 'সুপ্রভাত' বলে পরস্পরকে সম্বোধন করতে পারব।'

সকলের শেষে গাত্রোত্থান করে মহেন্দ্র সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলে। একবার ঘরের চারিদিকে বুলিয়ে নিলে তার অতি সতর্ক দৃষ্টি। তারপর নিজের মনে বিড়বিড় করে বললে, 'আজ আর কেউ বোধ হয় হারাধনের ছেলেদের নিয়ে টানাটানি করবে না।'

॥ একাদশ পরিচ্ছেদ ॥

ক

পরদিনের প্রভাতকাল। জলঝড়ের মাত্রা খানিক কমে এসেছে বটে, কিন্তু এখনও সূর্যহীন আকাশ হয়ে আছে মেঘে মেঘময়।

বিছানা থেকে ধড়মড় করে উঠে বসে মহেন্দ্র ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলে, বেলা তখন সাড়ে সাতটা।

বাহির থেকে দরজায় করাঘাত হল। সঙ্গে সঙ্গে অমলেন্দুর গলায় শোনা গেল, 'মহেন্দ্রবাবু, মহেন্দ্রবাবু, এখনও ঘুমোচ্ছেন নাকি?'

মহেন্দ্র ঘরের দরজা খুলে দিয়ে বললে, 'ব্যাপার কী, এত ডাকাডাকি কেন?'

অমলেন্দু বললে, 'নিত্যানন্দ রোজ সকালে সাড়ে ছ-টার সময় আমাদের চা প্রস্তুত করে। কিন্তু আজ এখনও তার কোনো সাড়া বা পাত্তাই নেই। তার ঘরে গিয়েছিলুম, সেখানেও দেখতে পেলুম না তাকে।'

ইতিমধ্যে আর-সকলেও নিজের নিজের ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল।

চন্দ্রবাবু বললেন, 'নিত্যানন্দ রান্নাঘরে গিয়ে বোধ হয় আমাদের প্রাতরাশের আয়োজনে ব্যস্ত আছে। চলুন, দেখে আসি।'

সকলে নীচে নেমে এসে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল। সেখানে টেবিলের উপরে চায়ের কেটলি, পেয়ালা ও খাবারের প্লেটগুলো সাজানো রয়েছে বটে, কিন্তু নিত্যানন্দ অদৃশ্য! এমনকি উনুনে আগুন পর্যন্ত জ্বলছে না। তারপর সকলে প্রবেশ করলে বৈঠকখানার মধ্যে। সে-ঘরও শূন্য।

আচম্বিতে স্বপ্নার মুখে ফুটল অস্ফুট এক আর্তস্বর! বিহ্বলের মতো সে চন্দ্রবাবুর একখানা হাত সজোরে চেপে বলে উঠল, 'দেখুন, দেখুন! টেবিলের দিকে তাকিয়ে দেখুন!'

টেবিলের উপর থেকে অদৃশ্য হয়েছে আর-একটা হারাধনের ছেলে। সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে মাত্র ছয়টা পুতুল!

অল্পক্ষণ পরেই নিত্যানন্দের সন্ধান পাওয়া গেল। উঠানে নেমে উনুনে আগুন জ্বালাবার জন্যে সে জ্বালানি কাঠ কাটতে গিয়েছিল। সেইখানেই তার দেহটা মাটির উপরে পড়ে রয়েছে, হাতের মুঠোর ভিতরে তখনও সে চেপে ধরে আছে একখানা কাটারি!

তার কণ্ঠের উপরে তীক্ষ্ণ অস্ত্রের আঘাত এবং একটু তফাতে পড়ে রয়েছে একখানা রক্তাক্ত ভোজালি!

খ

ডাক্তার বললেন, 'গলার পিছন দিকে আঘাতের চিহ্ন। নিত্যানন্দ যখন হেঁট হয়ে কাঠ কাটছিল, ঠিক সেই সময় নিশ্চয়ই কেউ এসে তাকে আক্রমণ করেছে।'

চন্দ্রবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'এভাবে অস্ত্রাঘাত করবার সময় কি খুব বেশি শক্তির দরকার হয়?'

ডাক্তার গম্ভীর কণ্ঠে বললে, 'আপনি যা বলতে চান, বুঝেছি। হ্যাঁ, এ কাজ কোনো স্ত্রীলোকের দ্বারাও হতে পারে।' বলেই তিনি পিছন দিকে ফিরে তাকালেন। সৌদামিনী ও স্বপ্না সেখানে নেই। তারা তখন গিয়েছিল রান্নাঘরের ভিতরে।

ভোজালির হাতলটা বিশেষ মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করতে করতে মহেন্দ্র বললে, 'উঁহু, আঙুলের দাগ নেই। হাতলটা যেন ভালো করে মুছে ফেলা হয়েছে।'

হঠাৎ শোনা গেল খিলখিল করে হাসির শব্দ; সবাই ফিরে দাঁড়াল সচকিতে। উঠানের উপরে এসে দাঁড়িয়েছে স্বপ্না। খিলখিল করে হাসতে হাসতে থেমে থেমে সে বললে, 'হারাধনের ছেলে, হারাধনের ছেলে! বলতে পারো হারাধনের ছেলেগুলো যায় কোথায়? হা হা হা!'

স্বপ্না কি হঠাৎ পাগল হয়ে গিয়েছে? সবাই ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল তার দিকে।

স্বপ্না বলে উঠল অস্বাভাবিক উচ্চ কণ্ঠে :

'অমন ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থেকো না। তোমরা কি ভাবছ আমি পাগল? আমি ঠিক কথাই বলছি। হারাধনের ছেলে, হারাধনের ছেলে! ও, তোমরা কি সেই ছেলে-ভুলানো ছড়াটা শোনোনি?—

'হারাধনের নয়টি ছেলে কাটতে গেল কাঠ,
একটি মল দুখান হয়ে—' হা হা হা!

সে উদ্ভ্রান্তের মতো হাসতেই লাগল।

ডাক্তার বললেন, 'হিস্টিরিয়া, এ যে স্পষ্ট হিস্টিরিয়ার লক্ষণ! সবুর করুন।'

তিনি স্বপ্নার দিকে এগিয়ে গেলেন এবং তার গণ্ডদেশে করলেন সজোরে এক চপেটাঘাত। সে চমকে উঠল, দু-এক বার হেঁচকি তুললে এবং ঢোঁক গিললে। নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল মিনিট খানেক। তারপর স্বাভাবিক কণ্ঠেই বললে, 'আপনাকে ধন্যবাদ। এইবারে আমি সামলে নিয়েছি।'

তারপর সে আবার রান্নাঘরের দিকে যেতে যেতে বললে, 'সৌদামিনী দেবী আর আমি চা-টা তৈরি করব। আমাদের দয়া করে উনুনে আগুন দেবার জন্যে কিছু কাঠ এনে দিন।'

মহেন্দ্র বললে, 'ডাক্তারবাবু, আপনার চিকিৎসা ফলপ্রদ হয়েছে।'

ডাক্তার কাঁচুমাচু মুখে বললেন, 'বাধ্য হয়েই আমাকে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা

করতে হল। এত বিপদের ভিতরে আবার হিস্টিরিয়া নিয়ে জড়িয়ে পড়া চলে না।'

অমলেন্দু বললে, 'স্বপ্না দেবীকে দেখলে তো মনে হয় না ওঁর হিস্টিরিয়া আছে।'

ডাক্তার বললেন, 'না, না, স্বপ্না দেবী হচ্ছেন বুদ্ধিমতী আর স্বাস্থ্যবতী মেয়ে। কিন্তু এই আচমকা বিপদের ধাক্কা উনি সামলাতে পারেননি।'

॥ দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ॥

ক

সকলের চা-পান ও জলখাবার খাওয়া হয়ে গেল।

চন্দ্রবাবু বললেন, 'আবার কিছু আলোচনা করা দরকার হয়ে পড়েছে। চলুন, এইবারে এইঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে বসা যাক।'

সকলেই তাঁর কথায় সায় দিলে।

স্বপ্না বললে, 'আমি তাড়াতাড়ি প্লেটগুলো সাফ করে নিয়েই যাচ্ছি।'

সৌদামিনী চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়েই আবার ধপাস করে বসে পড়ে বললেন, 'উঃ মাগো!'

চন্দ্রবাবু চমকে শুধোলেন, 'ব্যাপার কী সৌদামিনী দেবী?'

সৌদামিনী বললেন, 'আমার মাথাটা কেমন ঘুরছে।'

ডাক্তার বোস তাঁর দিকে এগিয়ে গিয়ে বললেন, 'মাথা ঘুরছে? খুবই স্বাভাবিক! এখানে বিপদের উপরে বিপদ। দাঁড়ান, আমি আপনাকে একটা ওষুধ তৈরি করে দিচ্ছি।'

—'না!' সৌদামিনী এমন চিৎকার করে শব্দটা বলে উঠলেন যে, সকলেই সবিস্ময়ে তাঁর দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখলে। তাঁর মুখের উপরে সন্দেহের স্পষ্ট চিহ্ন।

ডাক্তার আহত কণ্ঠে বললেন, 'বেশ, আপনার যা অভিরুচি।'

সৌদামিনী বললেন, 'আমি কিছুই খাব না—আমি কিছুই খেতে চাই না। কিছুক্ষণ এখানে চুপ করে বসে থাকলেই আমার মাথা ঘোরা আপনিই সেরে যাবে।'

খ

আর-সকলেই বৈঠকখানায় বসে সৌদামিনীর জন্যে অপেক্ষা করছিল।

মহেন্দ্র বললেন, 'আমি সৌদামিনী দেবীকে সন্দেহ করি।'

ডাক্তার বললেন, 'কেন?'

—'উনি আমাদের কাছে থেকেও কেমন ছাড়া ছাড়া হয়ে থাকেন।'

স্বপ্না বললে, 'আমরা দুজনে যখন চা তৈরি করছিলুম, তখন সৌদামিনী দেবীর কথাগুলো কেমন যেন অসংলগ্ন বলে মনে হচ্ছিল।'

অমলেন্দু বললে, 'তার দ্বারা কিছুই প্রমাণিত হয় না। আপাতত আমাদের সকলেরই মাথা অল্প-বিস্তর খারাপ হয়ে গিয়েছে।'

চন্দ্রবাবু বললেন, 'প্রায় পনেরো মিনিট সময় কেটে গেল। এইবারে সৌদামিনী দেবীকে ডেকে আনা দরকার।'

স্বপ্না উঠে পাশে খাবার ঘরে ঢুকেই তীব্রকণ্ঠে চিৎকার করে উঠল। সকলে সেখানে ছুটে গিয়ে দেখলে, সৌদামিনী চেয়ারের উপরে বসে আছেন বটে, কিন্তু ওঁর ওষ্ঠাধর নীলাভ এবং তাঁর বিস্ফারিত দুই চক্ষে নেই জীবন্ত দৃষ্টি।

মহেন্দ্র সচকিত কণ্ঠে বলে উঠল, 'এ কী ব্যাপার? সৌদামিনী দেবী যে বেঁচে নেই!'

চন্দ্রবাবু ধীরে ধীরে মৃদুস্বরে বললেন, 'আমাদের ভিতর থেকে আর-একজনও সকল সন্দেহ থেকে মুক্তিলাভ করলেন—কিন্তু অত্যন্ত অসময়ে।'

ডাক্তার মৃতদেহের উপরে হেঁট হয়ে তার ওষ্ঠাধরের আঘ্রাণ নিলেন এবং দুই চোখের পাতা পরীক্ষা করতে লাগলেন।

অমলেন্দু বললে, 'মৃত্যুর কারণ কী ডাক্তার? আমরা তো একটু আগেই সৌদামিনী দেবীকে জীবন্ত অবস্থায় দেখে গিয়েছিলুম।'

মৃতদেহের কণ্ঠের দক্ষিণ দিকে একটি চিহ্নের প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করে ডাক্তার বললেন, 'ওটা হচ্ছে 'হাইপোডার্মিক সিরিঞ্জের চিহ্ন।'

চন্দ্রবাবু বললেন, 'কোনো বিষের জন্যে কি ওঁর মৃত্যু হয়েছে?'

ডাক্তার বললে, 'মনে তো হচ্ছে সায়ানাইড। খুব সম্ভব পোটাসিয়াম সায়ানাইড। সৌদামিনী দেবীর মৃত্যু হয়েছে মুহূর্তের মধ্যে।'

অমলেন্দু চিৎকার করে বললে, 'এ কোনো উন্মাদগ্রস্তের কীর্তি! পাগল হয়ে গিয়েছি আমরা সকলেই!'

চন্দ্রবাবু প্রশান্ত কণ্ঠে বললেন, 'না, আমরা এখনও বিবেচনা করবার শক্তি হারাইনি। এই বাড়িতে কেউ কি সঙ্গে করে 'হাইপোডার্মিক সিরিঞ্জ' এনেছে?'

ডাক্তার যেন কিছু বিচলিত কণ্ঠে বললেন, 'হ্যাঁ, আমি এনেছি।'

চারজোড়া চক্ষু আকৃষ্ট হল ডাক্তারের দিকে। চারজোড়া বিজাতীয় সন্দেহপূর্ণ চক্ষু!

ডাক্তার বোস বললেন, 'ডাক্তারদের সঙ্গে সর্বদাই থাকে হাইপোডার্মিক সিরিঞ্জ।'

চন্দ্রবাবু বললেন, 'ঠিক কথা। কিন্তু ডাক্তার, সেটা এখন কোথায় আছে বলতে পারেন কি?'

—'আমার ঘরে সুটকেসের ভিতরে।'

চন্দ্রবাবু বললেন, 'চলুন—সেটা এখন সেখানে আছে কি না দেখে আসা যাক।'

পাঁচ জন একসঙ্গে নীরবে দোতলায় গিয়ে উঠল।

ডাক্তারের সুটকেসের ভিতরটা তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখা হল।

'হাইপোডার্মিক সিরিঞ্জ' পাওয়া গেল না।

গ

ডাক্তার ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললেন, 'জিনিসটা কেউ তাহলে চুরি করেছে।'

আবার চারজোড়া চক্ষু দারুণ সন্দেহে বিষাক্ত হয়ে উঠল!

চন্দ্রবাবু বললেন, 'এ-ঘরে আছি আমরা পাঁচ জন। এই পাঁচ জনের মধ্যে নিশ্চয়ই এক জন হচ্ছে হত্যাকারী! ডাক্তার আপনার সঙ্গে আছে কী ওষুধ?'

ডাক্তার উত্তর দিলেন, 'আপনারা নিজেরাই অনায়াসে খুঁজে দেখতে পারেন।'

চন্দ্রবাবু বললেন, 'অমলেন্দুবাবু, আপনার কাছে আছে একটা রিভলভার?'

অমলেন্দু তপ্তস্বরে বললে, 'হ্যাঁ আছে, তাতে হয়েছে কী?'

—'বর্তমান অবস্থায় আমাদের কারুর কাছেই কোনো বিপজ্জনক জিনিস থাকা উচিত নয়। ওই রিভলভারটা এখন আমাদের জিম্মায় জমা রাখলেই ভালো হয়। আমরা ওটা কোনো নিরাপদ জায়গায় রেখে দেব।'

অমলেন্দু বেগে মাথা নেড়ে বললে, 'মোটেই নয়! রিভলভারটা কিছুতেই আমি কাছছাড়া করব না।'

বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে চন্দ্রবাবু বললেন, 'অমলেন্দুবাবু, আমাদের এই ভূতপূর্ব

ডিটেকটিভ মহেন্দ্রবাবুকে দেখলে মনে হয়ে, উনি আপনার চেয়ে বলবান ব্যক্তি। তার উপরে ওঁর সঙ্গে আছি আমরা আরও তিন জন। বুঝতেই পারছেন, আপনি এখন আমাদের বাধা দেবার চেষ্টা করলেও বিফল হবেন।'

দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে অমলেন্দু বললে, 'বেশ, এ-কথার উপরে আমার আর কিছু বলবার নেই।'

চন্দ্রবাবু ঘাড় নেড়ে বললেন, 'এইবারে আপনি বুদ্ধিমানের মতন কথা বলছেন। রিভলভারটা কোথায় আছে?'

—'আমার ঘরে একটা টেবিলের দেরাজের ভিতরে।'

—'উত্তম!'

—'আমি সেটা এখুনি এনে দিচ্ছি।'

—'আপনি একলা কেন, আমরা সকলেই একসঙ্গে আপনার ঘরে যাব।'

ভ্রূকুটি করে অমলেন্দু বললে, 'আপনি হচ্ছেন এক বিষম সন্দিগ্ধ ব্যক্তি। কারুর কথাতেই বিশ্বাস করেন না।'

কিন্তু অমলেন্দুর ঘরে গিয়ে দেখা গেল তার টেবিলের দেরাজের ভিতরে রিভলভার নেই।

ঘ

অমলেন্দু বললে, 'তারপর?'

চন্দ্রবাবু বললেন, 'এখন আমাদের প্রধান সমস্যা হচ্ছে, অমলেন্দুবাবুর রিভলভারটা গেল কোথায়?'

মহেন্দ্র বললে, 'এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন একমাত্র রিভলভারের মালিকই?'

অমলেন্দু উগ্রকণ্ঠে বললেন, 'নির্বোধ! রিভলভার কোথায় গেছে আমি তার কী জানি? নিশ্চয়ই কেউ সেটা চুরি করেছে।'

চন্দ্রবাবু শুধোলেন, 'রিভলভারটা শেষ কখন আপনি দেরাজের ভিতরে দেখেছেন?'

—'কাল রাত্রে, শোবার আগে।'

—'তাহলে নিশ্চয়ই সেটা চুরি গিয়েছে আজ সকালে। হয়তো যখন আমরা নিত্যানন্দের মৃতদেহ নিয়ে ব্যস্ত হয়েছিলুম। সেই সময়েই।'

॥ ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ॥

—'আমাদের মধ্যে একজন, আমাদের মধ্যে একজন, আমাদের মধ্যে একজন!'

প্রত্যেকেরই মস্তিষ্কের মধ্যে এই তিনটি শব্দই বারংবার ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

পাঁচ জন লোক—পাঁচ জন আতঙ্কগ্রস্ত লোক! পাঁচ জনের প্রত্যেকেই অত্যন্ত সতর্ক হয়ে লক্ষ করছে পরস্পরের প্রত্যেকটি ভাবভঙ্গি। তাদের মনের বিষম সন্দেহ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তাদের মুখে-চোখে, তা গোপন করার চেষ্টাও কেউ করছে না।

পাঁচ জন লোক—প্রত্যেকেই পরস্পরের শত্রু! কেবল কোনো রকমে আত্মরক্ষা করবার জন্যেই পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস হারিয়েও তারা পরস্পরের সঙ্গে বাস করছে এক জায়গায়।

সেদিন রান্নাবান্নার কথা কারুরই মনে জাগল না। ভাঁড়ার ঘরে কয়েকরকম বিস্কুটের টিন এবং 'এয়ার টাইট' টিনের পাত্রে বিলাতি ফল ও দেশি রসগোল্লা ছিল। তাই খেয়েই সকলে নির্বাপিত করলে জঠরাগ্নি।

ডাক্তার বোস বললেন, 'এই ভয়াবহ বাড়ির ভিতরে এমন করে বন্দি হয়ে থাকতে আর ইচ্ছে করছে না।'

মহেন্দ্র বললে, 'কিন্তু বাইরে যাবারও কোনো উপায় নেই। তাকিয়ে দেখুন।'

হ্যাঁ, বাইরে আবার নেমেছে ঝরঝরে বৃষ্টি-ধারা এবং আবার প্রবল হয়ে উঠেছে প্রচণ্ড ঝোড়ো-হাওয়া! উচ্চতর হয়ে আবার ভেসে আসছে সমুদ্রের উচ্ছ্বসিত কোলাহল।

ডাক্তার বললেন, 'চলুন আমরা দোতলার হলঘরে বসিগে যাই। নীচেটা আর আমার ভালো লাগছে না। সত্যবালা ছাড়া আর সকলেরই মৃত্যু হয়েছে একতলাতেই।'

মহেন্দ্র, অমলেন্দু ও স্বপ্নাও এই প্রস্তাবে সায় দিলে। তারা একসঙ্গে উপরে উঠে গেল।

দোতলার হলঘর থেকে আরও ভালো করে দেখা যেতে লাগল দ্বীপের প্রাকৃতিক দৃশ্য।

সারা আকাশ ভরে জমে উঠেছে মেঘের পর মেঘের অশ্রান্ত মিছিল। মাঝে মাঝে লক লক করে জ্বলে উঠছে বিদ্যুতের অগ্নিসর্প! ধারাপাত-ধ্বনিতে চারিদিক

পরিপূর্ণ। অরণ্যের বড়ো বড়ো গাছগুলো আর্তনাদ করে হেলে হেলে পড়ছে উন্মত্ত ঝড়ের ধাক্কার পর ধাক্কায়। সমুদ্রকে দেখাচ্ছে এক ক্রুদ্ধ ও অনন্ত জলদানবের মতো, উদ্দাম বেগে উৎকট স্বরে চিৎকার করতে করতে অগণ্য তরঙ্গবাহু তুলে বারংবার সে দ্বীপের উপরে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছে আর ফিরে যাচ্ছে—ঝাঁপিয়ে পড়ছে আর ফিরে যাচ্ছে।

কারুর মুখেই একটি কথা নেই। কিন্তু ওই বিশাল সমুদ্রের মতোই যে তাদের বুকের ভিতরটা তোলপাড় করছিল, এটা বোঝা যায় তাদের বিভ্রান্ত মুখের উপরে দৃষ্টিপাত করলেই।

স্বপ্নার দেহের ভিতরটা কেমন শীত শীত করতে লাগল, একটা কোনো গরম গাত্রবস্ত্র আনবার জন্যে উঠে দাঁড়িয়ে এদিকে-ওদিকে তাকিয়ে বললে, 'চন্দ্রবাবু কোথায়? তিনি তো এখানে নেই! আমি ভেবেছিলুম তিনিও আমাদের সঙ্গে সঙ্গে উপরে এসেছেন।'

ডাক্তার বললেন, 'না, তিনি বৈঠকখানাতেই বসে আছেন।'

প্রত্যেকেই আবার প্রত্যেকের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলে ত্রস্ত দৃষ্টিতে।

অমলেন্দু বললেন, 'এই বিপজ্জনক বাড়িতে তিনি বুড়োমানুষ একলা বসে আছেন!'

মহেন্দ্র তৎক্ষণাৎ একলাফে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'ভালো কথা নয়, এ ভালো কথা নয়! চলুন, আমরা সকলে গিয়ে তাঁকে উপরে ডেকে আনি।'

সকলে একসঙ্গে আবার নেমে গেল একতলায়। সর্বাগ্রে যাচ্ছিলেন ডাক্তার বোস। বৈঠকখানার দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ভিতরের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ তিনি যেন আড়ষ্ট হয়ে গেলেন! বাকি তিন জনে তাঁর দেহের এপাশ-ওপাশ থেকে দৃষ্টিপাত করলে বৈঠকখানার ভিতর দিকে।

দেখা গেল, একখানা সোফার উপরে চন্দ্রবাবু চুপ করে বসে আছেন। কিন্তু তাঁর গায়ে জড়ানো আছে একখানা টকটকে লাল রঙের গাত্রাবরন এবং তাঁর মাথায় আছে পরচুলা—হাইকোর্টের বিচার-কক্ষে জজেরা যে-রকম পরচুলা মাথায় পরে থাকেন।

এই একান্ত অভাবিত ও অস্বাভাবিক দৃশ্য দেখে সকলেরই বুক ছাঁৎ ছাঁৎ করে উঠল।

ডাক্তার বোস মাতালের মতন টলতে টলতে অগ্রসর হয়ে চন্দ্রবাবুর সেই স্থির

মূর্তির পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। একবার তাঁর মুখের দিকে তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিপাত করেই তিনি শীঘ্র হস্তে তাঁর পরচুলা ধরে একটা টানা মারলেন। পরচুলাটা ঘরের মেঝের উপরে পড়ে গেল; দেখা গেল, চন্দ্রবাবুর মাথার সামনেকার কেশহীন অংশটা। ঠিক সেইখানেই রয়েছে একটা রক্তাক্ত ছিদ্র!

ফিরে দাঁড়িয়ে ডাক্তার বোস বললেন, 'চন্দ্রবাবুকে গুলি করা হয়েছে।'

মহেন্দ্র বলে উঠল, 'রিভলভার! সেই রিভলভারটা আমরা খুঁজে পাচ্ছি না।'

জীবনহীন স্বরে ডাক্তার বোস বললেন, 'রিভলভার দিয়ে কেউ গুলি ছুড়েছে—চন্দ্রবাবুর মৃত্যু হয়েছে মুহূর্তের মধ্যেই।'

স্বপ্না হেঁট হয়ে পড়ে মাটির উপর থেকে পরচুলাটা তুলে নিলে। তারপর সভয়ে বলে উঠল, 'এ যে দেখছি পশমে তৈরি! কালকেই সৌদামিনী দেবী বলেছিলেন, তাঁর এক বান্ডিল পশম তিনি আর খুঁজে পাচ্ছেন না!'

মহেন্দ্র বললে, 'চন্দ্রবাবু ওই লাল রঙের গায়ের কাপড়! ওটা হচ্ছে সেই স্নানঘরের হারিয়ে যাওয়া পর্দা ছাড়া আর কিছুই নয়।'

স্বপ্না ভয়ার্ত অস্ফুট কণ্ঠে বললে, 'এই বীভৎস দৃশ্য দেখাবার জন্যেই কি হত্যাকারী ওই পর্দা আর পশমের বান্ডিল চুরি করেছে?'

আচম্বিতে অমলেন্দু হা হা করে অট্টহাস্য করে বলে উঠল, 'এইখানেই হল কঠোর নির্দয় বিচারপতি চন্দ্রকান্ত চৌধুরির জীবন-নাট্যের বিয়োগান্ত সমাপ্তি! বিচারগৃহে বসে জজের পরচুলা মাথায় পরে তিনি আর কারুর উপরেই প্রাণদণ্ড দিতে পারবেন না, কারণ আজই তিনি কোনো অজ্ঞাত হত্যাকারীর আদেশে নিজেই লাভ করেছেন প্রাণদণ্ড!'

॥ চতুর্দশ পরিচ্ছেদ ॥

ক

তারা চন্দ্রবাবুর দেহকে তুলে নিয়ে তাঁর ঘরের ভিতরে গিয়ে রেখে এল।

বৈঠকখানায় ফিরে এসে মহেন্দ্র সোজা গিয়ে দাঁড়াল সেই টেবিলের সামনে, যার উপরে আগে ছিল দশটা হারাধনের ছেলের মূর্তি, কিন্তু এখন তাদের সংখ্যা হচ্ছে মাত্র চার।

মহেন্দ্র গম্ভীর স্বরে বললে, 'আমরা হচ্ছি গুনতিতে চার জন মানুষ, আর

আমাদের সামনেও রয়েছে চারটে পুতুল। চার জন মানুষ আর চারটে পুতুল। একটা করে মানুষ মরবে আর একটা করে পুতুল অদৃশ্য হবে। কিন্তু শেষ পুতুলটা নিশ্চয়ই অদৃশ্য হবে না। আমাদের মধ্যে যে হত্যাকারী, শেষ পুতুলটা ভেঙে ফেলে নিশ্চয়ই সে আত্মহত্যা করবে না। অতএব—'

ডাক্তার বললেন, 'অতএব?'

মহেন্দ্র বললে, 'অতএব শেষ পুতুলটা নয় জন লোকের মৃত্যুর পরও ওই টেবিলের উপরেই দাঁড়িয়ে থাকবে। কিন্তু তখন যে তার দিকে তাকিয়ে থাকবে, সে ব্যক্তির নাম কী?'

সবাই সচমকে দৃষ্টিপাত করলে পরস্পরের মুখের দিকে। সে দৃষ্টিতে ছিল না কেবল বিভীষিকার ভাব, ছিল বিষম এক বিরাগভরা সন্দেহ।

মহেন্দ্র বললে, 'চন্দ্রবাবুকে মারবার জন্যে হত্যাকারী ছুড়েছিল রিভলভার।' আমরা সকলেই তখন এই বাড়িতেই উপস্থিত ছিলুম। কিন্তু আমরা কেউ শুনতে পাইনি রিভলভারের শব্দ। এর কারণ কী?'

অমলেন্দু বললে, 'এর কারণ হচ্ছে ঝড়ের আর সমুদ্রের গর্জন। মাঝে মাঝে বাজও ডাকছিল। এত গোলমালের ভিতরে ডুবে গিয়েছিল সেই রিভলভারের শব্দ।'

সে রাত্রে তারা সকাল সকালই শয়নগৃহের দিকে অগ্রসর হল।

মহেন্দ্র বললে, 'আজ রাত্রে নিশ্চয়ই আমাদের কারুরই ঘুম হবে না। জেগে থাকবে হত্যাকারী, আর একটা শিকারের সন্ধানে। আর জেগে থাকবে বাকি তিন জনও দারুণ আতঙ্কে। হত্যাকারী এখন সশস্ত্র, 'রিভলভার' এখনও খুঁজে পাওয়া যায়নি।'

খ

প্রত্যেকেই নিজের নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল এবং সশব্দে দরজা করলে অর্গলবদ্ধ! চার জন আতঙ্কগ্রস্ত মানুষ, প্রত্যেকেই যে-কোনোরকমে আত্মরক্ষা করবার জন্যে প্রস্তুত।

অমলেন্দু ড্রেসিং টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। আয়নাতে নিজের মুখ দেখে মনে মনেই বললে—অমলেন্দু, তোমার মুখের ভাব অস্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। সাবধান, শেষটা তুমিও যেন পাগল হয়ে যেয়ো না।

হঠাৎ অকারণেই টেবিলের একটা দেরাজ টেনে তার ভিতরে সে করলে দৃষ্টিনিক্ষেপ।

দেরাজের ভিতরে আবার ফিরে এসেছে তার রিভলভারটা।

সে দাঁড়িয়ে রইল স্তম্ভিত ভাবে।

গ

প্রাক্তন গোয়েন্দা মহেন্দ্র এগিয়ে গিয়ে বসল বিছানার একপাশে। তার চক্ষের ভাব হিংস্র, কোনো শিকারি জন্তুর মতো সে যেন যে-কোনো শিকারের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছে। বিছানায় শয়ন করবার জন্যে তার একটুও ইচ্ছা হল না। বিপদ এখন খুব কাছেই ঘনিয়ে এসেছে—দশ জনের মধ্যে বাকি আছে মাত্র চার জন। অতি শীঘ্রই নিশ্চয় আর-একজনকেও বিদায় নিতে হবে। কিন্তু এবারে যে তার পালা নয়, সে বিষয়ে তার কোনোই সন্দেহ নেই।

হঠাৎ সে উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে উঠল।

বাইরে তার দরজার সামনেই জাগল কার পদশব্দ। পা টিপে টিপে কেউ চলছে বটে, কিন্তু মহেন্দ্রর সতর্ক কর্ণকে সে ফাঁকি দিতে পারেনি।

তাড়াতাড়ি সে ছুটে গিয়ে দরজার উপরে কান পেতে শুনতে লাগল। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই কারুর পদশব্দ। সিঁড়ির উপর দিয়ে শব্দটা নেমে যাচ্ছে নীচের দিকে।

মহেন্দ্র হঠাৎ দরজাটা খুলে ফেলে বাঘের মতো লাফিয়ে বাইরে গিয়ে পড়ল। কিন্তু কোথাও কারুকেই দেখতে পেলে না, একটা ছায়া পর্যন্ত না। সে সর্বাগ্রে ছুটে গেল স্বপ্নার ঘরের দিকে। দরজার উপরে সজোরে করাঘাত করতেই ভিতর থেকে স্বপ্না সভয়ে বলে উঠল, 'কে, কে, কে?'

স্বপ্না তাহলে বাইরে বেরিয়ে আসেনি!

তারপর সে গেল ডাক্তারের ঘরের দিকে। সে ঘরে দরজা ছিল ভেজানো, ধাক্কা দিতেই খুলে গেল। ঘরের ভিতরে কেউ নেই। ডাক্তারের শয্যা শূন্য।

সে চেঁচিয়ে ডাকলে, 'ডাক্তার বোস, ডাক্তার বোস!'

মহেন্দ্র দৌড়ে গেল অমলেন্দুর ঘরের দিকে। দরজায় করাঘাত করতেই ভিতর থেকে অমলেন্দু দিলে সাড়া।

মহেন্দ্র চিৎকার করে ডাকলে, 'অমলেন্দুবাবু, অমলেন্দুবাবু! শীঘ্র বাইরে বেরিয়ে আসুন।'

মিনিটখানেক পরেই খুলে গেল ঘরের দরজা। অত্যন্ত সন্তর্পণে বাইরে বেরিয়ে এল অমলেন্দু। তার ডান হাতটা আছে পকেটের ভিতরে।

সে উগ্রকণ্ঠে বললে, 'রাত দুপুরে এ-সব কী কাণ্ড?'

ততক্ষণে স্বপ্নাও বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে।

মহেন্দ্র বললে, 'আমি বাইরে শুনতে পেয়েছি কার পায়ের শব্দ। বেরিয়ে এসে দেখি ডাক্তারের ঘরের দরজা খোলা আর ডাক্তার নেই ঘরের ভিতরে!'

অমলেন্দু বললে, 'বটে, বটে, তাই নাকি? এই নিশুতি রাতে, এই ভয়াবহ বাড়িতে ডাক্তার নেই তার ঘরে? তাহলে সেই কি যত নষ্টের গোড়া?'

মহেন্দ্র বললে, 'এখন আমাদের ওই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হবে।'

অমলেন্দু বললে, 'স্বপ্না দেবী, আপনি আবার নিজের ঘরের ভিতরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিন। এরপর আমরা দুজনেই যদি একসঙ্গে এসে আপনাকে ডাকি, তবেই আপনি দরজা খুলে দেবেন। আর কেউ ডাকলে দরজা খুলবেন না। বুঝেছেন?'

স্বপ্না বললে, 'বুঝেছি! আমি নারী বটে, কিন্তু নির্বোধ নই।' সে আবার চলে গেল তার ঘরের দিকে।

মহেন্দ্র বললে, 'কিন্তু ডাক্তারকে খুঁজতে হবে অত্যন্ত সাবধানে। ভুলে যাবেন না, তার হাতে আছে একটা গুলিভরা রিভলভার।'

নীরস হাস্য করে অমলেন্দু বললে, 'ভুল মহেন্দ্রবাবু, ভুল! রিভলভারটা এখন আছে আমার পকেটেই! এই দেখুন!' সে পকেটের ভিতর থেকে বার করে দেখালে রিভলভারের অর্ধেকটা।

মহেন্দ্রর মুখ রক্তহীন হয়ে গেল এক মুহূর্তে, সে আঁতকে উঠে দুই পা পিছিয়ে গিয়ে দাঁড়াল।

অমলেন্দু হা হা করে হেসে উঠে বললে, 'মহেন্দ্রবাবু, নির্বোধের মতন ব্যবহার করবেন না। আমি যদি গুলি করে আপনাকে মারতে চাইতুম তাহলে রিভলভারের কথা আপনার কাছে প্রকাশ করতুম না। এখন চলুন, ডাক্তার কোথায় লুকিয়ে আছে, খুঁজে দেখা যাক।'

আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেছে অভাবিতভাবে। দমকা হাওয়া এখনও থেকে থেকে কেঁদে উঠছে বটে, কিন্তু নির্মেঘ আকাশে দেখা দিয়েছে চাঁদের জ্যোতির্ময়

মুখ। চারিদিকে জ্যোৎস্নার দুগ্ধধবল স্বচ্ছ প্রলেপ। সমুদ্রের তরঙ্গে তরঙ্গে ঝলকে ঝলকে উঠছে লক্ষ লক্ষ হীরার কণা।

কিন্তু মহেন্দ্র ও অমলেন্দুর সমস্ত অন্বেষণই ব্যর্থ হল। কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না ডাক্তারকে।

ঘ

প্রায় শেষ রাত্রি।

ঘুম নেই স্বপ্নার চোখে। বিছানার উপরে চুপ করে সে বসে আছে অত্যন্ত ছন্নছাড়ার মতো।

হঠাৎ ঘরের দরজায় হল দুমদুম করে করাঘাত। স্বপ্না চমকে বলে উঠল, 'কে, কে?'

একসঙ্গে মহেন্দ্র ও অমলেন্দুর কণ্ঠে শোনা গেল, 'আমরা, দরজা খুলে দিন।'

দরজা খুলে দিতেই তারা দুজনে ঘরের ভিতরে এসে ঢুকল।

অমলেন্দু বললে, 'স্বপ্না দেবী, কোনো নতুন খবর আছে?'

—'না, কিন্তু আপনাদের খবর কী?'

—'ডাক্তার অদৃশ্য হয়েছে।'

স্বপ্না চিৎকার করে বলে উঠল, 'কী?'

—'ডাক্তার এই দ্বীপের ভিতরে কোথাও নেই।'

স্বপ্না অবিশ্বাসের স্বরে বললে, 'হতেই পারে না। নিশ্চয় সে কোথাও লুকিয়ে আছে! কখন হঠাৎ এসে আমাদের কারুকে আক্রমণ করবে।'

মহেন্দ্র বললে, 'ঝড় নেই, মেঘ নেই, বৃষ্টি নেই। চারিদিকে ফুটফুটে চাঁদের আলো। আমরা ঈগলপাখির মতো তীক্ষ্ণ চোখে সারা দ্বীপটা তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখেছি। তবু ডাক্তারের কোনোই পাত্তা পাওয়া গেল না। সে অদৃশ্য হয়েছে—হাওয়া হয়ে যেন মিশিয়ে গিয়েছে হাওয়ার ভিতরে!'

অমলেন্দু ভারিক্কে গলায় বললে, 'আমরা আর-একটা জিনিস লক্ষ করেছি। বৈঠকখানার টেবিলের উপরে দাঁড়িয়ে আছে এখন মাত্র তিনটে মাটির পুতুল।'

॥ পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ ॥

ক

পরদিনের সকালবেলা।

প্রায় রাত চারটের সময় স্বপ্নার চোখে এসেছিল ঘুম, আজ সকালবেলা আটটার আগে সে আর বিছানা থেকে উঠতে পারলে না।

কিন্তু বিছানা থেকে নামতে না নামতেই ঘরের বাহির থেকে শুনতে পেলে অমলেন্দু ও মহেন্দ্রর কণ্ঠস্বর। তারা তার নাম ধরে ডাকাডাকি করছে।

দরজা খুলে দিতেই অমলেন্দু উত্তেজিত কণ্ঠে বললে, 'সমুদ্র আবার ডাক্তারকে ফিরিয়ে দিয়েছে।'

কথার অর্থ ধরতে না পেরে জিজ্ঞাসু চোখে চেয়ে রইল স্বপ্না।

মহেন্দ্র বললে, 'বুঝতে পারছেন না? ডাক্তারকে সমুদ্র গ্রাস করেছিল কাল রাত্রে। আজ আবার ডাঙার দিকে পাঠিয়ে দিয়েছে তার মৃতদেহকে। আমরা দুজনে খুব ভোরবেলা উঠে সমুদ্রের ধারে গিয়েছিলুম, ডাক্তারের দেহ দেখতে পেয়ে তুলে নিয়ে এসেছি।'

স্বপ্না শিউরে উঠে প্রায় রুদ্ধকণ্ঠে বললে, 'কোথায়, কোথায় সে দেহ?'

অমলেন্দু বললে, 'আমরা ডাক্তারের দেহটাকে তাঁর ঘরের ভিতরেই রেখে এসেছি। আপনার আর সে দৃশ্য দেখে কাজ নেই।'

স্বপ্না খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর ধীরে ধীরে বললে, 'আচ্ছা, আপনারা এখন নীচে যান। আমি জামাকাপড় বদলে এখনই গিয়ে চা আর খাবার তৈরি করে দিচ্ছি। যতই বিপদ হোক, আমরা তো উপোস করে থাকতে পারব না!'

অমলেন্দু বললে, 'স্বপ্না দেবী, আপনি জামাকাপড় বদলে নিশ্চিন্ত হয়ে নীচে আসুন। ততক্ষণে আমরা নিজেরাই উনুনে আগুন দিয়ে চায়ের কেটলি চড়িয়ে প্রস্তুত হয়ে থাকব।'

সিঁড়ি দিয়ে নীচের দিকে নামতে নামতে মহেন্দ্র বললে, 'অমলেন্দুবাবু, আপনার রিভলভারটা যদি সমুদ্রের জলে বিসর্জন দিতে পারেন, তাহলে আমি অত্যন্ত খুশি হই।'

—'কেন বলুন দেখি?'

—'ওই রিভলভারটা যতক্ষণ আপনার কাছে থাকবে, আমি নিজেকে নিরাপদ বলে ভাবতে পারব না।'

অমলেন্দু বললে, 'প্রাণ থাকতে এ রিভলভারটা আমি কাছছাড়া করতে পারব না। এইসব বাজে কথা না ভেবে আপনি এখন কতকগুলো কাঠ কেটে আনুন দেখি! আমি রান্নাঘরে গিয়ে চায়ের তোড়জোড় শুরু করে দিই।'

খ

তার পরের ঘটনা ঘটল অত্যন্ত তাড়াতাড়ি।

অমলেন্দু টেবিলের উপরে প্লেটগুলো সাজাতে সাজাতেই স্বপ্না এসে তার সঙ্গে যোগদান করলে।

অমলেন্দু বললে, 'সবই প্রস্তুত, মহেন্দ্রবাবু এখন কাঠ নিয়ে এলেই হয়।'

তার মুখের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই উঠানের দিক থেকে শোনা গেল একটা প্রচণ্ড আর্তনাদ ও কোনো গুরুভার জিনিস পড়ে যাওয়ার শব্দ।

স্বপ্না সচকিত কণ্ঠে বলে উঠল, 'ও কার আর্তনাদ অমলেন্দুবাবু, ও কীসের শব্দ?'

অমলেন্দু বেগে বেরিয়ে গেল রান্নাঘরের ভিতর থেকে।

স্বপ্না আড়ষ্ট হয়ে মিনিট দুই দাঁড়িয়ে রইল, তারপর ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়ল একখানা চেয়ারের উপর।

উঠানের দিকে থেকে শোনা গেল অমলেন্দুর ভয়ার্ত কণ্ঠস্বর—'স্বপ্না দেবী, স্বপ্না দেবী! শীঘ্র এদিকে আসুন!'

স্বপ্নার দেহ তখন অবশ হয়ে এসেছিল। কোনোক্রমে নিজেকে সামলে নিয়ে সে উঠানের দিকে গেল দ্রুতপদে। তারপর সেখানে গিয়ে বিস্ফারিত নেত্রে দেখলে, অমলেন্দু হাঁটু গেড়ে মাটির উপরে বসে আছে এবং তার সামনেই পড়ে রয়েছে মহেন্দ্রের রক্তাক্ত ও নিশ্চেষ্ট দেহ।

ভয়ে সে মুখ দিয়ে উচ্চারণ করতে পারলে না একটা শব্দও।

অমলেন্দু বললে, 'মহেন্দ্রবাবুর মাথা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গিয়েছে। ওই পাথরের ভাঙা আবক্ষ মূর্তিটা দেখতে পাচ্ছেন? ওটা ছিল দোতলার বসবার ঘরে! দোতলা থেকে কেউ ওটা মহেন্দ্রবাবুর মাথার উপরে ছুড়ে মেরেছে।'

স্বপ্না থেমে থেমে বললে, 'কিন্তু দোতলায় তো জনপ্রাণী নেই!'

গ

দুজনে মূর্তির মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বৈঠকখানার ভিতরে—অমলেন্দু ও স্বপ্না।

সর্বপ্রথমে কথা কইলে অমলেন্দু। টেবিলের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে সে আস্তে আস্তে বললে, 'ওখানে দাঁড়িয়ে আছে আর দুটো পুতুল। ও-দুটো হচ্ছে আমাদের দুজনেরই প্রতীক। এখন কার পালা আগে আসবে—আমার, না আপনার?'

স্বপ্না সচিৎকারে বললে, 'এ বাড়ি অভিশপ্ত অমলেন্দুবাবু! এখানে দাঁড়িয়ে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে! আসুন, আমরা বাইরে পালিয়ে যাই!'

অমলেন্দু বললে, 'তাই চলুন। কিন্তু বাইরে গিয়ে আমরা সান্ত্বনা পাব না—এ দ্বীপটাই হচ্ছে অভিশপ্ত!'

দুজনে বাড়ির বাইরে গিয়ে দ্রুতপদে অগ্রসর হতে লাগল সমুদ্রের দিকে। যেতে যেতে এসে পড়ল একটা জঙ্গলের কাছে। সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে তিনটে বড়ো বড়ো গাছ।

স্বপ্না হঠাৎ চলা বন্ধ করলে সেই গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে। তারপর বললে, 'অমলেন্দুবাবু, এক কাজ করতে পারেন?'

—'কী কাজ স্বপ্না দেবী?'

—'এই গাছটা খুব উঁচু, এর উপরে আপনি উঠতে পারেন?'

অমলেন্দু বিস্মিত কণ্ঠে বললে, 'কেন?'

—'এর উপরে উঠলে অনেক দূর পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যাবে। হয়তো জলের উপরে কোনো নৌকা কি ওপারের কোনো গাঁয়ের চিহ্ন আপনার নজরে পড়তে পারে। দেখাই যাক না, যদি আমরা বাইরের কারুর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারি।'

অমলেন্দু একটু ভেবে বললে, 'আপনার এ প্রস্তাব মন্দ নয়। আচ্ছা, আপনি নীচে দাঁড়ান, আমি গাছের উপরে উঠে দেখি কোথাও কিছু দেখতে পাওয়া যায় কি না?'

অমলেন্দু পায়ের জুতো জোড়া খুলে ফেললে। তারপর দু-হাতে গাছের গুঁড়ি জড়িয়ে উপর দিকে উঠতে লাগল। এবং উঠতে উঠতে অনুভব করলে, তার

পকেটের ভিতরে ফস করে হাত চালিয়ে রিভলভারটা কে টেনে বার করে নিলে!

—'স্বপ্না দেবী, স্বপ্না দেবী!'

স্বপ্না খিলখিল করে হেসে উঠে বললে, 'এইবারে আমি নিজেকে নিরাপদ বলে মনে করতে পারব!'

অমলেন্দু লাফিয়ে পড়ল ভূমিতলের উপরে। ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললে, 'স্বপ্না দেবী, এরকম কৌতুক আমি পছন্দ করি না। আমার রিভলভার এখনই ফিরিয়ে দিন।'

স্বপ্না দৃঢ়কণ্ঠে বললে, 'এ রিভলভার এখন আমার কাছেই থাকবে। আমি আপনাকে হত্যা করব না, সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।'

অমলেন্দু তার দিকে এগিয়ে গেল, স্বপ্নাও গেল পিছিয়ে। বললে, 'কিছুতেই এ রিভলভার আপনাকে আমি ফিরিয়ে দেব না। আপনি আরও এগিয়ে এলে নিজেই বিপদে পড়বেন।'

অমলেন্দুর মুখ তখন আরক্ত হয়ে উঠেছে প্রচণ্ড ক্রোধে। আত্মহারার মতন গর্জন করে সে বললে, 'স্বপ্না ফিরিয়ে দাও আমার রিভলভার!'

—'কখনো না, কখনো না। ওইখানে দাঁড়িয়ে থাকুন! নারী হলেই কেউ অবলা হয় না। চরম বিপদের সময় ভেড়াও ফিরে রুখে দাঁড়ায়। আপনি আর এক পা এগুলেই আমি রিভলভার ছুড়তে বাধ্য হব।'

অমলেন্দু স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, কিন্তু তার মুখ-চোখ উদ্ভ্রান্তের মতো। ডান হাতে রিভলভার তুলে স্বপ্নাও নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল—তার মুখে-চোখে দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ভাব।

আচম্বিতে অমলেন্দু বন্য জীবের মতো সামনের দিকে লম্ফত্যাগ করলে এবং সঙ্গে সঙ্গে গর্জন করে উঠল স্বপ্নার হাতের রিভলভার।

তীব্র এক আর্তনাদ করে অমলেন্দু মাটির উপরে লুটিয়ে পড়ল। দু-এক বার ছটফট করেই তার দেহ হয়ে গেল একেবারে নিস্পন্দ।

স্বপ্না হা হা করে অট্টহাসি হেসে উঠল, তারপর দ্রুতপদে ছুটতে লাগল বাড়ির দিকে।

চত্বর পেরিয়ে বাড়ির ভিতরে ঢুকে সিঁড়ি বেয়ে সে উঠে গেল দোতলায়, তারপর নিজের ঘরে ঢুকে ধপাস করে একখানা চেয়ারে বসে পড়ে হাঁপাতে

হাঁপাতে বললে, 'আর কোনো ভয় নেই, আর কোনো ভয় নেই! দ্বীপে এখন আমি একলা! হ্যাঁ, নয়টা মৃতদেহের মাঝখানে একলা বেঁচে আছি খালি আমি! আমার হাতে আছে রিভলভার—এখন আমি আর কারুকেই ভয় করি না! সাক্ষাৎ মৃত্যুও যদি আমার সামনে আসে, তাকে দেখেও আমি রিভলভার ছুড়তে ইতস্তত করব না! হা হা হা হা, আমি একলা—আমি একলা!'

আচমকা পিছনে শোনা গেল যেন কার পদশব্দ। স্বপ্না ফিরে দেখবারও অবসর পেলে না, হঠাৎ সবলে কে চেপে ধরলে তার কণ্ঠদেশ!

তার হাত থেকে রিভলভারটা খসে মেঝের উপরে পড়ে গেল সশব্দে এবং ক্রমে ক্রমে তার চোখের সামনে পৃথিবী হয়ে এল অন্ধকার!

॥ অবশেষ ॥

'জলপরি' জাহাজের কাপ্তেন সমুদ্রে ভাসমান এক বোতলের ভিতরে এই বিবরণী পেয়ে পুলিশের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

ক

'অ্যাডভেঞ্চারে'র গল্পে প্রায়ই পাঠ করা যায়, একটা বোতলে কেউ কেউ দরকারি চিঠিপত্র ভরে সমুদ্রে ফেলে দিয়েছে, এবং অবশেষে সে বোতলটা হয়েছে অন্য কারুর হস্তগত। তারপর জনসাধারণের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে অদ্ভুত কোনো রহস্যের কাহিনি।

এই পদ্ধতিটা বরাবরই আকৃষ্ট করেছে আমাকে। আমিও এই পদ্ধতি অবলম্বন করলুম। যখন এই ভাসমান বোতলটা জল থেকে কেউ উদ্ধার করবে, আমি তখন নিশ্চয়ই ইহলোকে বিদ্যমান থাকব না।

এক বিষয়ে আমি নিশ্চিত আছি। হারাধনের দ্বীপে দশ-দশটা হত্যাকাহিনি নিয়ে নিশ্চয়ই চারিদিকে বিশেষ উত্তেজনার সৃষ্টি হবে। এবং পুলিশও যে প্রাণপণে চেষ্টা করবে, সে বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই। কিন্তু তদন্তের যে কোনোই ফল হবে না এবং আসল হত্যাকারীকে কেউ যে আবিষ্কার করতে পারবে না, সেটাও আমি আগে থাকতেই অনুমান করতে পারছি। নিখুঁত অপরাধ করবার জন্যে উচ্চশ্রেণির অপরাধীরা প্রায়ই আগ্রহ প্রকাশ করে থাকে। হারাধনের দ্বীপের

হত্যাকাণ্ড হচ্ছে সেইরকম এক নিখুঁত অপরাধ; পুলিশের সাধ্য নেই যে, এই মামলার রহস্য ভেদ করে। পুলিশের এই অসহায় অবস্থা কল্পনা করেই অতঃপর আমি নিজেই সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে চাই।

আমি হচ্ছি চন্দ্রকান্ত চৌধুরি। হাইকোর্টের ভূতপূর্ব বিচারক।

অত্যন্ত কঠোর বিচারক বলে আমার একটা কুখ্যাতি ছিল। সকলে আমার নাম দিয়েছিল, ফাঁসুড়ে জজ! সেটা নিতান্ত অমূলক নয়। অপরাধীদের চরম দণ্ড দেবার সুযোগ পেলে, আমি একটা নিষ্ঠুর আনন্দ উপভোগ করতুম। জীবনে বহু আসামিকেই প্রাণদণ্ড দিয়েছি, ক্ষমা করিনি কারুকেই।

অপরাধীর পর অপরাধীর বিচার করতে করতে আমার মনের ভিতরে আসে এক বিশেষ পরিবর্তন। দিনে দিনে ভালো করেই অনুভব করতে পারলুম যে, আমার চরিত্রও বদলে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। অন্য লোকে খুন করে ধরা পড়েছে এবং আমিও করেছি তার শাস্তিবিধান। ক্রমে ব্যাপারটা এমনি একঘেয়ে হয়ে উঠল যে, সেটাতে আমার মনে জাগত না আর কোনো উত্তেজনা।

মনে মনে ভাবতে লাগলুম, হত্যাকারীর বিচারক না হয়ে আমি নিজেই যদি হই হত্যাকারী? সাধারণ নয়, অসাধারণ হত্যাকারী—যে হত্যা করবে, অথচ ধরা পড়ে আসামি হয়ে বিচারকের সামনে গিয়ে দাঁড়াবে না। কেউ তাকে কোনোই সন্দেহ করতে পারবে না। অর্থাৎ সেই হত্যা হবে নিখুঁত অপরাধ।

বিচারকার্য থেকে অবসর গ্রহণ করবার পর থেকে মনে মনে প্রায় নিখুঁত অপরাধের কথা নিয়ে নাড়াচাড়া করতুম।

এই সময়ে পেলুম পরলোকের আমন্ত্রণ। আমি হৃদরোগের দ্বারা আক্রান্ত হলুম। তার উপরে আমার হল সন্ন্যাস রোগও। রক্তের চাপ বেড়ে যাওয়ায় দুই-দুই বার অজ্ঞান হয়ে গেলুম। বড়ো বড়ো ডাক্তারেরা মত প্রকাশ করলে, তৃতীয় আক্রমণই হবে আমার পক্ষে মারাত্মক। অর্থাৎ হয় হৃদরোগে, নয় সন্ন্যাসরোগে অদূর-ভবিষ্যতেই আমার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

তখনই মনে মনে সংকল্প করলুম, আমার উচ্চাকাঙক্ষাকে সফল না করে পৃথিবী থেকে আমি বিদায় গ্রহণ করব না। নিখুঁত অপরাধ! হ্যাঁ, আমাকে করতে হবে একটা চিরস্মরণীয় অপরাধের অনুষ্ঠান!

লোকে যেমন বেছে বেছে বলির পশু সংগ্রহ করে, আমিও তেমনি বেছে বেছে এমন কয়েক ব্যক্তির নাম সংগ্রহ করলুম, আইন যাদের দণ্ড দিতে

পারেনি, কিন্তু অপরাধী বলে যাদের কুখ্যাতি আছে। তাদের বিরুদ্ধে তথ্য সংগ্রহ করবার জন্যে আমাকে চর নিযুক্ত করে বড়ো অল্প অর্থ ব্যয় করতে হয়নি।

অ্যাটর্নি বিজন বোসকে মধ্যস্থ রেখে আমি কাজ শুরু করে দিলুম। যদিও তার কাছে আমি কোনো কথাই ভাঙিনি, তবু অ্যাটর্নিরা তো নির্বোধ জীব নয়, সে বোধহয় একটা কিছু সন্দেহ করেছিল। সেই সন্দেহই হল তার কাল। সমস্ত বন্দোবস্ত যখন পাকা হয়ে গেল, তাকেও দিলুম আমি প্রাণদণ্ড। কেমন করে, এখানে তা নিয়ে আর আলোচনা করতে চাই না। তবে হারাধনের দ্বীপে আসবার আগেই তার মুখ আমি চিরকালের জন্যে বন্ধ করে দিয়েছি। আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবার লোক আর কেউ নেই।

হারাধনের দ্বীপ হচ্ছে আমার নিখুঁত অপরাধের পক্ষে আদর্শ স্থান। বাড়িঘর সবই সাজানো-গুছানো ছিল, সেই অবস্থাতেই তিন মাসের জন্যে দ্বীপটা আমি বেনামে ভাড়া নিয়েছি। বিজন বোসের সাহায্যেই অতিথি অভ্যর্থনা করবার জন্যে যা কিছু ব্যবস্থা ঠিক করে ফেলেছিলুম।

নিজেকেও অতিথি সেজে এখানে আসতে হবে, অতএব সকলের চোখে ধুলো দেবার জন্যে মাঝখানে খাড়া করলুম চারুশীলা দেবীকে। তিনি কাল্পনিক লোক নন। সত্য সত্যই আট-দশ বছর আগে তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল, কিন্তু এখন তিনি পরলোকে! তাঁর নামে একখানা চিঠি লিখে নিজের সঙ্গে রাখলুম—যেন এই দ্বীপটা কিনে তিনিই আমাকে এখানে নিমন্ত্রণ করে এনেছেন। এই মিথ্যাটাকে সত্যের মতো সহজ করে আনবার জন্যে মনে মনে বারবার এই কথা নিয়েই আলোচনা করতে লাগলুম এবং দ্বীপের অন্যান্য আগন্তুকদেরও কাছে সেই চিঠিখানা বার করে দেখাতে ছাড়লুম না। বলা বাহুল্য, প্রত্যেকেই বিশ্বাস করেছিল আমার কথা।

অতঃপর আমার এই নিখুঁত অপরাধের কাহিনি। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব কথা বলবার দরকার নেই। মনোতোষের গেলাসে সকলের অগোচরে সায়ানাইড মিশিয়ে দিয়েছিলুম আমিই। আমার কাছে আর-একটা জিনিসও ছিল—যা অল্পমাত্রায় ঔষধ আর বেশিমাত্রায় বিষ। 'ক্লোর্যাল হাইড্রেট'। ঘুমোবার ঔষধরূপে এটা ব্যবহার করা যায়, কিন্তু মাত্রাধিক্য হলেই মারাত্মক হয়ে ওঠে। ডাক্তারও সত্যবালাকে একটা ঘুমোবার ওষুধ দিয়েছিলেন। সেটা কি তা আমি জানি না,

কিন্তু সত্যবালার ওষুধের গেলাসে সেই সঙ্গে ক্লোর‍্যাল হাইড্রেট মিশিয়ে দেওয়াও আমার পক্ষে কঠিন হয়নি। মেজর সেন মারা পড়েছেন বিনা যন্ত্রণায়। আমি যখন পা টিপে টিপে তাঁর পিছনে গিয়ে দাঁড়াই তখন তিনি কিছুই টের পাননি। আমার হাতে ছিল একটা লোহার ডান্ডা। এক আঘাতেই তাঁর মৃত্যু হয়।

এমন সাবধানে আমি কাজ করে গিয়েছি, কেউ আমরা উপরে বিন্দুমাত্র সন্দেহ করতে পারেনি। ডাক্তার বোস বরাবরই সন্দেহ করে এসেছেন অমলেন্দুকে। তাঁর সেই সন্দেহকে দৃঢ়মূল করে তোলবার জন্যে আমিও কোনো যুক্তির আশ্রয় নিতে ছাড়িনি।

সর্বশেষ

'জলপরি' জাহাজের কাপ্তেন সমুদ্রে ভাসমান এক বোতলের ভিতরে যে বিবরণী পেয়ে পুলিশের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন তারই বাকি অংশ।

অবশেষে কৌশলে ডাক্তারকেও আমি আমার পক্ষে টেনে নিলুম। তাঁকে বললুম, 'এইবার আমি নিজের মৃত্যুর ভান করে আসল হত্যাকারীকে গ্রেপ্তার করতে চাই।'

প্রথমে তিনি আমার কথার অর্থ ধরতে পারেননি। তারপর আমি তাঁকে ভালো করে সব কথা বুঝিয়ে দিলুম। সকলে জানবে যে কেউ গুলি করে আমাকে মেরে ফেলেছে, কিন্তু আসলে আমি বেঁচে থেকেই প্রকৃত হত্যাকারীর কার্যকলাপের উপরে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখব।

তারপর ব্যাপারটা হয়ে দাঁড়াল যথেষ্ট থিয়েটারি—যদিও সেটা হচ্ছে আমার খামখেয়াল মাত্র। লাল পর্দাটা মুড়ি দিয়ে আমি সোফার উপরে গিয়ে বসলুম। ডাক্তার আমার কপালের উপরে এঁকে দিলেন একটা রক্তাক্ত ক্ষতচিহ্ন। আমার মাথায় পরানো রইল একটা সাদা রঙের পশমি পরচুলা।

আর সকলের মতো ডাক্তারও প্রাণের ভয়ে অত্যন্ত অশান্তি ভোগ করছিলেন। আমার প্রস্তাবটা তাঁর খুব মনে লেগে গেল। আমার কথামতো কাজ করতে তিনি একটুও নারাজ হলেন না।

আমার তথাকথিত 'মৃত্যু'-র পরে আমার দেহটাকে উপরের ঘরে তুলে রেখে আসা হল। আমি বেশ জানতুম, মানুষ মৃতদেহকে—বিশেষত নিহত মানুষের দেহকে যথেষ্ট অপার্থিব বলে মনে করে। আমার মৃত্যুর পরেও আমার দেহকে

আবার পরীক্ষা করবার জন্যে কেউ যে আর উপরকার ঘরে ঢুকতে চাইবে না, এটাও আমি বেশ বুঝে নিয়েছিলুম।

কিন্তু মৃত্যুর আগেই আমি নিত্যানন্দ ও সৌদামিনীকেও পরলোকে পাঠাবার ব্যবস্থা করেছিলুম। নিত্যানন্দ মারা পড়ে মেজর সেনেরই মতন। সে কাঠ কাটছিল, আমি পিছন দিক থেকে ভোজালি দিয়ে তাকে আঘাত করি। কিন্তু সৌদামিনীকে হত্যা করবার জন্যে আমাকে কিঞ্চিৎ বেগ পেতে হয়েছিল। প্রথমে খাবার ঘরে তাঁরও চায়ের পেয়ালায় আমি মিশিয়ে দিই 'ক্লোর‍্যাল হাইড্রেট'। চা-পানের পরই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁকে চেয়ারের উপরে বসিয়ে রেখে সকলে যখন বৈঠকখানায় গেল, তখন সর্বশেষে ছিলুম আমি। তারপর তিনি যখন কতকটা চেতনা হারিয়ে ফেলেছেন, সেই সময়ে এক মুহূর্তের মধ্যেই 'হাইপোডার্মিক সিরিঞ্জে'র সাহায্যে তাঁর দেহের মধ্যে সায়ানাইডের বিষ ঢুকিয়ে দিয়ে সে ঘর থেকে আমি চলে আসি।

মৃত্যুর পরেই আমি স্থির করলুম, এইবার ডাক্তারকেও পথ থেকে সরাবার সময় এসেছে। ডাক্তারকে বললুম, রাত্রে চুপি চুপি তাঁর সঙ্গে আমার পরামর্শ আছে। দ্বীপের যেদিকে নদীর মোহনা, তিনি যেন সেইদিকে গিয়ে আমার জন্যে অপেক্ষা করেন। কিছু সন্দেহ না করেই তিনি রাজি হয়ে গেলেন। যথাসময়ে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হল। তাঁকে নিয়ে আমি জলের ধারে একটা উচ্চভূমির উপরে গিয়ে উঠলুম।

আমি জানতুম, জল সেখানে খুব গভীর। কথা কইতে কইতে হঠাৎ আমি তাঁকে বললুম, 'দেখুন ডাক্তার বোস, নীচে একখানা নৌকো বাঁধা রয়েছে না?' শুনেই তিনি আগ্রহভরে জলের ধারে ঝুঁকে পড়লেন। তারপর আমার হাত থেকে আচমকা একটা ধাক্কা খেয়ে ঝুপ করে তিনি পড়ে গেলেন একেবারে জলের ভিতরে। আমি জানতুম তিনি সাঁতার কাটতে পারেন না।

মহেন্দ্রকে কীভাবে হত্যা করেছি সেটা বোধহয় আর ব্যাখ্যা করে বলতে হবে না। তারপর মারা পড়ে অমলেন্দু—যদিও আমার হাতে তাকে মরতে হয়নি। স্বপ্নার রিভলভারের গুলিতে কেমন করে সে মারা পড়ে, উপরের ঘর থেকেই সে দৃশ্যটা আমি দেখতে পেয়েছিলুম।

স্বপ্না উত্তেজিতভাবে ছুটতে ছুটতে বাড়ির দিকে আসে। তারপর উপরে উঠে

নিজের ঘরে ঢুকে বসে পড়ে। সেই সময় পিছন দিক থেকে গিয়ে আমি তার গলা টিপে ধরি।

তারপর নিজের ঘরে ফিরে এসেই আমি অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করতে থাকি। বেশ বুঝতে পারলুম, আমার রক্তের চাপ ক্রমশ বেড়ে উঠেছে। মনে অত্যন্ত দুশ্চিন্তা হল, পাছে এই বিয়োগান্ত নাটকের চরম দৃশ্যটা যথেষ্ট রোমাঞ্চকর হয়ে ওঠবার আগেই মারা পড়ি, সেই ভয়ে তাড়াতাড়ি লিখে ফেললুম আমার এই কাহিনি।

কাগজখানাকে বোতলে পুরে ছিপি এঁটে জলে ফেলে দিতেও দেরি করলুম না। কিন্তু তার আগেও আরও যা করেছিলুম, আমার কাহিনির মধ্যে সে কথাও বলে রাখতে আমি ভুলিনি। নিখুঁত অপরাধের পালা চুকিয়ে, শয্যায় আশ্রয় নিয়ে আমিও পান করব 'পোটাসিয়াম সায়ানাইড'। হৃদরোগে নয়, রক্তের চাপে নয়, ইহলোক ত্যাগ করবার পথ খুঁজে নিই আমিই স্বয়ং!'

গল্প

একরত্তি মাটি

প্রাতরাশের পর মানিক উচ্চস্বরে খবরের কাগজ পাঠ করতে লাগল এবং জয়ন্ত একমনে শুনতে লাগল খবরগুলো।

ভৃত্য মধুর প্রবেশ—সঙ্গে তার এক পাহারাওয়ালা।

জয়ন্ত শুধোলে, 'ব্যাপার কী?'

পাহারাওয়ালার মুখে শোনা গেল, ইনস্পেকটার সুন্দরবাবু এই পাড়ায় তদন্তে এসেছেন, জয়ন্তের সঙ্গে পরামর্শ করতে চান।

জয়ন্ত বললে, 'চল মানিক, নিশ্চয় কোনো নতুন মামলা। কাগজের একঘেয়ে খবর শোনার চেয়ে নতুন মামলা নিয়ে নাড়াচাড়া করা ভালো।'

মানিক বললে, 'হ্যাঁ, তাতে আমাদেরও সময় কাটে, আর সুন্দরবাবুরও হাতযশ বাড়ে।'

গঙ্গার ধার। রেল লাইনের সামনেই একখানা মাঝারি আকারের তিনতলা বাড়ি। সদর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে দুই জন পাহারাওয়ালা।

বৈঠকখানায় কয়েকজন লোকের সঙ্গে বসে আছেন সুন্দরবাবু। একগাল হেসে বললেন, 'এসো জয়ন্ত, এসো মানিক।'

জয়ন্ত বলাল, 'আবার কোনো নতুন মামলার হামলা সামলাতে এসেছেন বুঝি?'

—'হুম! তা ছাড়া আর কী? সেইজন্যেই তো আজকে তোমাদের চায়ের আসরে যাওয়া হল না।'

মানিক বললে, 'না গিয়ে ভালো করেননি। মধু আজ চমৎকার খাবার বানিয়েছিল।'

—'কী খাবার?'

—'চকোলেট স্যান্ডউইচ।'

সুন্দরবাবু ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেললেন বিরসবদনে।

জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করলে, 'মামলাটা কীসের?'

—'কাল এই বাড়ি থেকে পঁচিশ হাজার টাকা চুরি হয়ে গিয়েছে, আর সঙ্গে সঙ্গে হয়েছে হত্যার চেষ্টা।'

—'তাহলে সামান্য মামলা নয় দেখছি। গোড়া থেকে সব খুলে বলুন।'

॥ ২ ॥

সুন্দরবাবু যা বললেন তা মোটামুটি এই :

অনন্তচন্দ্র পাইন হচ্ছেন বিখ্যাত লৌহব্যবসায়ী, তাঁর দোকান কলকাতার লোহাপটিতে। এবং তাঁর বসতবাড়ি গঙ্গার ধারে। তিনি বিপত্নীক ও নিঃসন্তান।

তাঁর পিতার দুই বিবাহ। তিনি প্রথম পক্ষের পুত্র। দ্বিতীয় পক্ষের পুত্রের নাম নবীনমাধব, বয়স ছাব্বিশ বছর। তাঁর পিতা পরলোকে। তাঁর বিমাতা ইহলোকেই বিদ্যমান বটে, কিন্তু বাস করেন পিত্রালয়ে; কারণ অনন্তবাবুর সঙ্গে তাঁর বনিবনাও নেই। তবে, সপত্নীপুত্র তাঁকে মাসোহারা থেকে বঞ্চিত করেননি।

অনন্তবাবুর সম্পত্তি স্বোপার্জিত এবং তাঁর অবর্তমানে সেই সম্পত্তির অধিকারী হবে নবীনমাধবই। বিমাতার সঙ্গে না বনলেও অনন্তবাবু তাঁর বৈমাত্রেয় ভাইটিকে ভালোবাসেন যার-পর-নাই এবং তাকে এনে রেখেছেন নিজের কাছেই।

অনন্তবাবুর ম্যানেজারের নাম সুবোধকুমার বসু, লোহার কারবারে তিনিই তাঁর দক্ষিণ হস্তের মতো। দশ বছরের বিশ্বাসী লোক, প্রভুর অনেক টাকা নিয়ে নাড়াচাড়া করেন।

ঘটনার দিন কার্যসূত্রে অনন্তবাবুকে যেতে হয়েছিল আসানসোলে। সেইদিন সন্ধ্যার সময়ে দোকান বন্ধ করে সুবোধ পঁচিশ হাজার টাকা নিয়ে অনন্তবাবুর বাড়ি আসে এবং টাকাগুলি রাখে দোতলার ঘরের লোহার সিন্দুকে। তারপর ঘরের দরজায় তালা দিয়ে সিন্দুকের দরজার চাবি নবীনমাধবের হাতে সমর্পণ করে নিজের বাসায় চলে যায়। সে বাস করে গঙ্গার অপর পারে ঘুসুড়িতে।

নবীনও সন্ধ্যার পর বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়, ফিরে আসে ভোরের বেলায়। রাত্রিবেলায় বাড়িতে ছিল একজন দারোয়ান ও একজন ভৃত্য। আরও-একজন দারোয়ান ও একজন ভৃত্য অনন্তবাবুর সঙ্গেই আসানসোলে গিয়েছিল। পাচক ও দাস-দাসী ঠিকা, রাত্রে ছিল না।

সকালে নবীন বাড়ি ফিরে আসবার আগেই ভৃত্য রঘুর নিদ্রাভঙ্গ হয়। সে বাইরে এসে দেখে, উঠোনের উপর পড়ে আছে দারোয়ানের অচৈতন্য দেহ, তার মাথায় প্রচণ্ড আঘাতের চিহ্ন। মাটির উপরে রক্তের ধারা আর একগাছা রুপো-বাঁধানো মোটা রক্তাক্ত লাঠি।

তার চিৎকারে যখন লোকজন জড়ো হয়েছে সেই সময়েই নবীন বাড়িতে ফিরে আসে। তারপর দেখা যায়, অনন্তবাবুর ঘরের দরজা খোলা। লোহার সিন্দুকের দরজাও খোলা, পঁচিশ হাজার টাকা অদৃশ্য। নবীন তৎক্ষণাৎ পুলিশে খবর দেয়।

পুলিশ তদন্তে এই কথাগুলি প্রকাশ পেয়েছে :

দরজার ও লোহার সিন্দুকের চাবি কাল থেকে আজ পর্যন্ত নবীন একবারও কাছছাড়া করেনি। অথচ দরজার তালা ও সিন্দুকটা যে চাবি দিয়েই খোলা হয়েছে সে বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই।

রাত্রে সে কোথায় ছিল, এই প্রশ্নের উত্তরে নবীন বলে, এক বন্ধুর বাড়িতে। কিন্তু চেষ্টা করেও তার কাছ থেকে বন্ধুর নাম ও ঠিকানা আদায় করা যায়নি।

দারোয়ানের দেহের কাছে যে মোটা লাঠিগাছা পাওয়া গিয়েছে, তার অধিকারী যে স্বয়ং নবীন, সেটাও প্রমাণিত হয়েছে।

ভৃত্য রঘু বলে, রাত্রে সে কোনো শব্দ শোনেনি। দারোয়ান তাকে সিদ্ধি খাইয়ে দিয়েছিল। সিদ্ধি খেতে সে অভ্যস্ত নয়, ঘুমিয়ে একেবারে বেহুঁস হয়ে পড়েছিল।

অপরাধী যে কেমন করে বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করেছিল, এ সমস্যার কোনোই সমাধান হয়নি। সদর দরজা রঘু নিজের হাতে বন্ধ করেছিল। বাহির থেকে বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করবার দ্বিতীয় কোনো উপায়ই নেই।

দারোয়ানই কি কড়া-নাড়া শুনে অপরাধীকে দরজা খুলে দিয়ে পরে তার দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে? এ প্রশ্নেরও জবাব পাওয়ার উপায় নেই। কারণ, দারোয়ান এখনও অজ্ঞান হয়ে হাসপাতালে পড়ে আছে।

॥ ৩ ॥

সমস্ত শুনে জয়ন্ত মুখে কিছু বললে না। বাড়ির বাহিরে গিয়ে খানিকক্ষণ এদিকে-ওদিকে ঘোরাঘুরি করে আবার ফিরে এসে সদর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বললে, 'সুন্দরবাবু, আপনি ঠিকই বলেছেন। বাহির থেকে এ-বাড়ির ভিতরে আসবার কোনো উপায়ই নেই।'

—'তাহলে অপরাধী বাড়ির ভিতরে এল কেমন করে?'

—'এই সদর দরজা দিয়ে।'

—'দরজা তো ভিতর থেকে বন্ধ ছিল।'

জয়ন্ত জবাব দিলে না। নীচের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ সে উবু হয়ে বসে পড়ল। তারপর মাটির উপর থেকে কী একটা তুলে নিয়ে চোখের কাছে রেখে পরীক্ষা করলে। তারপর পকেটের ভিতর থেকে এক টুকরো কাগজ বার করে জিনিসটা মুড়ে রাখলে।

সুন্দরবাবু শুধোলেন, 'কী ওটা?'

জয়ন্ত উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'একরত্তি মাটি।' সে নতমুখে এদিকে-ওদিকে চোখ বুলোতে বুলোতে অগ্রসর হল। উঠোনের উপরে আবার বসে পড়ল। আবার কী তুলে নিয়ে মোড়কের ভিতরে রেখে উঠে দাঁড়াল।

সুন্দরবাবু বললেন, 'আবার কী পেলে হে?'

—'আবার একরত্তি মাটি।'

—'খালি খালি মাটি কুড়িয়ে ছেলেখেলা কেন! কাজের কথা বলো।'

—'দোতলায় চলুন। যে-ঘর থেকে টাকা চুরি গিয়েছে সেইখানে।'

কিন্তু সেখানে নতুন কিছুই আবিষ্কৃত হল না।

জয়ন্ত বললে, 'এ মামলায় একটা মস্ত সূত্র হচ্ছে নবীনের রক্তাক্ত লাঠিগাছা।'

'হুম, আরও দুটো বড়ো সূত্র আছে। প্রথম, নবীনের কাছে ছিল দরজার আর সিন্ধুকের চাবি। দ্বিতীয়, কাল কোথায় রাত্রিবাস করেছিল, সে-কথা সে বলতে নারাজ কেন?'

জয়ন্ত মাথা নেড়ে বললে, 'উঁহু, ওরও চেয়ে বড়ো সূত্র হচ্ছে ওই লাঠিগাছা।'

—'হ্যাঁ, ওই সূত্র ধরে আমি নবীনকে গ্রেপ্তার করতে পারি।'

—'আপাতত সে চেষ্টা করবেন না।'

—'যদি সে পালায়?'

—'আমি নবীনের মুখ দেখেছি। বুদ্ধিমানের মুখ। বোকার মতন এখন পালিয়ে গিয়ে সে নিজেই নিজের পায়ে কুড়ুল মারবে না।'

—'ওই নবীন আর সুবোধ এইদিকে আসছে। ওদের কিছু জিজ্ঞাসা করবে কি?'

নবীন ও তার পিছনে পিছনে সুবোধ এসে দাঁড়াল জয়ন্তের সামনে। নবীনের মুখশ্রী, দেহের গঠন ও গায়ের রং চমৎকার। চোখের চাহনি শিশুর মতন সরল।

কিন্তু কারুর মুখ দেখে পুলিশ ভোলে না। কারণ এমন অপরাধীর সংখ্যাও অল্প নয়, যাদের মতন দেববাঞ্ছিত চেহারা পেলে মুনি-ঋষিরাও নিজেদের ভাগ্যবান মনে করতেন।

সুবোধের চেহারাও নিরীহ গোছের। শ্যামবর্ণ, দোহারা দেহ, মাথায় মাঝারি, মুখ হাসি হাসি। চেহারায় কোনো বৈশিষ্ট্য না থাকলেও মানুষটিকে মন্দ বলে মনে হয় না।

জয়ন্ত বললে, 'আসুন নবীনবাবু। বলতে পারেন, দারোয়ানের দেহের পাশে আপনার লাঠিগাছা পাওয়া গেছে কেন?'

শুষ্ক কণ্ঠে নবীন বললে, 'কেমন করে বলব মশাই, আমার নিজের মনেও বার বার জাগছে ওই প্রশ্নই। আমি হতভম্ব হয়ে গিয়েছি।'

সুবোধের দিকে ফিরে জয়ন্ত বললে, 'শুনলুম আপনার বাড়ি ঘুসুড়িতে। আপনি কি রোজ সেখান থেকে আনাগোনা করেন, না কলকাতাতেও কোনো বাসা রেখেছেন?'

সুবোধ বললে, 'গঙ্গার এপারে কলকাতা, ওপারে ঘুসুড়ি। দূর তো বেশি নয়, তাই ঘুসুড়ি থেকেই আনাগোনা করি।'

—'অনন্তবাবু আপনাকে অত্যন্ত বিশ্বাস করতেন?'

সুবোধ ভাঙা ভাঙা গলায় বললেন, 'কিন্তু কালকের ঘটনার পরও তিনি আর কি আমাকে বিশ্বাস করবেন?'

নবীন বললে, 'আমিও কেমন করে দাদার কাছে মুখ দেখাব জানি না।'

জয়ন্ত বললে, 'আপনাদের বেয়ারা রঘুকে একবার এখানে আসতে বলুন।'

রঘু এলে পর সে জিজ্ঞাসা করলে, 'তোমাদের সদর দরজা থেকে উঠোন পর্যন্ত রোজ ধোয়া-মোছা, ঝাঁট দেওয়া হয়?'

রঘু হাতজোড় করে বললে, 'হ্যাঁ হুজুর, দু-বেলাই। কর্তাবাবু কোথাও একতিল ধুলো দেখলে রেগে আগুন হয়ে ওঠেন।'

ঘরের জানলা দিয়ে গঙ্গার দিকে তাকিয়ে জয়ন্ত বললে, 'এত কাছে গঙ্গা, তোমরা নিশ্চয় রোজ গঙ্গাস্নান করো?'

—'না হুজুর, গঙ্গায় স্নান করতে যাই কালেভদ্রে।'

—'কাল সকালে কি বৈকালে তোমাদের কেউ গঙ্গাস্নানে যায়নি?'

—'না হুজুর।'

—'সুন্দরবাবু, আমার আর-কিছু জিজ্ঞাস্য নেই। এসো মানিক।'

জয়ন্ত ও মানিকের সঙ্গে সঙ্গে সুন্দরবাবুও নীচে নেমে শুধোলেন, 'কী হে ভায়া, উঠোন ঝাঁট দেওয়া, গঙ্গাস্নান করার সঙ্গে টাকা চুরির সম্পর্কটা কোন খানে?'

—'এখন বুঝবেন না।'

—'নতুন কোনো সূত্র পেয়েছ বুঝি?'

—'পেয়েছি। সবচেয়ে বড়ো সূত্র।'

—'সূত্রটা কী?'

—'একরত্তি মাটি।'

জয়ন্তের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম, তুমি একটি আস্ত বাতুল!'

পথ দিয়ে যেতে যেতে মানিক বললে, 'আমিও একরত্তি মাটির মানে বুঝলুম না। তুমি এখন কী করবে?'

—'তথ্যানুসন্ধান। আমার বিশ্বাস, এটা জটিল মামলা নয়। চোর ধরা পড়তে বেশি বিলম্ব হবে না।'

—'কারুকে তুমি সন্দেহ করেছ?'

—'কারুকে না, কারুকে না। অর্থাৎ সকলকেই। নবীন, সুবোধ থেকে শুরু করে এ বাড়ির পাচক, দারোয়ান, বেয়ারা, দাসী সকলকেই। অথবা চোর হচ্ছে কোনো অজ্ঞাত ব্যক্তি, কিন্তু তাহলেও বাড়ির কেউ-না-কেউ যে তাকে কোনো-না-কোনো সাহায্য করেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাস্তি। আর, কোন দিক থেকে সে এসেছে, তাও আমি বুঝতে পেরেছি।'

—'কী দেখে বুঝলে?'

—'একরত্তি মাটি।'

—'জয়ন্ত, তোমার নাগাল পাওয়া ভার!'

॥ ৪ ॥

এক, দুই, তিন দিন কেটে গেল। জয়ন্ত মাঝে মাঝে বেরিয়ে যায়, ফিরে আসে; কিন্তু মুখে কিছু বলে না।

চতুর্থ দিনের প্রভাতি চায়ের আসর। সুন্দরবাবুও যথারীতি উপস্থিত।

টেলিফোনের ঘণ্টী বেজে উঠল। জয়ন্ত রিসিভার ধরে বললে, 'হ্যালো! হ্যাঁ, আমি জয়ন্ত। নমস্কার। কী বললেন? যাকে খোঁজা হচ্ছে তাকে পেয়েছেন? অতিশয় সুসংবাদ। তার নাম কী? রামলাল? বেশ বেশ। তাকে আজ দুপুরেই আমার কাছে পাঠিয়ে দিতে পারবেন? আচ্ছা, ধন্যবাদ।'

সুন্দরবাবু শুধোলেন, 'কীসের সুসংবাদ জয়ন্ত?'

জয়ন্ত বললে, 'সুন্দরবাবু, আজ বৈকালে অনন্তবাবুর বাড়ির সকলেই যেন এক জায়গায় হাজির থাকে, এমনকি পাচক পর্যন্ত।'

কৌতূহলে প্রদীপ্ত মুখে সুন্দরবাবু বললেন, 'কেন জয়ন্ত, কেন?'

—'সকলের সঙ্গে আমি রামলাল নামে এক ব্যক্তির পরিচয় করিয়ে দিতে চাই।'

—'কে রামলাল?'

—'ব্যাস, এখন আর কোনো প্রশ্ন নয়।' এই বলে জয়ন্ত একেবারে বোবা হয়ে গেল।

বৈকাল। অনন্তবাবুর বাড়ির সবাই বৈঠকখানায় হাজির। টেবিলের সামনের চেয়ারখানা দখল করেছেন সুন্দরবাবু।

জয়ন্ত ও মানিকের আবির্ভাব। তাদের পিছনে আর-একজন লোক। তার খালি পা, কোমরে বাঁধা কাপড়, গায়ে গেঞ্জি। জাতে বোধহয় সে বিহারি।

জয়ন্ত বললে, 'সুন্দরবাবু, এই লোকটির নাম রামলাল।'

—'হুম!'

—'নবীনবাবু, ঘটনার দিন আপনি কোথায় রাত্রিবাস করেছেন বলবেন না?'

নবীন কাঁচুমাচু মুখে বললে, 'আমাকে মাপ করুন!'

—'বেশ, আপনাকে তা আর বলতে হবে না, কারণ আমি আপনার গুপ্ত কথা জানতে পেরেছি।'

নবীনের মুখ হয়ে উঠল উদ্বিগ্ন।

জয়ন্ত বললে, 'রামলাল, সেই রাত্রে এই নবীনবাবু কি তোমার নৌকো ভাড়া করেছিলেন?'

রামলাল বললে, 'না হুজুর।'

—'তবে?'

রামলাল অঙ্গুলি-নির্দেশে দেখিয়ে দিলে সুবোধকে।

জয়ন্ত বললে, 'সুবোধবাবু, ঘটনার দিন রাত্রে আপনি রামলালের নৌকো ভাড়া করেছিলেন কেন?'

সুবোধের চেহারা তখন আর নিরীহের মতো দেখাচ্ছিল না। সে গর্জন করে বলে উঠল, 'মিথ্যা কথা, মিথ্যা কথা!'

—'কিন্তু রামলাল আপনাকে শনাক্ত করছে।'

—'ও ভুল দেখেছে।'

—'বেশ, আদালতে গিয়ে এই কথাই বলবেন। সকলে এখন আমার কথা শুনুন।'

॥ ৫ ॥

জয়ন্ত বলতে লাগল :

'সুন্দরবাবু, আগেই আপনাকে বলেছিলুম, এ মামলায় একটা মস্ত সূত্র হচ্ছে, নবীনবাবুর রক্তাক্ত লাঠিগাছা।

নবীনবাবু যদি ওই লাঠি দিয়ে দারোয়ানকে আঘাত করতেন, তাহলে নিশ্চয়ই নিজের বিরুদ্ধে অত বড়ো প্রমাণটা একান্ত নির্বোধের মতো ঘটনাস্থলে ফেলে রেখে যেতেন না।

এ থেকেই বোঝা যায়, তাঁর বিরুদ্ধে হয়েছিল একটা নিষ্ঠুর চক্রান্ত। নবীনবাবুর দিকে পুলিশের সন্দেহ আকৃষ্ট করে অপরাধী নিরাপদে বাস করতে চেয়েছে যবনিকার অন্তরালে। নবীনবাবুর রক্তাক্ত লাঠি পাওয়া গেছে ঘটনাস্থলে। ঘরের দরজার আর সিন্দুকের চাবিও ছিল তাঁর কাছে। পুলিশ সহজেই ভ্রমে পড়তে পারত।

তার উপরে নবীনবাবু নিজেই ব্যাপারটাকে আরও ঘোরালো করে তুলেছিলেন। তিনি কিছুতেই বলতে রাজি নন, ঘটনার দিন রাত্রে ছিলেন কোথায়? সে গুপ্ত কথা আমি জানতে পেরেছি তাঁর মায়ের কাছে সন্ধান নিয়ে। তিনি ছিলেন তাঁর মায়ের কাছে। অনন্তবাবু তাঁর বিমাতাকে একেবারেই পছন্দ করতেন না। তাঁর সঙ্গে মেলামেশা করলে নবীনবাবু সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবেন, এই ছিল অনন্তবাবুর কঠিন নির্দেশ। নবীনবাবু রক্তের টানে দাদার অনুপস্থিতির সুযোগ

গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু ভয়ে সে কথা স্বীকার করতে পারছিলেন না।

নবীনবাবুর সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়ে আমি আর-একটা সূত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলুম। ঘটনাস্থলে বাড়ির সদর দরজার কাছে আর উঠোনের উপরে পেয়েছিলুম দুই টুকরো মাটি। পরীক্ষা করেই বুঝতে পারলুম, তা গঙ্গামাটি ছাড়া আর কিছুই নয়। রঘু বেয়ারা বললে, ঘটনার দিন বাড়ির কেউ গঙ্গাস্নানে যায়নি। সে দুই বেলা বাড়ির উঠোন প্রভৃতি ঝাঁট দিয়ে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে রাখে, তবু ওখানে দুই টুকরো গঙ্গামাটি এল কী করে? তুচ্ছ মাটির টুকরো কিন্তু অসামান্য হয়ে উঠল সূত্র হিসেবে।

করলুম কল্পনাশক্তির প্রয়োগ। মন বললে, অপরাধী এসেছে নৌকোয় চড়ে জলপথে। নদীতে তখন ভাটা ছিল, তাকে নামতে হল ভিজে মাটির উপরে। তার জুতোর তলায় লেগে রইল এঁটেল মাটি। সেই মাটি কিছু ঝরে পড়েছে ঘটনাস্থলে।

গঙ্গার অপর পারে ঘুসুড়িতে বাস করে সুবোধ। সে কেমন লোক? ঘুসুড়ির পুলিশ সন্ধান নিয়ে সে খবর আমাকে জানিয়েছে। সুবোধ হচ্ছে বিষম জুয়াড়ি। ঋণে সে ডুবে আছে। তার নৈতিক চরিত্রও ভালো নয়। হাতে পঁচিশ হাজার টাকা, অনন্তবাবু অনুপস্থিত; এ সুযোগ হয়তো সে ছাড়তে পারেনি। তার পক্ষে সিন্দুকের আর দরজার তালার দ্বিতীয় চাবি তৈরি করে নেওয়াও কিছুমাত্র কঠিন নয়। সে যদি নৌকো ভাড়া করে ঘুসুড়ি থেকে এসে থাকে, তবে নৌকোর মাঝিরও সন্ধান পাওয়া যেতে পারে ওইখানেই। তাই পাওয়া গেল। ঘুসুড়ির পুলিশই খুঁজে বার করেছে মাঝি রামলালকে।

কিন্তু সুবোধ বাড়ির ভিতরে ঢুকল কেমন করে? আমার অনুমান, রঘু বেয়ারাও এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে আছে। সেই সুবোধকে সদর দরজা খুলে দিয়েছে। সে কাজ সেরে যখন সরে পড়ছে, সেই সময়েই দারোয়ানের ঘুম ভেঙে যায়। তার পরের কথা আপনারাই অনুসন্ধান করুন।—সুন্দরবাবু, একরত্তি মাটি কি ফ্যালনা?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'উঁহুম, উঁহুম!'
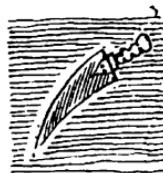
যে ছুরি কথা কয়

পাঠকরা এই গল্পটিকে 'গল্প' বলে উড়িয়ে না দিলেই সুখী হব। কারণ এই গল্প সত্য ঘটনা অবলম্বনে লেখা—যদিও স্থান, কাল ও পাত্রের নাম কাল্পনিক। কন্যান ডয়েলের শার্লক হোমসের কাহিনির মধ্যেও কোনো কোনোটি যেমন সত্যঘটনামূলক, এই গল্পটিও সেই শ্রেণির। একটি সম্পূর্ণ সত্য ঘটনা থেকে আমিও এই গল্পের মালমশলা গ্রহণ করেছি। ইতি—লেখক।

॥ ১ ॥

কুমার চেঁচিয়ে রবীন্দ্রনাথের 'মানসী'র কবিতা পড়ছিল এবং বিমল তার পাঠ শুনছিল একমনে।

এমন সময়ে বৈঠকখানায় এসে ঢুকলেন সুধীরবাবু।

সুধীরবাবু হচ্ছেন এ-অঞ্চলের থানার ইনস্পেকটার। বিমল ও কুমারের সঙ্গে তাঁর চেনাশুনো ছিল। মাঝে মাঝে তাই এখানে এসে তিনি চা পান ও গল্পগুজব করে যেতেন।

তাঁকে দেখে কবিতার বই মুড়ে কুমার বললে, 'এই যে সুধীরবাবু! আজ এমন অসময়ে যে?'

সুধীরবাবু একখানা চেয়ারের উপরে বসে পড়ে বললেন, 'আপনাদের কাব্যচর্চায় বাধা দিলুম, কিছু মনে করবেন না! আমি বিশেষ মুশকিলে পড়ে এসেছি।'

—'মুশকিল? কী মুশকিল?'

—'আপনাদের দ্বারা সে মুশকিল আসান হবার আশা নেই। তবু আপনারা খুব বুদ্ধিমান আর সুন্দরবনে 'অমাবস্যার রাতে'র ব্যাপারে আপনারা পুলিশকে আশ্চর্য সাহায্য করেছিলেন বলেই এই ব্যাপারটা নিয়ে আপনাদের সঙ্গে আমি পরামর্শ করতে এসেছি!'

বিমল বললে, 'আমরা হয়তো আপনার কোনো কাজেই লাগব না, তবু ব্যাপারটা কী, শুনতে সাধ হচ্ছে।'

সুধীরবাবু চেয়ার নিয়ে আরও এগিয়ে এসে বললেন, 'গেল হপ্তায় এ-পাড়ায় একটা রহস্যময় খুন হয়েছে তা জানেন তো?'

কুমার বললে, 'হ্যাঁ, কালীপুজোর রাতে হরেন্দ্রনাথ বসুকে রাস্তায় কে বা কারা খুন করে পালিয়ে যায়।'

সুধীরবাবু বললেন, 'পরদিন সকালবেলায় আমরা হরেনবাবুর লাশ পাই। তিনি অ্যাপোলো থিয়েটার দেখে বাড়ি ফিরছিলেন, পথে কে তাঁকে ছুরি মারে। ছুরিখানা তাঁর বুকেই বেঁধা ছিল।'

—'তারপর?'

'তাঁর পকেট খুঁজে আমরা টাকাকড়ি কিছুই পাইনি। তাঁর সোনার রিস্টওয়াচ, রুপোর সিগারেট কেসও হত্যাকারীর হস্তগত হয়েছে, সুতরাং চুরিই যে এই হত্যার উদ্দেশ্য, সে বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই।'

কুমার বললে, 'বোধহয় এখনও আপনি হত্যাকারীর সন্ধান পাননি?'

সুধীরবাবু বললেন, 'না। ওই ছুরিখানা ছাড়া হত্যাকারী তার আর কোনো চিহ্নই পিছনে ফেলে যায়নি। ছুরির ফলায় আর তার হাতলে এত বেশি রক্ত মাখা ছিল যে হত্যাকারীর আঙুলের ছাপও আবিষ্কার করতে পারিনি। এ অঞ্চলে যত দাগি বদমায়েস আছে, তাদের গতিবিধির উপরে লক্ষ রেখেও কোনো ফল হয়নি।'

কুমার জিজ্ঞাসা করলে, 'হরেনবাবুর কোনো শত্রুর খোঁজ পেয়েছেন?'

—'না। হরেনবাবু খুব নির্বিরোধী, অমায়িক ভদ্রলোক ছিলেন। তাঁকে পেটের ভাবনা ভাবতে হত না, থিয়েটার-বায়োস্কোপ দেখে তিনি আমোদ-আহ্লাদেই দিন কাটিয়ে দিতেন। তাঁর বন্ধুবান্ধব আর আত্মীয়রা সবাই তাঁকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন।'

বিমল ধীরে ধীরে বললে, 'যে ছুরি দিয়ে খুন করা হয়েছে, সেখানা আমাকে একবার দেখাতে পারেন?'

সুধীরবাবু বললেন, 'অনায়াসেই। ছুরিখানা আমি সঙ্গে করেই এনেছি। এই নিন।'—বলে পকেট থেকে কাগজে মোড়া ছুরিখানা বার করলেন।

ছুরিখানা পুরোনো ও খুবই সাধারণ। তার বাঁট ছয় ইঞ্চি ও ফলার মাপ লম্বায় পাঁচ ইঞ্চি। ফলাটা বাঁটের ভিতর মুড়ে ফেলা যায়।

বিমল একাগ্র মনে ছুরিখানা পরীক্ষা করছে দেখে সুধীরবাবু হেসে বললেন,

'ছুরির ভিতরে আর নতুন কিছুই দেখতে পাবেন না। ওখানা দেখে যা জানবার তা আমরা জানতে পেরেছি।'

বিমল বললে, 'হ্যাঁ, আপনারা অভিজ্ঞ লোক, এসব বিষয়ে আপনাদের কাছ থেকে আমরা অনেক কিছুই শিখতে পারি। তবু ছুরিখানা আজকের মতো আমার কাছে রেখে যাবেন?'

সুধীরবাবু বললেন, 'তাতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু খুব সাবধানে রাখবেন কারণ ওইটেই হচ্ছে আমাদের একমাত্র সূত্র—'

বিমল হেসে বললে, 'সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন। কাল সকালেই ছুরিখানা আপনি ফেরত পাবেন।'

সুধীরবাবু চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আজ আসি তাহলে।'

॥ ২ ॥

পরদিন সকালে বিমল ও কুমার দাবা বোড়ে খেলছে, এমন সময়ে সুধীরবাবু এসে হাজির হলেন।

বিমল গজের একটা চাল দিয়ে বললে, 'ওই টেবিলের উপরে আপনার ছুরি আছে।'

সুধীরবাবু বললেন, 'নিশ্চয় নতুন কিছু জানতে পারেননি?'

বিমল দাবা বোড়ের ছক থেকে মুখ না তুলেই বললে, 'আপনার প্রশ্নের উত্তরে আমিও একটা প্রশ্ন করব। এ-অঞ্চলে ক-টা কোকেনের আড্ডা আছে—অর্থাৎ যে-সব জায়গায় লুকিয়ে কোকেন বিক্রি করা হয়?'

সুধীরবাবু হঠাৎ এই প্রশ্ন শুনে প্রথমটা অবাক হয়ে রইলেন। তারপর বললেন, 'এ কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন?'

—'কারণ আছে, বলুন না।'

—'আমরা তো বাবুলাল মিত্র লেনের একটা কোকেনের আড্ডার কথাই জানি। ও-আড্ডার উপরে আমাদের নজরও আছে।'

বিমল তখনই উঠে পড়ে বললে, 'এসো কুমার, সুধীরবাবুর সঙ্গে একবার বাবুলাল মিত্র লেনে ঘুরে আসি।'

কুমার বললে, 'কিন্তু আর দু-চাল পরেই আমি যে কিস্তিমাত করব।'

বিমল তার হাত ধরে টান মেরে বললে, 'আরে রেখে দাও তোমার বাজে কিস্তিমাত! এখন জ্যান্ত ঘুঁটি নিয়ে খেলা করার সময় এসেছে, ও কাঠের ঘুঁটি নিয়ে কে আর মাথা ঘামায়?'

...বাবুলাল মিত্র লেন বিমলদের বাড়ির খুব কাছেই। তার একদিকে পাঁচ-ছয়খানা বড়ো বড়ো মাটকোঠা। তারই একখানার সামনে দাঁড়িয়ে সুধীরবাবু বললেন, 'ওইটে হচ্ছে ছট্টু সর্দারের কোকেনের আড্ডা। এ-অঞ্চলে এর চেয়ে বড়ো বা ছোটো আড্ডা আর নেই।'

কুমার বললে, 'সব জেনেও এ আড্ডা আপনারা উঠিয়ে দেন না কেন?'

'যারা কোকেন বেচে তাদের হাতে হাতে ধরা বড়ো সহজ কথা নয়।'

বিমল গলির ওপাশে চেয়ে বললে, 'আমার বন্ধু বিপিনের বাড়ি দেখছি ঠিক এই আড্ডার সামনেই। বিপিনের বৈঠকখানায় বসে আমরা এখানকার সব দৃশ্যই দেখতে পাব। চলুন সুধীরবাবু, ওইখানেই গিয়ে আশ্রয় নেওয়া যাক।'

সুধীরবাবু বললেন, 'কিন্তু আপাতত কোকেনের আড্ডা নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় তো আমার নেই!'

বিমল কোনো জবাব না দিয়ে সুধীরবাবুকে হাত ধরে টেনে নিয়ে চলল।

॥ ৩ ॥

বিপিনবাবুর বৈঠকখানায় বসে প্রথম দিনটা কেবল বাজে গল্প-গুজবেই কেটে গেল।

দ্বিতীয় দিনেও দুপুর গেল, বিকাল গেল, সন্ধ্যা এল বলে।

সুধীরবাবু বিদ্রোহ প্রকাশ করে বললেন, 'বিমলবাবু, হয় আপনার মাথা খারাপ হয়েছে, নয় আপনি অন্যায় ঠাট্টা করছেন। এই যদি আপনার সঙ্গে পরামর্শের নমুনা হয় তাহলে জেনে রাখুন, কাল থেকে আমি আর আপনার বাড়িমুখো হব না।'

বিমল ঘরের জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিল। সে মৃদুস্বরে বললে, 'আচ্ছা সুধীরবাবু, ওই যে লোকটা ছোট্টুর আড্ডা থেকে বেরিয়ে আসছে ওঁকে আপনি চেনেন?'

—'হ্যাঁ, চিনি বই কি! যদিও আমার এলাকায় থাকে না, তবু ওকে নামজাদা

গুন্ডা বলেই জানি। ওর নাম হচ্ছে খ্যাঁদা, বার-দুয়েক পথে রাহাজানি করে ধরা পড়েছে।'

কুমার দেখলে, একটা মোটা, বেঁটে, কালো লোক ছোট্টুর আড্ডা থেকে বেরিয়ে এল। তার গায়ে একটা বেগুনি ফ্লানেলের পাঞ্জাবি, পায়ে লপেটা জুতো, হাতে একগাছা মোটা লাঠি।

বিমল বললে, 'ওকে একবার থানায় নিয়ে যেতে পারেন?'

সুধীরবাবু সবিস্ময়ে বললেন, 'দাগী পাপীদের আমরা সন্দেহ হলেই ধরতে পারি, কিন্তু ওকে আপনি থানায় নিয়ে যেতে বলছেন কেন?'

—'আগে ওকে নিয়ে থানায় চলুন, পরে সব কথা বলব।'

॥ ৪ ॥

থানায় গিয়ে খ্যাঁদা ক্রুদ্ধ স্বরে বললে, 'আমায় কেন ধরে আনা হল? আমি কী করেছি?'

বিমল বললে, 'খ্যাঁদাবাবু, তোমাকে আমরা গোটাকয়েক কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই।'

—'কী কথা?'

—'কালীপুজোর রাত্রে তুমি কোথায় ছিলে?'

—'কোথায় আবার? বাসায়!'

সুধীরবাবু একটা পাহারাওয়ালাকে ডেকে বললেন, 'সেপাই, খ্যাঁদার বাসায় গিয়ে খবর নিয়ে এসো তো কালীপুজোর দিন রাত্রে সে বাসায় ছিল কি না!'

খ্যাঁদা বললে, 'বাসায় ছিলুম মানে কী? একবার খালি থিয়েটার দেখতে বেরিয়েছিলুম।'

—'কোন থিয়েটার!'

অল্প ইতস্তত করে খ্যাঁদা বললে, 'অ্যাপোলো থিয়েটার।'

সুধীরবাবুর কানে কানে বিমল কী বললে। তিনি ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে হাঁকলেন, 'এই সেপাই, এর জামাকাপড় খুঁজে কী আছে দ্যাখো তো?'

একজন পাহারাওয়ালা তখনই খ্যাঁদার জামাকাপড় খানাতল্লাশ করতে লাগল। তার কাছ থেকে পাওয়া গেল একটা মানিব্যাগ, কোকেনের একটা মোড়ক ও একটা সিগারেট-ভরা রুপোর কেস।

সিগারেটের কেসটা নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে বিমল সহজভাবেই বললে, 'এই কেসের উপরে ইংরেজিতে দুটো অক্ষর লেখা রয়েছে—এইচ, বি। যিনি খুন হয়েছেন তাঁর নাম হরেন্দ্রনাথ বসু।'

খ্যাঁদা বাঘের মতন গর্জন করে বিমলের দিকে আচম্বিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিন্তু বিমলও অপ্রস্তুত ছিল না, সে সাঁৎ করে পাশে সরে গেল এবং পরমুহূর্তেই তার বজ্রমুষ্টির আঘাতে খ্যাঁদা মাটির উপরে ছিটকে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেল।

এক লাফে উঠে দাঁড়িয়ে সুধীরবাবু চিৎকার করলেন, 'সেপাই, সেপাই! খ্যাঁদার হাতে হাতকড়ি লাগাও!'

॥ ৫ ॥

সুধীরবাবু বললেন 'এ কি ভোজবাজি?'

বিমল বলল, 'না, এ হচ্ছে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের যথাযথ ব্যবহার। সুধীরবাবু, আপনি কি জানেন না, ইউরোপের অনেক দেশেই পুলিশ এখন অপরাধী ধরে মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে? খ্যাঁদাও আজ ধরা পড়ল মাইক্রোস্কোপের মহিমায়!'

—'তার মানে?'

—'তার মানে, মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে সেই ছুরির বাঁটের খাঁজের ভিতর থেকে আমি এমন দুটো জিনিসের গুঁড়ো পেয়েছি—যা সাদা চোখে দেখা যায় না। সে দুটো জিনিস কী জানেন? কোকেন, আর বেগুনি ফ্লানেলের কণা।'

—'কিন্তু আপনি খ্যাঁদাকে সন্দেহ করলেন কী করে?'

—'কী করে আর, কল্পনাশক্তি প্রয়োগ করে। আমি ভেবে দেখলুম, ছুরির বাঁটের খাঁজে প্রায়-অদৃশ্য বেগুনি ফ্লানেলের কণা থাকবার কারণ কী? ছুরিখানা তাহলে নিশ্চয়ই কোনো বেগুনি রঙের ফ্লানেলের জামার পকেটে ছিল। আর ওই পকেটেই থাকত কোকেন, বাঁটের খাপেও তাই কোকেনের গুঁড়ো পাওয়া গিয়েছে।

'কোকেন-খোরের পকেটেই থাকে কোকেন, অতএব আমি বুঝে নিলুম যে এই ছুরির মালিক কোকেনের ভক্ত, আর বেগুনি ফ্লানেলের জামা পরে। এখন শীতকাল, রঙিন ফ্লানেলের জামা অনেকেই দশ-পনেরো দিনের আগে ছাড়ে না; সুতরাং আন্দাজ করলুম, হত্যাকারী এখনও সেই জামাটা ব্যবহার করছে। আর তার যখন কোকেন খাওয়ার কু-অভ্যাস আছে, তখন সে নিশ্চয়ই নিয়মিতভাবে কোকেনের আড্ডায় আনাগোনা করে।'

কুমার বললে, 'কিন্তু সে তো ও-জামাটা আর না-পরলেও পারত! তারপর সে যে ঠিক কোকেনের ওই আড্ডাতেই যাবে, এরও কোনো নিশ্চয়তা ছিল না।'

বিমল বললে, 'এ কথা আমিও স্বীকার করি। কিন্তু এ-সব ব্যাপারে সর্বপ্রথমে কোনো সূত্র আবিষ্কার করাই হচ্ছে বড়ো কথা। তারপর খানিকটা দৈবের সাহায্যও দরকার হয় বই কি! প্রত্যেক বড়ো বড়ো ডিটেকটিভই সফল হয়েছেন খানিকটা দৈববলেই। এমনকি পৃথিবীর অধিকাংশ বিখ্যাত ব্যক্তির অমরত্বের মূলে কতকটা এই দৈব লীলাই দেখতে পাবে। দৈবের খানিকটা সাহায্য না পেলে আমরা প্রথম চেষ্টাতেই হয়তো খ্যাঁদাকে ধরতে পারতুম না, কিন্তু ছুরির নীরব কথা যখন শুনতে পেয়েছি, আর শহরে কোকেনের আড্ডাও যখন বেশি নেই, তখন আজ হোক আর দু-চার দিন পরেই হোক সে ধরা পড়ত নিশ্চয়ই। সুধীরবাবু, পুলিশের কাজেও বিজ্ঞান-বোধ আর কল্পনাশক্তি থাকা দরকার।'

—'কল্পনাশক্তি?'

—'হ্যাঁ, কল্পনাশক্তি। কবিতা পড়লে কল্পনাশক্তি বাড়ে। আমাদের মতো আপনিও রবীন্দ্রনাথের ভক্ত হয়ে পড়ুন। কারণ রবীন্দ্রনাথ মানেই হচ্ছে কবিতা!'

বনবাসী অভিশাপ

॥ ১ ॥

ছেলেবেলা থেকেই আমার বড়ো শিকারের শখ। ভারতবর্ষের নেটিভ বাঘ, গন্ডার ও ভাল্লুক প্রভৃতি অনেক চতুষ্পদই আমার হাতে জীবন-জ্বালা নিবারণ করেছে বটে, কিন্তু ওসব পশু বধ করে আমি আর নূতন আনন্দ খুঁজে পাই না।

গেল মহাযুদ্ধের সময় হঠাৎ আমার আফ্রিকায় যাবার সুযোগ উপস্থিত হল—অবশ্য বন্দুকধারী সৈনিক বা শিকারি রূপে নয়, কলমধারী কেরানি রূপে। কিন্তু আফ্রিকায় গিয়েও বাঙালি কেরানি আমি ছুটি পেলেই শিকারি মূর্তি ধারণ করতুম।

সেই সময়েরই একটি অদ্ভুত কাহিনি আজ আমি তোমাদের কাছে বলতে এসেছি।

আমি তখন আফ্রিকার কিভু অরণ্যে গিয়ে তাঁবু ফেলেছি। এই কিভু অরণ্যের খ্যাতির প্রধান কারণ, গরিলা। এত বেশি গরিলা আর কোথাও দেখা যায় না, সেইজন্যেই এই অরণ্যকে 'গরিলার স্বর্গ' বলে ডাকা হয়। অবশ্য এখানকার এবং এর কাছাকাছি জঙ্গলে কেবল গরিলা নয়,—হাতি, বুনো মহিষ, চিতে বাঘ, হিপোপটেমাস, অজগর, গন্ডার, সিংহ, ম্যানড্রিল ও আরও অনেক হিংস্র জন্তুও পাওয়া যায়।

গরিলা শিকারে বিপদের ভয় পদে পদেই। একে তো গরিলারা গায়ের জোরে বাঘ ও সিংহেরও উপরে টেক্কা মারতে পারে, তার উপরে তাদের বুদ্ধির জোরও যে-কোনো পশুর চেয়ে বেশি। তারা যখন দঙ্গল বেঁধে জঙ্গলের ভিতরে বেড়িয়ে বেড়ায়, তখন হাতি সিংহ বা গন্ডার পর্যন্ত তাদের পথ ছেড়ে দিয়ে মানে মানে সরে পড়ে হাঁপ ছাড়ে। কাজেই খুব সাবধানে নদীর ধারে একটা খোলা জমি বেছে নিয়ে আমি তাঁবু ফেললুম।

আমার সঙ্গে ছিল বারো জন কাফ্রি কুলি। এই কুলিদের সর্দারের নাম হচ্ছে মুরু। সে খুব পাকা লোক—বনের ভিতরে শিকারিদের পথপ্রদর্শক হয়ে মাথার চুল সে পাকিয়ে ধবধবে করে ফেলেছে। মুরু এ অঞ্চলের পথঘাট সব জানে, এখানকার বন্য অসভ্য জাতিদের সঙ্গে তার পরিচয়ও খুব ঘনিষ্ঠ।

প্রথম রাত্রেই কিভুর জঙ্গলে একটা ঘটনা ঘটল। অনেক রাতে আচমকা আমার ঘুম গেল ভেঙে। কেন সে ঘুম ভাঙল তার কারণ কিছুই বুঝতে পারলুম না, কিন্তু কেবলই মনে হতে লাগল যে আমার তাঁবুর ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে যেন মূর্তিমান কোনো অজানা বিপদ এসে হানা দিয়েছে। তাড়াতাড়ি ইলেকট্রিক টর্চটা তুলে নিয়ে তাঁবুর চারিদিকে আলো ফেলে দেখলুম, কিন্তু কোথাও সন্দেহজনক কিছুই আবিষ্কার করতে পারলুম না। কিছু দেখতে পেলুম না বটে, কিন্তু একটা ব্যাপার অনুভব করলুম। তাঁবুর ভিতরে কেমন যেন একটা দুর্গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে—যেন কোনো বন্য জন্তুর গায়ের বিশ্রী গন্ধ!

বন্দুকটা তুলে নিয়ে তাঁবুর দরজা খুলে বাইরে গিয়ে দাঁড়ালুম। সামনের খোলা জমি চাঁদের আলোয় ধবধব করছে। দূর থেকে নদীর কলরব ভেসে আসছে। নদীর ওপারে ছায়ামাখা অরণ্যের প্রাচীর নিষ্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কোথাও কোনো জীবজন্তুর ছায়া পর্যন্ত নেই।

মিথ্যা ভয় পেয়েছি ভেবে আবার তাঁবুর ভিতরে এসে শুয়ে পড়লুম।

॥ ২ ॥

কিন্তু পরদিন সকালে উঠেই টের পেলুম, কাল রাতে আমি মিথ্যা ভয় পাইনি। আমার তাঁবুর ভিতরে সত্যিই কেউ অনধিকার প্রবেশ করেছিল।

কারণ প্রভাতি চা তৈরি করতে গিয়ে আবিষ্কার করলুম, আমার এক টিন বিস্কুট টেবিলের উপর থেকে বিনা নোটিশে অদৃশ্য হয়েছে! একেবারে নতুন টিন, এখনও খোলা হয়নি।

যদি মনে করা যায় তাঁবুর ভিতরে কাল কোনো জন্তু এসে হাজির হয়েছিল, তাহলে সে জন্তু টিন নিয়ে যাবে কেন? বিস্কুটের বন্ধ টিন চিনতে পারে, পৃথিবীর কোনো বনেই এমন কোনো জন্তু বাস করে না। গরিলারা অনেকটা মানুষের মতন দেখতে বটে এবং তাদের বুদ্ধিবলও যথেষ্ট, কিন্তু এয়ারটাইট বন্ধ টিনের মধ্যে যে খাবার থাকে, এটা আন্দাজ করবার শক্তি নিশ্চয়ই তাদের নেই।

তবে?—আর কিছু নয়, নিশ্চয়ই আমার কোনো লোভী কুলি এই কাজ করেছে।

তখনই চেঁচিয়ে মুরুকে ডেকে সব কথা বললুম। মুরু সমস্ত শুনে কুলিদের কাছে গিয়ে খোঁজখবর নিয়ে এসে বললে, 'হুজুর, তারা কেউ আপনার বিস্কুটের টিন চুরি করেনি।'

আমি বললুম, 'তাই নাকি? তবে কি তুমি বলতে চাও, আমার বিস্কুটের টিন পায়ে হেঁটে বনের ভিতরে হাওয়া খেতে গেছে?'

মুরু মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললে, 'না হুজুর, বিস্কুটের টিন যে হাওয়া খেতে যায় একথা কখনো আমি শুনিনি। কিন্তু সে যে কোথায় পালিয়েছে কুলিরা তা জানে না।'

আমি আর কিছু বললুম না।

সেদিন সন্ধ্যার সময় হঠাৎ আকাশে মেঘ করে বৃষ্টি নামল। দুপুরবেলায় একটা বনমুরগি মেরেছিলুম, তারই মাংসে কারি বানিয়ে পেট ভরিয়ে সেদিন সকাল সকালই বিছানায় গিয়ে আশ্রয় নিলুম। ভিজে ঝোড়ো হাওয়ায় কিভু অরণ্যের ক্রুদ্ধ কোলাহল, উন্মাদিনী নদীর উচ্ছ্বসিত জল-তরঙ্গের আর্তনাদ ও

আমার তাঁবুর চারিদিকে অশ্রান্ত বৃষ্টিনূপুর-ধ্বনি শুনতে শুনতে আমি ঘুমিয়ে পড়লুম। এবং সে রাত্রে আমার স্বপ্নহীন সুখনিদ্রা ভাঙাবার জন্যে তাঁবুর ভিতরে আর কোনো বিভীষিকা এসে সাড়া দিলে না। কিন্তু পরদিন সকালে উঠে আবার সেই দুষ্ট চোরের অপকীর্তি জানতে পারা গেল।

আজ আর বিস্কুটের টিন নয়, পেটুক চোর আজ নিয়ে গেছে ভর্তি একটিন চিনি।

এ তো ভারী মুশকিলে ফেললে দেখছি! আমি এখন কোনো শহরে বাস করছি না যে ইচ্ছে করলেই বাজারে গিয়ে টপাটপ পয়সা ফেলে যত খুশি খাবার কিনে আনব। সভ্যতার কাছ থেকে এত দূরে এই সঙ্গীহীন নিবিড় অরণ্যের মধ্যে এসে রোজ যদি চোরের এমন অত্যাচার সইতে হয় তাহলে দু-চার দিন পরে অনাহারেই মারা পড়তে হবে যে!

অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে আমি তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে গেলুম। কিন্তু সেখানে গিয়েই আর একটা নতুন জিনিস চোখে পড়ল। কালকের রাত্রের বৃষ্টিতে তাঁবুর দরজার সামনে মাটি ভিজে কাদার সৃষ্টি হয়েছে এবং সেই কাদার উপরে রয়েছে মানুষের পায়ের কয়েকটা স্পষ্ট ছাপ। খুব চিৎকার করে ডাকলুম, 'মুরু, মুরু!'

'হুজুর!' বলে মুরু সেলাম ঠুকে দাঁড়াল।

—'মুরু, আজ আবার আমার চিনির টিন চুরি গিয়েছে।'

—'কাল বিস্কুট, আজ চিনি? বলেন কী হুজুর!'

—'শুধু তাই নয়, চোর যে মানুষ, আজ আমি সে প্রমাণও পেয়েছি। এ চোর তোমার ওই কুলিদের দলেই লুকিয়ে আছে।'

'কেমন করে জানলেন?'

'ওই মাটির দিকে তাকিয়ে দ্যাখো।'

মুরু অবাক হয়ে মাটির উপরেই সেই দাগগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল—অনেকক্ষণ ধরে। তারপর সেইখানে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে আরও ভালো করে পরীক্ষা করতে লাগল।

আমি জানতুম, আফ্রিকার বনেজঙ্গলে যারা থাকে, পায়ের দাগ দেখে তারা অনেক তথ্যই আবিষ্কার করতে পারে। কাজেই এই দাগগুলো দেখে মুরু কী বলে তা শোনবার জন্যে সাগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলুম।

মুরু যখন উঠে দাঁড়াল তখন তার মুখে-চোখে যেন কেমন একটা রহস্যের ইঙ্গিত ফুটে উঠেছে।

আমি বললুম, 'কেমন মুরু, এখন বিশ্বাস হল তো যে এ চুরি তোমার কুলিদেরই কীর্তি?'

মুরু মাথা নাড়া দিয়ে বললে, 'না হুজুর, এ পায়ের দাগ আমার কোনো কুলিরই নয়।'

—'কোনো কুলিরই নয়? তুমি কি বলতে চাও, এই গহন বনে আমরা ছাড়া আর কোনো মানুষ আছে?'

মুরু খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপরে মৃদুস্বরে বললে, 'বনে কত রহস্য থাকে তা কে জানে!'

আমি দৃঢ় স্বরে বললুম, 'বনের কোনো রহস্যের কথাই আমি জানতে চাই না। কিন্তু এই হতভাগা চোরকে আজ আমি হাতে হাতে ধরতে চাই।'

—'কেমন করে হুজুর?'

—'তাঁবুর সামনের ওই গাছটার উপরে উঠে আজ রাতে তোমাকে পাহারা দিতে হবে। আর তাঁবুর ভিতরে বন্দুক নিয়ে বসে পাহারা দেব আমি। কিন্তু কুলিদের কারুর কাছেই এসব কোনো কথাই তুমি প্রকাশ কোরো না।'

মুরু ঘাড় নেড়ে বললে, 'আচ্ছা। কিন্তু হুজুর, আমার আর-একটা কথা আপনি বিশ্বাস করবেন?'

—'কী কথা?'

মুরু আমার আরও কাছে সরে এসে চুপিচুপি ভীত স্বরে বললে, 'হুজুর, এই যে পায়ের দাগগুলো দেখছেন এগুলো মেয়েমানুষের পায়ের দাগ।'

আমি স্তম্ভিত মনে ভাবতে লাগলুম মুরু কী বলতে চায়। সে কি ভূত-পেতনির কথা বলছে?

॥ ৩ ॥

দুপুরবেলায় দু-একটা পাখি-টাখি মারবার মতলবে নদীর ধার ধরে এগিয়ে চললুম। ছোট্ট নদীটি এখানে রোদের আভায় চকচকে একটি রুপোর হাঁসুলির মতো বেঁকে বনের ভিতরে চলে গিয়েছে, যেন শ্যামলতার স্নিগ্ধ ছায়াকে খুঁজতে। অরণ্যের ভিতরে বিপুলদেহ বনস্পতিদের আশেপাশে দাঁড়িয়ে বাতাসের তালে তালে দুলছে বাঁশঝাড়ের পর বাঁশঝাড়। এইসব ঝাড়ের কচি কচি বাঁশ ও পাতা

হচ্ছে গরিলাদের প্রধান খাদ্য। কিভুর অরণ্যে বাঁশঝাড়ের সংখ্যা হয় না! সেইজন্যেই গরিলারা এখানে এসে রাজ্য স্থাপন করেছে।

বনে পাখি দেখলুম অনেক, কিন্তু তারা শিকারের পাখি নয়। শ্যামলতার আড়ালে বসে তারা কেউ গান গায়, কেউ পুচ্ছ দুলিয়ে নেচে বেড়ায়, কেউ রামধনু রঙের বিদ্যুতের মতো চোখের সামনে দিয়ে উড়ে যায়, এই ভয়াবহ অরণ্যকে তারা রূপে আর সুরে উৎসবময় করে তোলে; নিষ্ঠুর বন্দুকের জন্যে তারা সৃষ্ট হয়নি।

বনের পাখি আজ আমার উদরের স্বর্গলাভে বঞ্চিত হল বুঝে ধীরে ধীরে আবার তাঁবুর দিকে ফিরলুম। কিন্তু কয়েক পা এগুবার পরেই নদীর ধারে একটা জিনিস আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। বালির উপরে পড়ে কী একটা জিনিস সূর্যের আলোতে জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। কৌতূহলী মনে কাছে গিয়ে অবাক হয়ে দেখলুম, আমার বিস্কুটের টিনটা সেখানে কাত হয়ে পড়ে রয়েছে। বলাবাহুল্য, তার ভিতরে একখানা বিস্কুটও ছিল না।

মহাবিস্ময়ে আমি একেবারে অভিভূত হয়ে গেলুম। মুরু বলে যে-চোর আমার তাঁবুতে ঢুকেছিল সে নাকি স্ত্রীলোক; কিন্তু ভয়ংকর এই কিভুর গহন বন, নরখাদক ব্যাঘ্র, মত্ত হস্তীর দল এবং তাদের চেয়ে ভীষণ হাজার হাজার গরিলা এখানে মূর্তিমান মৃত্যুর মতো বিচরণ করে, দিনের আলোকেও সাহসী পুরুষরা এখানে প্রবেশ করলে আতঙ্কে মূর্ছা যায়, এমন জায়গায় রাতের বেলায় একাকিনী যে ভ্রমণ করতে পারে, কে সেই সাহসিনী নারী? ...আমি জানি কিভুর অরণ্যের সবচেয়ে কাছে যে গ্রাম আছে, তাও এখান থেকে অন্তত বিশ মাইল দূরে। অত দূর থেকে যে কোনো স্ত্রীলোক এসে রোজ আমার খাবার চুরি করবে আর এই হিংস্র জন্তুভরা বনে নিশুত রাতে নদীর ধারে বসে নির্ভয়ে আহার করবে, এ কথা অসম্ভব—সম্পূর্ণ অসম্ভব:

তাহলে এ কে? এ কি তবে মানুষ নয়? তবে কি প্রেতাত্মা বলে কোনো কিছুর অস্তিত্ব সত্য সত্যই আছে? ...কিন্তু ভূতের কর্তব্য তো মানুষকে ভয় দেখানো। এ ভূত তো ভয় দেখায় না, ভয়ে ভয়ে খাবার চুরি করে লুকিয়ে পালিয়ে যায়! আফ্রিকার ভূত কি এতই ভীত?...

সে রাত্রে গাছের ডালে বসে রইল মুরু, আর আমি রইলুম তাঁবুর ভিতরে

চেয়ারে বসে। আলো দিলুম নিবিয়ে এবং হাতে রইল তৈরি বন্দুক।

সারা রাত জেগে ঠায় বসে বসে জঙ্গলের নানান জীবজন্তুর গর্জন ও আর্তনাদ শুনতে লাগলুম, কিন্তু যার আশায় বসে আছি তার পদশব্দ শুনলুম না।

ভোরের পাখির গান শুনে বাইরে বেরিয়ে এসে দেখলুম, পূর্ব আকাশের অঙ্গনে সুন্দরী ঊষা প্রাত্যহিক হোরির আবির খেলা শুরু করে দিয়েছে এবং গাছের উপর থেকে নেমে মুরু আসছে আমার তাঁবুর দিকেই।

তিক্ত স্বরে বললুম 'মুরু, আমাদের রাত জাগাই সার হল, চোর এল না।'

মুরু গম্ভীরভাবে বললে, 'চোর এসেছিল হুজুর!'

—'এসেছিল? কোথায়? কখন?'

—'ওই বাঁশঝাড়ের তলায়। কাল শেষ রাতে।'

—'তুমি তাকে দেখলে, অথচ ধরলে না?'

মুরু ধীরে ধীরে বললে, 'কেমন করে ধরব হুজুর? চাঁদের আলোয় দেখলুম হামাগুড়ি দিয়ে একটা ছায়ামূর্তি বাঁশঝাড়ের তলা থেকে বেরিয়ে এল, তারপর খানিকক্ষণ মাটির উপরে স্থিরভাবে বসে রইল, তারপর বিদ্যুতের মতন আবার ঝুপসি গাছের তলায় কোথায় মিলিয়ে গেল। বোধহয় সে আমাকে দেখতে পেয়েছিল।'

আমি রুদ্ধশ্বাসে বলে উঠলুম, 'তার চেহারা কী রকম মুরু? সে জন্তু, না মানুষ, না—'

—'দূর থেকে কিছুই বুঝতে পারিনি হুজুর!'

আমি দৃঢ়স্বরে বললুম, 'মুরু, আজ রাত্রে আর গাছের উপরে নয়, আমার পাশের তাঁবুতে তুমি জেগে বসে থাকবে। আমার তাঁবুতে আমিও জেগে থাকব। এই চোরকে গ্রেপ্তার না করে এখান থেকে আমি নড়ব না!'

॥ ৪ ॥

রাত বারোটা, একটা, দুটো বেজে গেল। অন্ধকার তাঁবুর ভিতরে একলা আমি শুয়ে আছি, ঘুমের ঘোরে চোখ ভেঙে আসছে, তবু আমি ঘুমোইনি।

অরণ্যের গভীরতার ভিতর থেকে আজও তেমনি জীবন ও মৃত্যুর কোলাহল ভেসে আসছে—কেউ করছে প্রচণ্ড গর্জন, কেউ করছে করুণ আর্তনাদ। গানের

পাখিরা এখন গান গেছে ভুলে, মাঝে মাঝে খালি অমঙ্গলের সম্ভাবনা জানিয়ে কর্কশ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠছে পেচকরা এবং জীবজন্তুর সেইসব শব্দের উপরে আর একটা ভয়ানক শব্দ সারাক্ষণ জেগে রয়েছে, যা অবর্ণনীয়। হুম-হুম, হুম-হুম—যেন বনবাসী নিশীথিনীর হৃৎপিণ্ডের অশ্রান্ত শব্দ! সেই অরণ্য-শ্মশানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হচ্ছে কালরাত্রি, তার ক্ষুধিত নিষ্ঠুর আত্মা যেন তালে তালে হুংকার দিয়ে ক্রমাগত বলে যাচ্ছে—'রক্ত কই? রক্ত চাই! রক্ত কই? রক্ত আন! রক্ত কই? রক্ত দে!'—বুনো রাতের এই ভাষা বোঝে বলেই হয়তো প্রতি রাত্রে বনে বনে সিংহ জাগে, চিতা হানা দেয়, অজগর পাকসাট মারে!

আচম্বিতে আমার তাঁবুর দরজার পর্দা আস্তে আস্তে সরিয়ে খানিকটা চন্দ্রকিরণ ভিতরে প্রবেশ করল।

তাড়াতাড়ি আমি চোখ মুদে ফেললুম—হয়তো এই চাঁদের আলোর সঙ্গে এখনই সে মূর্তিমান বিভীষিকা তাঁবুর ভিতরে প্রবেশ করবে।

নিবিড় অন্ধকারেও তার চোখ অন্ধ হয় না। আমি জেগে আছি দেখলে হয়তো সে দরজার কাছ থেকেই উঁকি মেরে আবার অদৃশ্য হবে।

কিন্তু কে সে—কে সে! সে জন্তু নয় তা জানি, কিন্তু সে কি মানুষ?

ডান হাতে রিভলভার ও বাম হাতে ইলেকট্রিক টর্চটা প্রাণপণে চেপে ধরলুম।

তারপরেই খুব মৃদু পায়ের শব্দ পেলুম। শব্দটা ক্রমে আমার মাথার কাছে এসে হঠাৎ থেমে গেল। বিষম একটা বোঁটকা গন্ধে চারিদিক বিষাক্ত হয়ে উঠল—যেন কোনো বন্য জন্তুর গায়ের গন্ধ।

ফোঁস করে একটা তপ্ত নিশ্বাস আমার মুখের উপর এসে পড়ল! বিভীষিকা তাহলে আমার শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছে—হয়তো জ্বলন্ত দৃষ্টিতে আমাকেই লক্ষ করছে! কিন্তু যদি সে হঠাৎ আমাকে আক্রমণ করে? এই সম্ভাবনা মনে জাগবামাত্রই তিরের মতো উঠে পড়লুম—এবং সঙ্গে সঙ্গে টর্চের চাবিও টিপে ধরলুম।

টর্চের আলোকোচ্ছ্বাসের মধ্যে যে মুখখানা দুঃস্বপ্নের মতো ফুটে উঠল, সে কি মানুষের মুখ? সে কি স্ত্রীলোকের মুখ? সে কি পুরুষের মুখ?

—দপদপ করছে দুটো অগ্নিভরা বুভুক্ষু দৃষ্টি, ঝকমক করছে অনেকগুলো হিংস্র দন্ত, লটপট করছে রাশীকৃত কুণ্ডলী-পাকানো সাপের মতো কেশমালা! তারপরেই আলোকরেখার ভিতর থেকে সেই বিভীষণ মুখখানা বিদ্যুতের মতন সাঁৎ করে সরে গেল।

যত জোরে পারি চেঁচিয়ে উঠলুম, 'মুরু! মুরু! মুরু!'

দ্রুত পদধ্বনি—এবং পরমুহূর্তেই তাঁবুর বাইরে বিকট এক অমানুষিক তীব্র গর্জন ও বিষম আর্ত চিৎকার।

এক লাফে আমিও তাঁবুর বাইরে গিয়ে দাঁড়ালুম। উজ্জ্বল চাঁদের আলোয় যা দেখলুম, সে কী দৃশ্য! তাঁবুর দরজার সামনেই মাটির উপরে পড়ে ছটফট করছে হতভাগ্য মুরু এবং মুরুর বুকের উপর পড়ে তার গলা কামড়ে ধরেছে প্রেতিনীর মতন বীভৎস একটা কালো মূর্তি।

আমাকে দেখেই সে আবার গর্জন করে লাফিয়ে উঠল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাকে লক্ষ্য করে আমিও রিভলভারের ঘোড়া টিপে দিলুম!—অত্যন্ত তীক্ষ্ণ এক চিৎকার করে মূর্তিটা মাটির উপরে লুটিয়ে পড়ে স্থির হয়ে রইল।

ঠিক সেই সময়েই গভীর অরণ্যের ভিতর থেকে আর একটা বিচিত্র ভয়াবহ রোমাঞ্চকর কোলাহল জেগে উঠল—যেন বিরাট অরণ্যের ভয়ংকর বিপুল আত্মা প্রচণ্ড হিংসার নেশায় অধীর হয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে—এগিয়ে আর এগিয়ে আর এগিয়ে আসছে!

এ আমার বিকৃত মস্তিষ্কের কল্পনা নয়, কিন্তু স্তম্ভিত বিস্ময়ে স্পষ্টই দেখলুম, বনের বড়ো বড়ো বাঁশগুলো টলমল টলমল করে দোল খাচ্ছে, মড়মড় করে গাছের পর গাছ ভেঙে পড়ছে এবং যেন জীবন্ত অন্ধকারের একটা সুদীর্ঘ প্রাচীর পৃথিবীকে থরথরিয়ে কাঁপিয়ে আমাদের লক্ষ্য করেই তেড়ে আসছে!

কী করব বুঝতে না পেরে আচ্ছন্নের মতন দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময় আমার পিছন থেকে একটা কালো মূর্তি সেই জীবন্ত অন্ধকারের দিকে ছুটে গেল কালবৈশাখীর মতই তীব্র বেগে।

চমকে পিছন ফিরে দেখি, আমার রিভলভারের গুলিতে আহত সেই ভয়াবহ মূর্তিটা আর সেখানে মাটির উপরে পড়ে নেই।

নিজের আহত কণ্ঠদেশে হাত দিয়ে মুরুও তখন উঠে দাঁড়িয়েছে।

হাঁপাতে হাঁপাতে বললুম, 'মুরু! মুরু! এ কী ব্যাপার? বনের ভিতরে ও কীসের শব্দ? কী এগিয়ে আসছে?'

যাতনাবিকৃত স্বরে মুরু বললে, 'না হুজুর, ওরা আর এগিয়ে আসছে না, ওরা আবার বনের ভিতরে ফিরে যাচ্ছে।'

'ওরা? কারা?'

—'ওরা গরিলা!'

—'গরিলা? ওরা এগিয়েই বা আসছিল কেন, আর ফিরেই বা যাচ্ছে কেন?'

—'নুমা হুজুর, নুমা! নুমা হচ্ছে গরিলাদের মেয়ে, তাকে ফিরে পেয়েই ওরা আবার ফিরে যাচ্ছে।'

—'মুরু, কী তুমি বলছ!'

—শুনুন হুজুর। এখান থেকে বিশ মাইল তফাতে কাফ্রিদের একটা গ্রাম আছে। নুমা ছিল কাফ্রিদের সর্দারের মেয়ে। তার বয়স যখন দেড় বছর, গরিলারা একদিন এসে তাকে চুরি করে নিয়ে যায়। সেই থেকে গরিলাদের সঙ্গে থেকে নুমাও এখন গরিলাদের মেয়ে হয়ে গেছে। আর-কোনো মানুষই তাকে দেখতে পায়নি। সে আজ ষোলো বছরের কথা।'

অবাক হয়ে নিষ্পলক নেত্রে অরণ্যের দিকে তাকিয়ে রইলুম। স্বপ্নময় চাঁদের আলোয় চারিদিক রুপোলি ছবির মতো অপূর্ব হয়ে উঠেছে।

নদীর সমুজ্জ্বল হীরকখচিত জলবীণায় যে গানের আনন্দ বেজে উঠেছে, তার মধ্যে আর এতটুকু ভয় বা বিষাদের আভাস নেই।

গরিলাদের পোষা মেয়ে নুমা নিশ্চয়ই আর কখনো তার মানুষ-মায়ের কোলে ফিরে আসেনি।
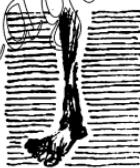
পেপির দক্ষিণ পদ

বিলাত থেকে বাংলা দেশে ফিরছি।

জাহাজ যখন এডেন বন্দরে, একজন বুড়ো আরব আমার সামনে মোট নামিয়ে ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে শুধোলে, 'কিউরিও কিনবেন? ভালো কিউরিও!'

কিউরিও কেনবার বাতিক আমার ছিল। কলকাতায় আমার বৈঠকখানা দেখে বন্ধুরা মত প্রকাশ করত, ঘরখানাকে আমি প্রায় ছোটোখাটো মিউজিয়ম করে

তুলেছি—কারণ সেখানে দিকে দিকে সাজানো ছিল দেশ-বিদেশের নানান শিল্প ও কৌতুক সামগ্রীর নমুনা।

বুড়ো আরবটাকে সাগ্রহে বললুম, 'খোলো তোমার মোট, দেখাও তোমার মাল।'

মোটের ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়ল রকম-বেরকম জিনিস। বেশির ভাগই আজেবাজে ছেলেখেলার সামিল। কিন্তু একটি জিনিস বিশেষভাবে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে।

চোখে দেখে আমার মনের ভাব বুঝে চালাক আরবটা বললে, 'ওটি হচ্ছে দুর্লভ পদার্থ। চার হাজার বছর আগেকার মমির পা।'

প্রাচীন মিশরের সুরক্ষিত, বিশুষ্ক মৃতদেহের কথা সকলেই শুনেছে। মিশরের বা আধুনিক ইজিপ্টের যাদুঘরে আমি অনেক মমি দেখেছি! কলকাতার যাদুঘরেও মমির একটি নিদর্শন আছে—যদিও তার অবস্থা ভালো নয়। কিন্তু এই বুড়ো আরবটা যা দেখাল, তা গোটা মমি নয়—বিশুষ্ক মনুষ্যদেহের হাঁটুর নীচে থেকে কেটে নেওয়া একখানা পা মাত্র। একেবারে নিখুঁত পা, তার কোনো অংশই একটুও নষ্ট হয়নি।

জিজ্ঞাসা করলুম, 'গোটা মমিটা কোথায় গেল?'

সে বললে, 'কেউ তা জানে না। মহাশয়, এই মমির পায়ের ইতিহাস আছে। প্রায় চার হাজার বছর আগে প্রথম মেন্টুহোটেপ যখন মিশরের রাজা, তখন শেয়ালমুখো দেবতা আনুবিসের মন্দিরে এক পুরোহিত ছিল, নাম তার পেপি। কী কারণে জানি না, রাজা মেন্টুহোটেপের হুকুমে পেপির প্রাণদণ্ড হয়। ঘাতক আগে তার দুই হাত আর দুই পা একে একে কেটে নেয়, তারপর করে মুণ্ডচ্ছেদ। অনেক চেষ্টার পর আমি কেবল পেপির এই ডান পা-খানা সংগ্রহ করতে পেরেছি।'

আমি বুঝলুম, বুড়োর এই বাজে গালগল্পটা ব্যাবসাদারির একটা চাল মাত্র। তা নিয়ে আর মাথা না ঘামিয়ে, খানিকক্ষণ দরদস্তুরের পর মমির সেই পা-খানা আমি কিনে ফেললুম।

জাহাজের কাপ্তেন সেইখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমি কী কিনেছি দেখে গম্ভীর হয়ে বললেন, 'মি. সেন, এ সব জিনিস কেনার খেয়াল ভালো নয়। ইজিপ্টের মমিকে তার স্বদেশের বাইরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে আমার কোনো কোনো

বন্ধু সমূহ বিপদে পড়েছেন—কারণ সেটা হচ্ছে পবিত্র বস্তুর অপব্যবহার।'

কাপ্তেনের কথা হেসেই উড়িয়ে দিলুম।

॥ দুই ॥

কলকাতার বাড়িতে ফিরে আসতেই আমার মা করলেন মমির এই দক্ষিণ পদের বিরুদ্ধে বিষম বিদ্রোহ ঘোষণা।

স্পষ্ট ফতোয়া দিলেন, 'আমার বাড়িতে ওই পচা মড়ার ঠাঁই হবে না!'

আমি বললুম, 'পচা নয় মা, শুকনো। এই যেমন শুঁটকিমাছ আর কী! অনেকে কি শুঁটকি মাছ খায় না?'

মায়ের নাসিকাযন্ত্রকে সত্য সত্যই যেন আক্রমণ করলে কোনো উৎকট দুর্গন্ধ! তাড়াতাড়ি নাকে কাপড় চাপা দিয়ে তিনি বলে উঠলেন, 'ওরে পিশাচ, থুঃ থুঃ থুঃ! ম্লেচ্ছের মুল্লুকে গিয়ে তুই কি শুঁটকি মড়াও খেতে শিখেছিস?'

অনেক চেষ্টা ও খোশামোদের পর শেষ পর্যন্ত মায়ের সঙ্গে এই রফাই হল যে, পুরোহিত পেপির দক্ষিণ পদখানি অতঃপর বিরাজ করবে সদর-মহলে একতলার বৈঠকখানায় 'গ্লাস কেসে'র মধ্যে এবং কোনো ওজরেই তাকে নিয়ে আমি বাড়ির উপরতলায় উঠতে বা অন্দর মহলে প্রবেশ করতে পারব না।

॥ তিন ॥

তেরাত্রি পোয়াতে না পোয়াতে যে সব ঘটনা ঘটতে লাগল, তার কোনো মানে হয় না।

এক সকালে ঘরের বাইরে এসেই শুনলুম, মহাশোরগোল শুরু করে দিয়েছে আমাদের দারোয়ান।

কাল রাত্রে সে নাকি নিজের হাতে সদর দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল। কিন্তু আজ ভোরবেলায় উঠে দেখে, দরজা কে দোহাট করে খুলে দিয়েছে!

কিন্তু তারও চেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার দেখে আমার চক্ষুস্থির হয়ে গেল।

দরজার সামনে চলনপথে পড়ে রয়েছে পুরোহিত পেপির কর্তিত দক্ষিণ পদ!

এই পা-খানাকে আমি স্বহস্তে রেখে দিয়েছিলুম বৈঠকখানার চাবিবন্ধ গ্লাস কেসে'র ভিতরে এবং সে ঘরের দরজাও ছিল বাহির থেকে তালাবন্ধ!

॥ চার ॥

এ অঞ্চলের থানার ইনস্পেকটার নবীন হচ্ছে আমার বন্ধু।

আজ সকালেও আমাদের সদর দরজা ছিল খোলা এবং সেই হতচ্ছাড়া কাটা ডান পা-খানা পড়েছিল আমার চোখের উপরে! বলা বাহুল্য, আজও সে সচল হয়ে বেরিয়ে এসেছে তালাবন্ধ ঘরের চাবিবন্ধ 'গ্লাস কেসে'র ভিতর থেকে!

আড়ষ্ট ও নিরুপায় ভাবে তার দিকে তাকিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময়ে নবীনের প্রবেশ। এসেই সে বললে, 'ওহে, কাল নিশুত রাতে এমন একটা ব্যাপার দেখেছি, যা আজব বলাও চলে।'

'আজব ব্যাপার? কোথায়?'

—'তোমাদের সদর দরজার সামনে।'

—'তার মানে?'

—'রোঁদে বেরিয়েছিলুম। হঠাৎ দেখি আমাদের আগে আগে যাচ্ছে একটা মস্ত ঢ্যাঙা মূর্তি। মাথা সমান উঁচু একগাছা লাঠির উপরে ভর দিয়ে সে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে পথ চলছিল।'

—'খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে?'

—'হ্যাঁ। পথের আধা আলো আর আধা অন্ধকারে তাকে ভালো করে দেখা যাচ্ছিল না। তবু মনে হল সে বিদেশি, আর তার ডান পা-খানা নেই।'

আমি রুদ্ধশ্বাসে শুধালুম, 'তারপর?'

—'লোকটা যখন তোমাদের বাড়ির সদর দরজা পর্যন্ত এসেছে, তখন আমার কেমন সন্দেহ হল। আমি তাকে চেঁচিয়ে 'চ্যালেঞ্জ' করলুম। সঙ্গে সঙ্গে সেই মূর্তিটা—বললে তুমি বিশ্বাস করবে না—ঠিক যেন বাতাসের সঙ্গে একেবারে মিলিয়ে গেল! এমন আশ্চর্য চোখের ভ্রম আমার আর কখনো হয়নি।'

এ কথার উত্তরে কোনোরকম উচ্চবাক্য করা আমি বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করলুম না।

॥ পাঁচ ॥

এবারে চূড়ান্ত ঘটনা।

যদি কোনো বিশেষজ্ঞ এই ঘটনা শোনেন, তবে তিনিই বলতে পারবেন, আমি স্বপ্নচারণ-রোগের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলুম, না, যা দেখেছিলুম তা হচ্ছে 'হ্যালসিনেশন' বা ভ্রান্তি মাত্র।

সে রাতে ঘুম ভেঙে গেল আচমকা।

তিনতলার ছাদের উপরে স্পষ্ট শুনলুম ধুপ ধুপ ধুপ শব্দ। যেন কে ভারী ভারী পা ফেলে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে ছাদের এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত!

চোর নাকি! কিন্তু চোর কি পদচারণা করবে এমন সশব্দে?

দৌড়ে গিয়ে উঠলুম ছাদের উপরে। অন্ধকার ঘুটঘুটে রাত। কিন্তু দুর্ভেদ্য অন্ধকার ভেদ করে ফুটে উঠেছে এক অদ্ভুত মূর্তি! ঠিক যেন পুরু অথচ স্বচ্ছ কালো মেঘ দিয়ে গড়া এক আশ্চর্য মনুষ্যদেহ এবং তার মেঘবরন মুখমণ্ডলের মধ্যে জ্বলছে স্থির বিদ্যুৎবর্ত্তুলের মতো দুটো নিষ্পন্দ চক্ষু!

স্তম্ভিতের মতো দাঁড়িয়ে রইলুম—দুই মিনিট, কি দুই ঘণ্টা, জানি না!...

আচম্বিতে যেন অন্য জগৎ থেকেই জেগে উঠল ভোরের পাখিদের প্রথম কাকলি।

সঙ্গে সঙ্গে শুনলুম বীভৎস আর্তনাদ! সভয়ে রোমাঞ্চিত দেহে দেখলুম, সেই অসম্ভব মূর্তিটার বাম-হাতখানা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ছাদের উপরে গিয়ে ঠিকরে পড়ল,—তারপর আবার আর্তনাদ এবং বিচ্ছিন্ন হল বাম পদ,—তারপর মূর্তিটা একেবারে শুয়ে পড়ে আবার আর্তনাদ করে উঠল এবং তার বিচ্ছিন্ন দক্ষিণ পদখানা নিক্ষিপ্ত হল আমার পায়ের কাছে! তারপর আর আর্তনাদ শুনলুম না, কেবল দেখলুম মূর্তির ধড় থেকে বিযুক্ত হয়ে গেল মুণ্ডটা, নিবে গেল দুটো অগ্নিচক্ষু এবং ফিনকি দিয়ে ছুটতে লাগল রক্ত আর রক্ত আর রক্ত!

আর আমি সইতে পারলুম না, মাথা ঘুরে পড়ে গেলুম সেইখানেই।

ছাদের উপরেই চোখ মেললুম প্রথম রোদের ছোঁয়া পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই।

আমি একলা। কেবল আমার পাশে পড়ে রয়েছে মমির সেই দক্ষিণ পদ।

সেই অভিশপ্ত বস্তুটাকে গঙ্গাজলে বিসর্জন দিয়ে স্নান করে বাড়িতে ফিরে এলুম।

পোড়ো বাড়ি

বাড়িওয়ালা বললে, 'হাঁ মশাই, দাঙ্গার পর থেকেই আমার এই বাড়িখানা খালি পড়ে আছে। এ অঞ্চলে আর কোনো হাঙ্গামা নেই, অথচ এমন চমৎকার বাড়ি, তবু লোকে এখনও কেন যে এখানে বাস করতে ভয় পায়, আমি তা বুঝে উঠতে পারি না।'

আমি বললুম, 'বাড়িখানা আমার পছন্দ হয়েছে। আমি মিথ্যা ভয় পাওয়ার লোক নই, আর আমার কাছে বন্দুক আছে। কিন্তু আপনি কত ভাড়া চান?'

—'বেশি নয়, মাত্র পঞ্চাশ টাকা। এ বাড়ির জন্যে আগে আমি একশো পঁচিশ টাকা ভাড়া পেতুম। কিন্তু একে এখন দিন-কাল খারাপ, তার উপরে বাড়িখানার সুনাম আবার আমি ফিরিয়ে আনতে চাই। তাই আপাতত পঞ্চাশ টাকা করে পেলেও আমি খুশি হব।'

আমি বললুম, 'তাই সই।'

লক্ষ করলুম, বাড়িওয়ালা একটা আস্বস্তির নিশ্বাস ফেললে। ভাড়া কম হোক, এই পোড়োবাড়ির জন্যে অবশেষে একজন ভাড়াটিয়া যে জুটল, এইটেই সে সৌভাগ্য বলে মনে করলে। লোকটার দেহ হাড়-জিরজিরে, আর কথা কইতে কইতে সে ক্রমাগত হাঁপাচ্ছিল—পুরাতন হাঁপানির রোগীর মতো! কিন্তু তার চোখ দুটো এমন উজ্জ্বল যে, হঠাৎ দেখলে মনে হয় যেন জ্বলন্ত। আমার হাতে চাবির গোছা দিয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে ও লাঠি ঠক ঠক করতে করতে সে চলে গেল। বাঁচলুম,—কেন জানি না, তাকে দেখে আমার কেমন অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল! যেন সে কোনো ভাবী অমঙ্গলের অগ্রদূত।

॥ দুই ॥

এতদিন বিহারে ছিল আমার কর্মস্থল, এখন হঠাৎ বদলি হয়েছি কলকাতায়। পরিবারবর্গকে আপাতত বিহারে রেখেই, আমার বিহারি বেয়ারা রামসহায়কে সঙ্গে নিয়ে কলকাতায় এসেছি বাসাবাড়ির খোঁজে।

ভাড়া পেলুম মনের মতো বাসা। 'ফ্লোরে'র উপরে দিব্য দোতলা বাড়ি, নীচে চারখানা ও উপরে দুখানা ঘর, তার উপরে আছে রান্না ও ভাঁড়ার ঘর। সংসারে মানুষ বলতে আমি, আমার স্ত্রী ও দুটি ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ে, সুতরাং এই বাড়িতেই আমাদের বেশ কুলিয়ে যাবে।

গেল বারের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা এখানে নাকি চরমে উঠেছিল। এই বাড়িতে যারা বাস করত, তাদের কেউ কেউ মারা পড়ে, কেউ কেউ পালিয়ে যায়, আজ পর্যন্ত আর ফিরে আসেনি। সেই থেকে বাড়িখানা পোড়ো হয়ে আছে।

বাড়িখানা শহরের উপকণ্ঠে। এর আশেপাশে ছিল কয়েকটা বস্তি, দাঙ্গার সময়ে মারামারি, লুঠতরাজ ও অগ্নিকাণ্ডের ফলে সেগুলোর অস্তিত্ব প্রায় লোপ পেতে বসেছে! আজও সেখানে বসতি নেই, দেখা যায় কেবল জনশূন্য ধ্বংসাবশেষ! তাই প্রায় আধ-পোয়া পথ পার না হলে এখানে কোনো প্রতিবেশীর মুখ দেখবার উপায় নেই। কিন্তু সেজন্যে বিশেষ মাথা ঘামালুম না, কারণ আমি নিজে কুনো মানুষ, আমার পক্ষে প্রতিবেশীরা অনেক সময় বিরক্তিদায়ক।

ভৃত্য রামসহায় অনেক বিহারির মতো বেশ ভালো বাংলা বলতে পারত। আমি তাকে 'রাম' বলে ডাকি।

বললুম, 'রাম, আজকের মতো তুমি বাড়ির দোতলাটা সাফ করে রাখো। আজই সন্ধ্যার আগে রাত কাটাবার জন্যে জিনিসপত্তর নিয়ে আমরা এই বাড়িতে এসে উঠব।'

রাম বললে, 'যে আজ্ঞে হুজুর!'

ভাবতে লাগলুম, বাড়িখানা আমি ভাড়া নিতে রাজি শুনে বাড়িওয়ালার উজ্জ্বল চোখ দুটো অমন আরও বেশি জ্বলজ্বল করে উঠল কেন? তা কি আনন্দে? না তার অন্য কোনো রহস্যময় কারণ আছে?

এ প্রশ্নের উত্তর পেলুম সেই রাত্রেই।

॥ তিন ॥

বলেছি, বাড়ির দোতলায় মাত্র দুখানা ঘর। একখানা পশ্চিম দিকে, আর একখানা দক্ষিণ দিকে। ঘর দুখানা বেশ বড়োসড়ো।

বাড়িতে এসে যখন উঠলুম, তখন সন্ধ্যা হয় হয়। স্থির করলুম, নিদ্রাদেবীর আরাধনার পক্ষে দক্ষিণের ঘরই প্রশস্ত।

নির্জন পল্লি, নিরালা সন্ধ্যা, নিস্তব্ধ বাড়ি। নিজেদের পদধ্বনি চারিদিককে প্রতিধ্বনিত করে তুলল—ঠিক যেন আরও কেউ কেউ পদচালনা করছে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে! অনেক দিনের খাঁ খাঁ করা পোড়োবাড়ি, এরকম ভ্রম হওয়া স্বাভাবিক। এই মিথ্যা ভ্রমটা মনের ভিতর থেকে মুছে ফেলবার চেষ্টা করলুম, কিন্তু পারলুম না,—বারবার তবু মনে হতে লাগল, এ বাড়িতে আমরা ছাড়া আরও কাদের অস্তিত্ব আছে। এখনও তারা অদৃশ্য বটে, কিন্তু যে-কোনো মুহূর্তে হতে পারে দৃশ্যমান!

এমন ধারণার কোনো অর্থ হয় না। আমি ভীরু নই, ভূত মানি না, ভূতের গল্প শুনেছি কিন্তু ভূত কখনো দেখিনি এবং দেখব বলে বিশ্বাসও করি না। হয়তো মানুষের মনের উপরে কাজ করে কোনো কোনো স্থান-কালের বিশেষত্ব। অসম্ভবকেও মনে হয় সম্ভবপর।

নির্বাচিত ঘরে ঢুকেই পড়লুম এক মুশকিলে। দক্ষিণ দিকের জানালা খুলে দিতেই মন উঠল শিউরে—পেলুম যেন কোনো গলিত মৃতদেহের দুর্গন্ধ!

নাকে কাপড়চাপা দিয়ে উঁকি মারলুম জানালার বাইরে। নীচেই রয়েছে পচা জলে ভরা একটা খানা এবং তারপরেই খানিকটা জমির উপরে ভাঙাচোরা, লণ্ডভণ্ড, জনহীন বস্তি। কোথাও জনপ্রাণীর সাড়া নেই।

বললুম, 'রাম, ওই খানার ধারে নিশ্চয় কোনো মরা কুকুর-বিড়ালের পচা দেহ পড়ে আছে। এই দারুণ গ্রীষ্মে দক্ষিণের জানালা বন্ধ করে তো এ ঘরে থাকা যাবে না। চলো, পশ্চিম দিকের ঘরে যাই।'

রাম বললে, 'তাই চলুন।'

পশ্চিমের ঘরে হাওয়া কম হলেও দুর্গন্ধ নেই। কিন্তু অসুবিধায় পড়লুম আর এক কারণে। 'সুইচ' টেপাটিপি করেও আলো জ্বালতে পারলুম না। ইলেকট্রিকের তার কোথাও খারাপ হয়ে গিয়েছে।

নাচার হয়ে রামকে বললুম, 'তুমি বাজার থেকে বাতি কিনে আনো। আজকের রাতটা তো কোনোরকমে কাটিয়ে দি, তারপর কাল সকালে উঠে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে।'

॥ চার ॥

বাতি নিবিয়ে, কেমন একটা অহেতুকী অশান্তির ভাব মনের মধ্যে নিয়ে শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করলুম। শেষ পর্যন্ত ঘুমিয়ে পড়লুম বটে, কিন্তু তন্দ্রাঘোরেও মনে হয়েছিল, ঘরের ভিতরে কারা যেন নীরবে আনাগোনা করছে!

কতক্ষণ পরে জানি না, আমার ঘুম ভেঙে গেল আচমকা। আমার মুখের উপরে পড়ল যেন কার উত্তপ্ত নিশ্বাস!

আমি কি স্বপ্নলোকে বাস করছি? কিন্তু পরমুহূর্তেই অনুভব করলুম, ঠিক পাশেই আমার গায়ের সঙ্গে গা মিলিয়ে শুয়ে আছে আর-একটা জীবের দেহ! কোমল, রোমশ, জীবন্ত দেহ! স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে তার শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ! সেই সঙ্গে পেলুম একটা জান্তব গন্ধ!

ধড়মড় করে উঠে বসে একলাফে বিছানার বাইরে গিয়ে পড়লুম এবং পর-মুহূর্তে আচম্বিতে দপ করে জ্বলে উঠল ঘরের বৈদ্যুতিক আলো!

কিন্তু তখন আলো-জ্বালার ব্যাপারটা আমাকে বিস্মিত করলে না, কারণ সর্বপ্রথমেই আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হল বিছানার দিকে।

কে ওখানে, কী ওখানে শুয়ে আছে? কিন্তু কী আশ্চর্য, বিছানার উপরে কেউ তো নেই!

কেবল বিছানার উপর নয়, আমার বিস্ফারিত চক্ষু সমস্ত ঘরখানা আঁতিপাঁতি করে খুঁজে সন্দেহজনক বা ভয়াবহ কোনো কিছুই আবিষ্কার করতে পারলে না।

এ কি ভ্রম? এ কি দুঃস্বপ্ন? কিন্তু তাই যদি হবে, তবে বারবার 'সুইচ' নাড়াচাড়া করে বহু চেষ্টার পরেও যে আলো জ্বালতে পারিনি, সেটা হঠাৎ এখন আপনা আপনি জ্বলে উঠল কেমন করে?

এগিয়ে 'সুইচ' তুলে দিলুম। কিন্তু চেষ্টা করেও যে আলো জ্বালতে পারিনি, এখন চেষ্টা করে তাকে আর নেবাতেও পারলুম না!

সবই অস্বাভাবিক ব্যাপার! তাড়াতাড়ি দরজা খুলে রামের নাম ধরে চিৎকার করে ডাকতে লাগলুম। সে শুয়েছিল দরজার বাইরে বারান্দার উপরে। আমার চিৎকার শুনে ভিতরে ছুটে এল হন্তদন্তের মতো।

উত্তেজিত স্বরে বললুম, 'রাম, এতক্ষণ আমার বিছানার উপরে কে শুয়ে ছিল। তারপর চেয়ে দ্যাখো, ঘরের আলোটা আপনা আপনি জ্বলে উঠেছে!'

আমার মুখের পানে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রামসহায় থ হয়ে দাঁড়িয়ে

রইল বোবা মূর্তির মতো! সে বেশি ভয় পেয়েছে, না বেশি হতভম্ব হয়েছে, বোঝা গেল না।

আবার বিছানার দিকে চেয়েই আমার বুকটা ধড়াস করে উঠল! ও আবার কী ব্যাপার?

বিছানার চাদরের উপরে রয়েছে কতগুলো কাদামাখা পদচিহ্ন! দেখতে অনেকটা বিড়ালের থাবার মতো, কিন্তু সেগুলি বিড়ালের থাবার চেয়ে অনেক বড়ো!

আমি চেঁচিয়ে বলে উঠলুম, 'হলপ করে বলতে পারি, আধ মিনিট আগেও ওই থাবার দাগগুলো ওখানে ছিল না!'

আতঙ্কগ্রস্ত কণ্ঠে রামসহায় বললে, 'হুজুর! বাইরে চলে আসুন!'

বাইরেই চলে এলুম—একেবারে বাড়ির বাইরে। শেষ রাতটা কাটল রাস্তার ধারে রোয়াকের উপরে।

॥ পাঁচ ॥

সকালে বাড়িওয়ালার সঙ্গে দেখা। সব কথা খুলে বললুম।

বাড়িওয়ালা হাঁপের টান সামলাতে সামলাতে হাসবার চেষ্টা করে বললে, 'মিছেই ভয় পেয়েছেন। ঘরের ভিতরে ভাম এসেছিল। পাশের খানায় ভাম থাকে।'

—'কিন্তু সে বন্ধ ঘরের ভিতরে এল কেমন করে?'

—'জানালা দিয়ে।'

—'ভাম কখনো একতলা থেকে দোতলায় লাফিয়ে উঠতে পারে?'

—'দোতলায় যখন উঠেছে, নিশ্চয়ই পারে।'

—'ধরলুম তাই। কিন্তু ভাম যখন ঘরের ভিতরে নেই, তখন তার পায়ের চিহ্ন বিছানার উপরে পড়ল কেন?'

—'আপনি ভুল দেখেছেন। পায়ের চিহ্ন আগে থাকতেই বিছানার উপরে ছিল।'

—'আর ইলেকট্রিক লাইটের ব্যাপারটা?'

—'তারের ভিতর গলদ থাকলে অমন ব্যাপার মাঝে মাঝে হয়। আপনি পাখা চলে, আপনি আলো জ্বলে। মশাই, আজই আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি, আপনার কোনো ভাবনা নেই।'

দেখছি, বাড়িওয়ালার ওজরের অভাব নেই। শুকনো হাসি হেসে বললুম, 'না আমার আর কোনো ভাবনাই নেই। কারণ, আজকেই আমি অন্য বাড়ির খোঁজে বেরিয়ে পড়ব।'

ভৌতিক, না ভেলকি?

হ্যাঁ, আফ্রিকায় অনেক বিচিত্র ঘটনাই ঘটে।

তখন আমি ছিলুম কঙ্গো প্রদেশে। যেখানে গ্রিবিঙ্গুই ও চারি নদী পরস্পরের সঙ্গে মিলেছে, সেখানে পেয়েছিলুম একখানা খালি বাড়ি। সাধারণ বাড়ি, তার উপরে ঘাসে-ছাওয়া চাল এবং তার চারিদিক বেষ্টন করে বারান্দা।

প্রথম দিনে আমার মালপত্তর বারান্দাতেই তোলা হল। পাহারা দেবার জন্যে রাত্রে সেখানে রইল দুজন বেয়ারা।

রাত ন-টা বাজতেই নৈশভোজনের পর শয্যায় গিয়ে আশ্রয় নিলুম এবং ঘুমিয়ে পড়তে বিলম্ব হল না। কিন্তু খানিক পরেই ঘুম গেল ভেঙে এবং শুনতে পেলুম, বাইরে থেকে বন্ধ দরজার উপরে আঁচড়াআঁচড়ির শব্দ হচ্ছে।

চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, 'কে?'

কারুর সাড়া নেই, কিন্তু শব্দটা গেল থেমে। ভাবলুম, কোনো জন্তুজানোয়ার হবে। আর মাথা না ঘামিয়ে আবার ঘুমোবার চেষ্টা করলুম।

কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই আবার সেই আঁচড়াআঁচড়ির শব্দ।

আবার শুধালুম 'কে?' কিন্তু কোনো সাড়া না পেয়ে, উঠে আলো জ্বেলে ঘরের দরজা খুললুম।

কেউ কোথাও নেই। বারান্দায় শুয়ে ঘুমিয়ে আছে কেবল আমার দুজন বেয়ারা। কিছুই বুঝতে না পেরে দরজা বন্ধ করে আলো না নিবিয়েই আবার বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লুম।

কিন্তু মিনিট কয় যেতে না যেতেই ফের শুরু হল সেই আঁচড়াআঁচড়ি। এবারে ভারী রাগ হল। লাফ মেরে বিছানা ছেড়ে গালাগালি দিতে দিতে খুলে ফেললুম ঘরের দরজা। সব ফাঁকা, রাত করছে খাঁ খাঁ। চারিদিকের বারান্দায় এক চক্কর ঘুরে এলুম দ্রুতপদে। বেয়ারারা তেমনি নিদ্রিত। নেই আর কোনো জনপ্রাণী।

এবারে রীতিমতো হতভম্বের মতো ঘরের ভিতরে ফিরে এলুম। কেউ নেই, শব্দ করে কে? শুয়ে শুয়ে এই কথা ভাবছি, তারপরেই আবার কে দরজা আঁচড়াতে লাগল!

এবার বিছানা না ছেড়েই জ্বালাতন হয়ে চিৎকার করে বললুম, 'দূর হ, দূর হ! নইলে বন্দুকের গুলিতে তোর মাথার খুলি উড়িয়ে দেব!'

শাসানির ফল ফলল। একটা কণ্ঠস্বরে শুনলুম, 'ও মি. স্মিথ! আপনি কি আমাকে ভুলে গিয়েছেন? মনে নেই ঔবাংঘিতে আমি আপনাকে যেসব দৃশ্য দেখিয়েছিলুম?'

সিয়েরা লিয়নের একজন কালা আদমির সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল, মনে হল তারই কণ্ঠস্বর। স্থানীয় লোকদের বিশ্বাস, সে হচ্ছে 'জুজু'-মানুষ, অলৌকিক জাদু জানে।

আমি বললুম, 'হ্যাঁ, মনে পড়েছে। কিন্তু কোথায় তুমি? বাইরে গিয়েও আমি তো কারুকে দেখতে পাইনি?'

উত্তর হল, 'হতে পারে, কিন্তু আমি এইখানেই আছি। আচ্ছা, একটু সবুর করুন, আমি আপনাকে আরও কিছু দেখাব!'

বিছানা থেকে নেমে চেয়ারের উপর বসে আমি আরও কিছু দেখবার অপেক্ষায় রইলুম।

এখানে এ ঘরের ভিতর থেকে আর-একটা ঘরে যাওয়া যায়, মাঝে আছে একটা দরজা।

সেই দিকে তাকিয়ে দেখি—কী আশ্চর্য, দরজার মাথার উপরে রয়েছে একটা কালা আদমির মুখ!

অবাক হয়ে ভাবছি, কেমন করে ওই অসম্ভব জায়গায় তার আবির্ভাব হল—হঠাৎ সে জিব বার করে আমাকে ভেংচি কাটলে।

না, এতটা বাড়াবাড়ি সহ্য করা অসম্ভব—আমি তেরিয়া হয়ে তার দিকে ছুটে গেলুম, সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হয়ে গেল মুখখানা!

সেই দরজা খুলে ফেলে তার পিছনে দৃষ্টিনিক্ষেপ করেও কারুর টিকি পর্যন্ত আবিষ্কার করতে পারলুম না। আবার দরজা বন্ধ করে চেয়ারের উপরে এসে বসে পড়লুম দস্তুরমতো ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়ার মতো। কে হেসে উঠল আচম্বিতে! চোখ তুলে দেখি, দরজার টঙে আবার সেই কালা মুখ—আবার সে আমাকে ভেংচি কাটছে!

এবারে আমি আর চেয়ার ছেড়ে উঠলুম না, নাচারের মতো বসে রইলুম চুপচাপ। একটু পরেই মুখখানা মিলিয়ে গেল।

কে বললে, 'মেঝের দিকে তাকিয়ে দ্যাখো।'

তাকিয়ে দেখলুম। মস্ত একটা সাপ সড়সড় করে আমার চেয়ারের দিকেই এগিয়ে আসছে!

এতক্ষণে বেশ বুঝলুম, এ সব হচ্ছে আমার চোখের ভ্রান্তি। তবু সাপটা যখন চেয়ারের কাছে এসে পড়ল, আমি তাড়াতাড়ি পা দুটো উপরে তুলে না নিয়ে থাকতে পারলুম না।

পরদিন দুপুরে ডিস্ট্রিক্ট কমিশনার এবং শাসনকর্তার ওখানে ছিল আমার ভোজনের নিমন্ত্রণ। তাঁদের কাছে প্রকাশ করলুম গত রাত্রের কথা।

আমিও যা ভেবেছিলুম, তাঁরাও তাই বললেন। কেউ আমাকে নিয়ে মজা করছে।

তাঁরা আমার সঙ্গে এলেন আমার বাসাটা খানাতল্লাশ করবার জন্যে। কিন্তু সারা বাড়ি তন্নতন্ন করে খুঁজেও কোথাও সন্দেহজনক কিছুই পাওয়া গেল না।

শেষে স্থির হল, আজ রাত্রে পাহারাওয়ালারা এই বাড়িখানার চারিদিক ঘিরে মোতায়েন থাকবে। এখান থেকে বিশ গজ দূরে আছে আর-একখানা বাড়ি, সেখানে হাজির থাকবেন দুই জন শ্বেতাঙ্গ রাজকর্মচারী। আজও রাত্রে আবার যদি সেইরকম শব্দ হয়, আমি যেন খুব চিৎকার করে বলি—'কে ওখানে?' তৎক্ষণাৎ শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীরা বেগে ছুটে আসবেন এবং বাড়ির চতুঃসীমার মধ্যে কারুকে দেখতে পেলেই পাহারাওয়ালারা বন্দুক থেকে করবে অগ্নিবর্ষণ।

আবার রাত এল। যথাসময়ে আমিও শয্যাগ্রহণ করলুম। কেটে গেল মিনিট পনেরো। তারপরেই শুরু হল দরজার উপরে সেই আঁচড়াআঁচড়ি।

চিৎকার করে উঠলুম আমি উচ্চকণ্ঠে। দ্রুতপদে ছুটে এলেন শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীরা, হাতে তাঁদের রিভলভার। পাহারাওয়ালারা চারিদিকে ছুটোছুটি করতে লাগল, কিন্তু কাকে ধরবে? কোথাও নেই জনমানব!

তারপরেও এক সপ্তাহকাল আমি সেই বাসায় বাস করেছিলুম। রোজ রাত্রেই ঘটত অমনি সব অলৌকিক ঘটনা।

কিন্তু আমি সে সব আর আমলে আনতুম না। আহারের পর বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ে বলতুম, 'আর নয়, এইবারে বিদায় হও। আমি এখন ঘুমুতে চাই।' সঙ্গে সঙ্গে আর কিছু শুনতে বা দেখতে পেতুম না।

আর-একটা উল্লেখযোগ্য কথা। আমি আসবার আগে ওখানে কোনো উৎপাত হয়নি। আমার পরেও বাড়িতে বাসা বেঁধে ছিলেন একজন শ্বেতাঙ্গ ডাক্তার। তখনো ঘটেনি কোনো আজব ঘটনা।

ভৌতিক চক্রান্ত

শিল্পী প্রমোদ রায়ের নাম অনেকেরই কাছে সুপরিচিত। আমি উদীয়মান চিত্রকর ও ভাস্কর প্রমোদ রায়ের কথা বলছি। ছবি আঁকায় এবং মূর্তি গড়ায় তার সমান খ্যাতি।

সে বাস করত নিমচাঁদ মল্লিক স্ট্রিটের একখানা ভাড়াবাড়িতে। স্ত্রী ছাড়া তার পরিবারে আর কোনো লোক নেই, বাড়িখানা ছোটো হলেও সে কোনো অসুবিধা বোধ করত না। নীচের তলায় ছিল তার কারুকক্ষ বা 'স্টুডিয়ো'।

তার দিনগুলি কেটে যাচ্ছিল দিব্য নির্ভাবনায়, কিন্তু হঠাৎ হল এক মুশকিল। বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো এক নোটিশ এসে হাজির, এ বাড়ি ছেড়ে তাকে উঠে যেতে হবে।

কলকাতায় তখন ভাড়াবাড়ির একান্ত অভাব, পাড়ায় পাড়ায় উদ্বাস্তুদের ভিড়। মোটা টাকা সেলামি এবং ত্রিগুণ ও চতুর্গুণ ভাড়া দিতে চাইলেও খালি বাড়ি পাওয়া ভার হয়ে উঠেছিল। অধিকাংশ বাড়িওয়ালাই পুরাতন ভাড়াটিয়া উঠে গেলে খুশি হয়, নূতন ভাড়াটিয়া বসিয়ে বেশি লাভ করবার লোভে।

প্রমোদ বাড়িওয়ালার দাবি সহজে মানতে রাজি হল না। বাড়িওয়ালা নালিশ করলে। মামলা হল এবং মামলায় হেরে গেল প্রমোদই। বাড়ি ছাড়বার জন্যে সে সময় পেলে মাত্র এক মাস।

॥ দুই ॥

ইতিমধ্যে ঘটতে লাগল অদ্ভুত সব কাণ্ড!

প্রমোদদের ঠিক পাশের বাড়িতে থাকত নরহরি দাস, মফস্‌সলের লোক, কলকাতায় বাস করত ব্যাবসাসূত্রে। মাঝখানের একটা পাঁচিল টপকালেই তাদের বাড়ির ছাদ থেকে অনায়াসে প্রমোদদের বাড়ির ছাদের উপরে এসে পড়া যেত।

নরহরির চেহারাখানি ছিল আদর্শ গদিওয়ালার মতো—মোটাসোটা, বেঁটেসেটে, কালোকোলো দেহ; চাঁদের মতো গোলাকার মুখমণ্ডল; সাজগোজও তথৈবচ। সে পরমবৈষ্ণব, মাথায় চৈতনচুটকি, কপালে ও নাসিকায় তিলকমাটির চিহ্ন এবং কণ্ঠদেশে তিন সার তুলসীর মালা।

অথচ তার অত্যন্ত দহরম-মহরম ছিল মহাশাক্ত ভৈরব ভটচাজের সঙ্গে। ভৈরবের চেহারা ছিল লম্বায় চওড়ায় দশাসই, হাস্য ছিল অট্টাহাস্যের মতো এবং বাক্য ছিল হুংকারের মতো। তান্ত্রিক ক্রিয়া ছিল তার পেশা এবং মদ্য আর মাংসই ছিল তার প্রধান পানীয় ও খাদ্য।

কিন্তু চেহারায় ও চরিত্রে আকাশ-পাতাল তফাত থাকলেও ভৈরব ও নরহরি দুজনেরই নেশা ছিল এক এবং সেটা হচ্ছে দাবাখেলা।

রোজ সন্ধ্যাবেলায় নরহরি তাম্বুল চর্বণ করতে করতে এবং ভৈরব তামাকু টানতে টানতে দাবাবোড়ের ছকের সামনে বসে খেলায় বিভোর হয়ে থাকত। সে সময়ে তাদের দেখলে লোকে বলাবলি করত, 'এও যখন সম্ভবপর, তখন বাঘে আর গোরুতে মিলনই বা অসম্ভব হবে কেন?'

কিন্তু এমন মিলনেও তাগড়া পড়ল। আচম্বিতে মেনিনজাইটিস রোগে নরহরি হল গতাসু এবং সে বাড়ি ছেড়ে দিয়ে দেশে চলে গেল তার পরিবারবর্গ। ভেঙে গেল সেখানকার দাবাবোড়ের সান্ধ্যআসর।

॥ তিন ॥

নরহরির মহাপ্রস্থানে ভৈরব ভটচাজ দুঃখ পেলে বটে, কিন্তু পরম আনন্দ লাভ করলে তার বাড়িওয়ালা ক্ষেত্র বা ক্ষেতু মল্লিক।

নরহরি ভাড়া দিত মাসিক পঞ্চাশ টাকা। ক্ষেতু মল্লিক এখন জো পেয়ে দাবি করে বসল এককালীন এক হাজার টাকা সেলামি এবং মাসিক দেড়শো টাকা ভাড়া। দিনকাল যা পড়েছে, তার দাবি নিশ্চয়ই অপূর্ণ থাকত না। এমনকি, হবু ভাড়াটিয়ারা আনাগোনাও শুরু করে দিলে।

কিন্তু সহসা সংঘটিত হল এক রোমাঞ্চকর ও অভূতপূর্ব ঘটনা।

এক পূর্ণিমার রাত্রে পথ দিয়ে চলতে চলতে নরহরিদের পরিত্যক্ত, তালাবন্ধ, খালি বাড়ির বারান্দার দিকে তাকিয়ে বদন চাটুজ্জে দেখলে এক বিসদৃশ দৃশ্য!

বারান্দার একপাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে মুখ ছাড়া সর্বাঙ্গ সাদা কাপড়ে ঢেকে এক সন্দেহজনক মূর্তি!

বদন চেঁচিয়ে বললে, 'কে? কে ওখানে দাঁড়িয়ে?'

কোনো সাড়া নেই।

বদনের সঙ্গে ছিল টর্চ, সে টপ করে টর্চের চাবি টিপে আলো জ্বেলে যা দেখলে, তা সম্ভবপরও নয়, যুক্তিসঙ্গতও নয়।

সে মূর্তি হচ্ছে নরহরি দাসের!

তার পেটের পিলে চমকে গেলেও, নিজের চোখের ভ্রম ভেবে বদন চাটুজ্জে আরও ভালো করে দেখবার চেষ্টা করলে। উঁহু, মোটেই চোখের ভ্রম নয়, ও মুখ অবিকল নরহরি দাসের! ভয়ে সাদা হয়ে গেল বদনের বদন, ঠক ঠক করে কাঁপতে কাঁপতে 'আঁ' বলে পাড়াকাঁপানো চিৎকার করে সে ঘণ্টায় বিশ মাইল বেগে দৌড় মারলে নিজের বাড়ির দিকে।

॥ চার ॥

বলা বাহুল্য, খবরটা পাড়ার ঘরে ঘরে রটে যেতে দেরি লাগল না।

ক্ষেতু মল্লিক তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে বললে, 'বদনাব্যাটা ভাংচি দিতে চায়! নরহরি ছিলেন পরমবৈষ্ণব মানুষ, তিনি এখন গোলকধামে বসে মনের সুখে বিশ্রাম করছেন, কোন দুঃখে আবার এই ছাই পৃথিবীতে ফিরে আসবেন?'

কিন্তু নরহরি যে এখনও সশরীরে বিরাজ করছে তার ওই ভাড়াবাড়িতেই, পাড়ার আরও কেউ কেউ তার অকাট্য চাক্ষুষ প্রমাণ পেলে। তবে দিনের বেলায় তাকে দেখা যায় না এবং দিনের বেলায় তাকে দেখবার আশাও কেউ করে না।

ফলে দাঁড়াল এই : প্রথমত, নরহরির বাড়ির সুমুখ দিয়ে লোকে রাত্রে পথ-চলাই ছেড়ে দিলে। দ্বিতীয়ত, হবু-ভাড়াটিয়ারা ক্ষেতু মল্লিককে একেবারেই বয়কট করলে। বিনা ভাড়াতেও নরহরির বাড়িতে বাস করবার মতো লোকও আর পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না।

অবস্থা যখন এই রকম, ঠিক সেই সময়ে তান্ত্রিক ভটচাজ এসে বাসনাপ্রকাশ করলে, 'ক্ষেতুবাবু, নরহরিদের বাড়িখানা আমি ভাড়া নিতে চাই!'

নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে না পেরে ক্ষেতু মল্লিক বললে, 'তাই নাকি?'

—'হ্যাঁ ক্ষেতুবাবু! আমি হচ্ছি তন্ত্রসিদ্ধ মানুষ, বৈষ্ণবের প্রেতাত্মা আমাকে দেখলেই ভয়ে পিঠটান দেবার পথ পাবে না!'

ক্ষেতু মল্লিক তাড়াতাড়ি বললেন, 'ঠিক বলেছ ভটচাজ! তোমার সঙ্গে আমিও একমত।'

—'কিন্তু আমি হচ্ছি গরিব মানুষ, মাসে ত্রিশ টাকার বেশি ভাড়া দেবার শক্তি আমার নেই।'

—'বেশ, তাই সই।'

॥ পাঁচ ॥

নরহরির বাড়িতে এসে জাঁকিয়ে বসল ভৈরব ভটচাজ। সত্য সত্যই মনে মনে তার দৃঢ়বিশ্বাস ছিল, বৈষ্ণবের প্রেতাত্মা কিছুতেই শাক্তের নিকটবর্তী হওয়ার সাহস প্রকাশ করতে পারবে না।

এবং যখন প্রথম দুই রাত্রির মধ্যে নরহরির চৈতনচুটকি পর্যন্ত দেখা গেল না, ভৈরব তখন পাড়ার বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে তন্ত্রের অপূর্ব মহিমা সম্বন্ধে জোরগলায় বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতে লাগল।

তারপরই এল অমাবস্যার রাত্রি।

দোতলার একটি ঘরে পূজার উপকরণ নিয়ে আসনাসীন হল ভৈরব ভটচাজ।

নরহরির ভয়ে পথ নির্জন, কোথাও টুঁ শব্দটি পর্যন্ত শোনা যায় না। বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত, ঘরের ভিতরে জ্বলছে একটা হারিকেন লণ্ঠনের টিমটিমে আলো।

ভৈরব একমনে দুই চক্ষু বুঁজে মন্ত্র জপ করছিল।

আচমকা একটা বিকৃত, অনুনাসিক কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'ভৈঁরঁব, এঁকচাঁল দাঁবাঁ খেঁলবেঁ ভাঁয়াঁ?'

ভয়ংকর চমকে গিয়ে ভৈরব চোখ খুলেই দেখে, ঘরের দরজার কাছে পা থেকে গলা পর্যন্ত ধবধবে সাদা কাপড় মুড়ি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে স্বয়ং নরহরি ছাড়া আর কেউ নয়! ভৈরবই সব চেয়ে বেশি চিনত নরহরিকে, তার চোখের ভ্রম হবার জো নেই।

তারপর আর কিছু নয়, বিকট এক আর্তনাদ এবং ভৈরবের ভূমিতলে পতন ও মূর্ছা!

॥ ছয় ॥

ক্ষেতু মল্লিক হতাশ ভাবে স্থির করলে, ওই ভুতুড়ে বাড়িখানা ভেঙে ফেলে একেবারে নতুন বাড়ি তৈরি করবে।

কিন্তু হঠাৎ যখন শিল্পী প্রমোদ রায় এসে নরহরির বাড়িখানা ভাড়া নিতে চাইলে, তখন ক্ষেতু মল্লিকের চেয়ে বিস্মিত লোক পৃথিবীতে আর কেউ ছিল না বোধ হয়।

প্রমোদ বললে, 'কলকাতায় খালিবাড়ি দুর্লভ, অথচ বাড়িওয়ালার হুকুমে আর এক হপ্তার মধ্যেই আমাকে উঠে যেতে হবে। সুতরাং আমার অবস্থা বুঝতেই পারছেন তো?'

ক্ষেতু মল্লিক বললে, 'বেশ বাবা, আমি বেশি ভাড়াও চাই না, তুমি মাসে পঁচিশটি করে টাকা দিয়ো।'

—'তাহলে এই পঁচিশ টাকা অগ্রিম নিয়ে তিন বছরের কড়ারে আমাকে চুক্তিপত্র লিখে দিন।'

—'আচ্ছা।'

॥ সাত ॥

পাশের বাড়িতে উঠে যাবার জন্যে প্রমোদ নিজের 'স্টুডিয়ো'র ছবি ও প্রতিমূর্তিগুলোকে স্থানান্তরিত করবার ব্যবস্থা করছে, এমন সময়ে তার স্ত্রী নমিতা এসে ভয়ে ভয়ে বললে, 'ওগো, নরহরিবাবুর বাড়িতে গিয়ে আমি থাকতে পারব না।'

—'কেন?'

—'কেন, তা কি তুমি জানো না?'

প্রমোদ হাসিমুখে নমিতার হাত ধরে ঘরের এককোণে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর একখানা সাদা চাদর একধারে সরিয়ে নিতেই দেখা গেল, একটা খড়ের কাঠামোর উপরে বসানো রয়েছে নরহরির রং-করা মাটি দিয়ে গড়া মুখমণ্ডল!

নমিতা হতভম্ব!

প্রমোদ বললে, 'আমি হচ্ছি ভাস্কর, নরহরির মুখ আমি অনায়াসেই গড়তে পেরেছি। পাঁচিল টপকে পাশের বাড়িতে যাওয়াও আমার পক্ষে কঠিন হয়নি; আমাকে সাহায্য করেছে আবছা রাত, মানুষের স্বাভাবিক ভয় আর কুসংস্কার!'

জঙ্গলের নাট্যাভিনয়

ভারতে সেই আমার শেষ ব্যাঘ্র-শিকারের চেষ্টা।

কিন্তু আমার হাতের বন্দুক হাতেই রইল, আমাকে হতে হল এক বন্য নাটকের নির্বাক ও নিশ্চল দর্শক। শিকার করতে পারলাম না বটে, কিন্তু সেদিনের আগ্নেয়-স্মৃতি চিরদিন জাগ্রত থাকবে আমার মানসপটে।

সে অঞ্চলে একটা মস্ত বাঘ এসে বড়োই উৎপাত শুরু করেছিল। গত রাত্রেই সে বধ করেছিল একটা পোষমানা গ্রাম্য মহিষকে। তারপর খানিকটা খেয়ে মৃতদেহের বাকি অংশটা লুকিয়ে রেখে গিয়েছিল জঙ্গলের ভিতরে।

আজ সে নিশ্চয়ই বাকি দেহটার লোভে ঘটনাস্থলে পুনরাগমন করবে, এই আশায় আমি প্রস্তুত হয়ে বসে আছি মাচান বেঁধে এক গাছের উপরে।

বনের ভিতরে নেমে আসছে ছায়াময়ী সন্ধ্যা। দিনের জীবরা বোবা হয়ে ঘুমুতে গিয়েছে যে যার বাসায়। হানা দিতে বেরিয়েছে কেবল নিশাচর হত্যাকারীর দল, এবং জেগে আছে কেবল রাতের কীটপতঙ্গরা, তাদের অশ্রান্ত কণ্ঠস্বরে সারা বনভূমি হয়ে উঠেছে বিচিত্র শব্দময়।

বন্যজগতে সন্ধি নেই, শান্তি নেই, আছে কেবল যুদ্ধ আর হানাহানি। জীবন শেষ না হওয়া পর্যন্ত সে যুদ্ধের ক্ষান্তি নেই। সবচেয়ে বেশি যার যোগ্যতা ও চাতুর্য, সবচেয়ে বেশি দিন ধরে সেই-ই আত্মরক্ষা করতে পারে মৃত্যুর কবল থেকে।

আমি একলা। আমার সামনে রয়েছে খানিকটা খোলা জমি ও জলাভূমি। তারপরেই দেখা যায় নিবিড় জঙ্গলের দুর্ভেদ্য প্রাচীর। জলার বাতাস, ঠান্ডা ও মিষ্টি, তপনতাপিত মনকে মাতিয়ে তোলে। প্রকৃতির এই শয্যাগৃহের চিত্র দেখে চমৎকৃত হয় না, বোধ করি এমন মানুষ কেউ নেই।

আচমকা আমি সতর্ক হয়ে উঠলুম। ঝোপঝাড়ের মধ্যে শোনা যাচ্ছে কার পায়ের শব্দ! নলখাগড়ার বন দুলে উঠে দুমড়ে পড়ল এবং পরমুহূর্তেই দেখলুম একটু বিপুলবপু বন্যমহিষ সামনের খোলা জমির উপরে এসে দাঁড়াল! মাদি মহিষ, তার মাথার উপরে রয়েছে এমন প্রকাণ্ড দুটো শৃঙ্গ, যার জোড়া খুঁজে পাওয়া ভার। তার সর্বাঙ্গ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে যেন প্রচণ্ড শক্তির তরঙ্গ!

লোভনীয় শিকার! বন্দুক ছোড়বার জন্যে মনটা উসখুস করে উঠল। কিন্তু আমি এখানে এসেছি বাঘ মারতে, অতএব বন্দুক ছোড়বার লোভ সংবরণ করতে বাধ্য হলুম। আজ খুশি হয়ে মনে করি, ভাগ্যে সেদিন বন্দুক ছুড়িনি।

তারপর মস্তবড়ো সেই বুনোমোষটা চারিদিকের আঘ্রাণ নিতে লাগল সন্দিগ্ধ ভাবে। একবার আকাশের দিকে মুখ তুলে চিৎকার করে উঠল উচ্চকণ্ঠে। এমন বিষম সে চিৎকার, সারা বন যেন কাঁপতে লাগল।

দূরে—বহু দূরে বনের ভিতরে জেগে উঠল আর-একটা মহিষের কণ্ঠধ্বনি, নিশ্চয়ই তার জোড়া। সে তখন সানন্দে মদ্দা মহিষটার ডাকে সাড়া দিলে এবং শিং নামিয়ে মাটি খুঁড়তে লাগল।

তারপর সে এদিকে-ওদিকে ঘুরতে ঘুরতে ব্যাঘ্রের কবলে নিহত গ্রাম্যমহিষটার

ভুক্তাবশিষ্ট দেহের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। একমনে মিনিট দুই লাশটা শুঁকে দেখলে, তারপর আবার মাথা তুলে ক্রুদ্ধকণ্ঠে গর্জন করে কাঁপিয়ে তুললে চারিদিক! সে গর্জন যেন বলতে চায়—যুদ্ধং দেহি যুদ্ধং দেহি!

আচম্বিতে তার দেহে জাগল কেমন যেন অস্বাচ্ছন্দ্যের ভাব। চট করে সে ফিরে দাঁড়াল এবং মাথা নিচু করে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে জঙ্গলের একপ্রান্তে। সঙ্গে সঙ্গে আমারও চোখ গেল সেইদিকে এবং সে যা দেখেছে আমিও তা দেখতে পেলুম।

ঘাসজমির উপর দিয়ে গুঁড়ি মেরে চুপি চুপি এগিয়ে আসছে মস্ত একটা বাঘ! তারপরেই মহিষটাকে দেখতে পেয়ে থমকে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, ছটফট করতে লাগল কেবল তার লাঙ্গুলটা!

চিরশত্রু বাঘতে সামনে দেখে মহিষ পদাঘাতে চারিদিকে ছড়িয়ে দিলে মাটির গুঁড়ো।

দুই প্রতিযোগীই সমান সতর্ক এবং পরস্পরের আক্রমণ প্রতিরোধ করবার জন্যে অত্যন্ত প্রস্তুত। উভয়েরই হিংস্র চক্ষে মারাত্মক ঘৃণার দৃষ্টি।

বাঘটাকে মারতে পারতুম, কিন্তু আমি মারব না। আমি আজ কেবল দেখতে চাই, গহন বনের এই বিস্ময়কর নাট্যাভিনয়ের কোনখানে পড়বে শেষ যবনিকা!

ধীরে ধীরে ডোরাকাটা কেঁদোবাঘটা তার নমনীয় দেহ নিয়ে তেমনি গুঁড়ি মেরেই এগিয়ে আসতে লাগল। তার স্থির জ্বলন্ত দৃষ্টি মহিষের দিকেই নিবদ্ধ এবং বারংবার মাটির উপরে ছিপটির মতো আছড়ে পড়তে লাগল তার ক্রুদ্ধ লাঙ্গুলটা। তার প্রচণ্ড চোয়াল বেয়ে ঝরে পড়ছে লালার ধারা।

মহিষ কিন্তু এগুলও না, পিছুলও না—কেবল নিজের মুখ রাখলে বাঘের মুখের দিকে। বিপজ্জনক তার ভাবভঙ্গি।

মহিষের চারিদিকে বাঘটা ঘুরতে লাগল চক্রের পর চক্র দিয়ে। ...ক্রমে ক্ষুদ্রতর হয়ে এল চক্রের আয়তন। বাঘের ইচ্ছা, পিছন থেকে লাফ মেরে মহিষের পিঠের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে; মহিষ কিন্তু তারও চেয়ে তৎপর, তাকে দিলে না সে সুযোগ। চমৎকার তার পাঁয়তারা, জঙ্গলের কোনো প্যাঁচই তার অজানা নেই।

আচম্বিতে বাঘটা দাঁড়িয়ে পড়ে ল্যাজ আছড়াতে আছড়াতে বলের মতো গোল করে ফেললে নিজের দেহকে, মুখে সে কোনো শব্দই করলে না, কিন্তু তার

দেহটা বাতাস কেটে এগিয়ে এল রকেটের মতো। ঠিক সেই মুহূর্তেই ভীষণ চিৎকার ও দুই শৃঙ্গ উদ্যত করে মহিষও করলে প্রতি-আক্রমণ, শূন্য পথেই হল দুজনের সঙ্গে দুজনের ঠোকাঠুকি এবং একসঙ্গে দুজনেই হল পপাতধরণীতলে। কিন্তু চোখের পলক পড়বার আগেই দুজনেই আবার পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল, তারপর একসঙ্গে চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে আবার করলে পরস্পরকে আক্রমণ।

এবারে ফাঁক পেয়ে বাঘটা লাফ মেরে মহিষের পিঠের পিছন দিকে গিয়ে পড়ল। কিন্তু কামড় খাবার আগেই বাঘকে পিঠের উপরে নিয়েই মহিষ শূন্যে লম্ফত্যাগ করে চিত হয়ে উলটে পড়ল ভূমিতলে। তার এই সুন্দর কৌশলটি ফলপ্রদ হল তৎক্ষণাৎ।

পাছে মহিষের গুরুভার দেহের তলায় হাড়গোড় ভেঙে থেঁতলে মরতে হয়, সেই ভয়ে বাঘ তাড়াতাড়ি তাকে ছেড়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল, এবং আবার লাফ মেরে শত্রুর ডান স্কন্ধ কামড়ে ধরলে। মহিষ এক ঝটকান মেরে বাঘটাকে আবার মাটির উপরে গেড়ে ফেললে ক্রুদ্ধ গর্জন করতে করতে। তারপর শিং দিয়ে শত্রুকে উলটে ফেলে প্রকাণ্ড একটা পাকুড়গাছের মোটা গুঁড়ির উপর চেপে ধরলে প্রাণপণে।

মহিষের গর্জনমুখর মুখ থেকে তখন হু হু করে রক্ত ঝরে পড়ছে এবং তার ক্ষতবিক্ষত কণ্ঠ, স্কন্ধ ও পৃষ্ঠদেশ থেকেও রক্তধারা ঝরছে দরদর ধারে। সে কয় পা পিছিয়ে এসেই আবার সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ল শত্রুকে একেবারে সাবাড় করে ফেলবার জন্যে।

কিন্তু বাঘটা অত্যন্ত আহত হলেও তার লড়বার শক্তি তখনও ফুরিয়ে যায়নি। সে-ও যে-সে যোদ্ধা নয়। আবার সে করলে লম্ফত্যাগ, এবং এবারে অবতীর্ণ হল মহিষের দুই শৃঙ্গের ঠিক মাঝখানে। তার ডোরাকাটা রঙিন দেহের উপরার্ধ ভাগ এমন ভাবে ঝুলে পড়ল যে, সম্পূর্ণরূপে ঢেকে গেল মহিষের মুখমণ্ডল। তার দাঁত ও নখ গভীর ভাবে বসে গেল মহিষের মাংসের ভিতরে এবং তার দুই কষ থেকেও শত্রুর গা বেয়ে বেরুতে লাগল টকটকে রক্তস্রোত।

মহাযন্ত্রণায় মহিষ চেঁচিয়ে উঠল উচ্চৈঃস্বরে। একটা গাছের গুঁড়ির দিকে দৌড়ে গেল প্রবল বেগে—তার পিঠের বোঝা তখনও তার মুখের উপরে হুমড়ি খেয়ে আছে। তারপরেই কানে এল একটা ঢপাৎ করে শব্দ! শত্রুকে পিঠের উপর থেকে ঝেড়ে ফেলে মহিষ একবার বসে পড়েই টপ করে দাঁড়িয়ে উঠল।

ব্যাঘ্রের কণ্ঠ ভেদ করে নির্গত হল ক্ষীণ একটা গর্জন। বুঝলুম তার অবস্থা রীতিমতো কাহিল। একেবারে অবশ হয়ে সে ভেঙে পড়ে হাঁপাতে লাগল।

মহিষ কিন্তু শত্রুর শেষ রাখতে রাজি নয়। সে একটু পিছিয়ে এসে ভালো করে নিজের লক্ষ্য স্থির করলে। তারপর বেগে ছুটে গিয়ে নিষ্ঠুর ও তীক্ষ্ণাগ্র শৃঙ্গ দিয়ে বাঘকে গুঁতোতে লাগল বারংবার। বাঘ আত্মরক্ষা করবার জন্যে ঝোপের আড়ালে সরে যাবার চেষ্টা করতে লাগল, কিন্তু সে সুযোগ পেলে না।

এ মানুষে মানুষে প্রতিযোগিতা নয়। কারণ, সেক্ষেত্রে মধ্যস্থ এতক্ষণে প্রতিযোগিতা বন্ধ করে দিতেন, কেননা বাঘটা যে নিশ্চিত রূপেই হেরে গিয়েছে, সে বিষয়ে আর কোনো সন্দেহই নেই। কিন্তু জঙ্গলে মধ্যস্থ কোথায়? লড়াই থামাবে কে? এখানকার আইন-কানুনে নেই দয়ামায়ার ঠাঁই। এখানে লড়াই থামতে পারে কেবল একপক্ষেরই মৃত্যুর পর।

বিজয়ী বীরের মতো মহিষ পূর্ণকণ্ঠে এমন গর্জন করে উঠল যে, আমার মাচান পর্যন্ত থর থর করতে লাগল। এইবারে করলে সে শেষ আক্রমণ। ব্যাঘ্রের ক্ষতবিক্ষত, হাড়গোড়ভাঙা দেহটা সে শিঙে করে আবার শূন্যে তুলে নিলে, তারপর মাথার এক ঝাঁকুনি মেরে দেহটাকে খানিক তফাতে ছুড়ে ফেলে দিলে একটুকরো খড়ের মতো অনায়াসেই। মহিষ এগিয়ে শত্রুর দেহটা আর পরীক্ষা পর্যন্ত করলে না। তার যে মৃত্যু হয়েছে, এ বিষয়ে সে নিশ্চিত।

মনে হল, ধন্য ধন্য বলে চেঁচিয়ে উঠে বিজেতাকে অভিনন্দন দিই। বলা বাহুল্য, শিকার আমাকে বঞ্চিত করলেও আমার সহানুভূতি ছিল মহিষের দিকেই। আজ যে অভাবিত দৃশ্য দেখবার সুযোগ পেলুম, তার কাছে তুচ্ছ যে-কোনো শিকার। মানুষের জীবনে এমন সুযোগ দুর্লভ।

চারিদিকে ঘন হয়ে আসছে রাত্রের কালো ছাউনি। শিশু-চাঁদ উঠছে বনের মাথায়। নীলাকাশে তারারা করছে টিপ টিপ টিপ।

মহিষের কণ্ঠে ফুটল আবার বিজয়গর্জন। এবারে ঘন বনের কাছ থেকেই শোনা গেল মদ্দা মহিষের গলা। তখনই হুড়মুড় করে সশব্দে জঙ্গল ভেঙে মাদি মহিষটা ছুটে গেল তার সাথির সন্ধানে। জঙ্গলের নাট্যলীলার উপরে পড়ল যবনিকা।

বাঘের দেহটা সেইখানেই ফেলে চলে এলুম। ও দেহ আমার নয়।*

---

*মেজর আর ফোরান পৃথিবীর দেশে দেশে শিকার করে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেছেন। তাঁর লিখিত শিকারকাহিনিও যথেষ্ট বিখ্যাত। উপরের কাহিনিটির বক্তা হচ্ছেন তিনি নিজেই।

বংশীবদনের বহির্গমন

যাকে বলে দশাসই পুরুষ।

মাথায় লম্বা সাড়ে ছয় ফুট, ছাতির মাপ পঞ্চাশ ইঞ্চি, পেশিগুলো যেন লোহার মতো শক্ত।

সবাই বললে, হ্যাঁ, একখানা চেহারা বটে!

মুখশ্রী ভালো নয় এবং গায়ের রংটাও এমন মিশমিশে কালো যে তার সঙ্গে কষ্টিপাথরে গড়া মূর্তির তুলনা করলে অত্যুক্তি করা হবে না।

তবু সুপুরুষ না হলেও এমন পুরুষোচিত সুগঠন নজরে পড়ে কদাচিৎ। বয়স হবে বিশ কি একুশ। নাম বংশীবদন। নামকরণটা হয়েছিল বোধ করি রঙের জন্যই, কারণ বংশীবদন বলে কেষ্টঠাকুরকেই।

আমাদের পাড়ায় এসে বাসা ভাড়া নিয়েই সে দস্তুরমতো আসর জমিয়ে তুলতে দেরি করলে না।

শোনা গেল, বংশীবদন বংশীবাদন ভালোবাসে না, রোজ মুগুর ভাঁজে, ডন-বৈঠক দেয়, কুস্তি লড়ে। পাড়ায় এসেই বশ করে ফেললে সেই সব অখদ্যে ও অভব্য ছোঁড়াকে, রাস্তার রোয়াকে দিন-রাত আড্ডা না দিলে যাদের পেটের ভাত হজম হয় না। তার মুখশাবাশি শুনে ও ধরনধারণ দেখে ডানপিটেরাও তাকে সমীহ করে চলতে লাগল।

এ নিয়ে কেউ মাথা ঘামালে না, কারণ কোন পাড়াতেই বা এমনি লক্ষ্মীছাড়া ছোঁড়ার দল ও তাদের পালের গোদা নেই? কিন্তু ক্রমেই শুরু হল হরেক রকম উৎপাত।

॥ দুই ॥

সবচেয়ে বিষম উপদ্রব হচ্ছে, চাঁদার উপদ্রব।

বংশীবদন মতপ্রকাশ করলে, বছরে আমরা তিন বার সর্বজনীন পূজা করব—দুর্গাপুজোর সময়, কালীপুজোর সময় আর সরস্বতীপুজোর সময়। দুর্গাপুজোর

আর মাসদেড়েক বাকি। সবাই বাড়ি বাড়ি ঘুরে চাঁদা আদায়ে লেগে যাও। গরিবরা যে যা পারে দেবে, কিন্তু বড়োলোকদের কাছ থেকে পঁচিশ টাকার কম নিবি না।

পাড়ায় সম্পন্ন গৃহস্থ ছিল পঁচিশ ঘর। তাদের মধ্যে মাত্র একজন দিলে পঁচিশ টাকা। কেউ কেউ আট আনা, এক টাকা বা দুই টাকা পর্যন্ত দিতে চাইলে, কেউ কেউ কিছুই দিলে না।

যারা কম চাঁদা দিতে চাইলে বা কিছুই দিলে না, তাদের বাড়িতে আরম্ভ হল সব বিপরীত কাণ্ড। কোথাও বোমা পড়ে, কোথাও হয় ইষ্টক বা বিষ্ঠা বৃষ্টি।

থানায় খবর গেল। কিন্তু পুলিশ এসে কোনোই সুরাহা করতে পারলে না। পুলিশ বংশীবদন ও তার সাঙ্গোপাঙ্গকে সন্দেহ করলে বটে, কিন্তু তাদের গ্রেপ্তার করবার মতো প্রমাণ পেলে না।

বিষ্ঠা, ইষ্টক ও বোমার কবল থেকে নিস্তার পাবার জন্যে সবাই যেচে এসে চাঁদা দিয়ে গেল।

প্রফেসর সুরেন চৌধুরির বাড়ির বড়ো রোয়াকটাই বংশীবদন বেশি পছন্দ করত। সদলবলে সেইখানে বসেই সে বাক্য-বন্দুকে বধ করত রাজা-উজিরকে।

সুরেনবাবু প্রফেসর মানুষ, নীচের ঘরে বসে পড়াশোনা করতেন। আড্ডাধারীদের হুল্লোড়ে তিনি অতিশয় অতিষ্ঠ হয়ে একদিন বাইরে এসে বললেন, 'তোমরা এখনই আমার রক ছেড়ে চলে যাও।'

বংশীবদন উঠে দাঁড়িয়ে বুক ও হাতের গুলি ফুলিয়ে বললে, 'যদি না যাই?'

—'থানায় ফোন করব।'

—'মাইরি নাকি প্রফেসর? আচ্ছা, সেলাম!' সে দলবল নিয়ে প্রস্থান করলে।

চার দিন পরে এক সন্ধ্যাবেলায় সুরেনবাবু সদরদরজা থেকে বাড়ির ভিতরে পা বাড়িয়েই হলেন পপাতধরণীতলে; তাঁর মাথা গেল ফেটে।

দরজার সামনে ছড়ানো ছিল আট-দশটা কলার খোসা।

হপ্তাখানেক পরে দেখা গেল, সুরেনবাবুর পড়বার ঘরে এখানে-ওখানে কিলবিল করছে পনেরো ষোলোটা সাপের বাচ্ছা।

ব্যাপারটা আরও বেশি দূর গড়াবার আগেই সুরেনবাবু সে বাড়ি ছেড়ে উঠে গেলেন। বংশীবদন ছোঁড়ার পাল নিয়ে আবার হাসতে হাসতে এসে রোয়াক অধিকার করলে।

পাড়ার লোক ভয়ে বোবা।

॥ তিন ॥

নামে এবং দেহে ভোঁদা হলেও বুদ্ধি তার মোটা ছিল না।

ভোঁদাই ছিল এতদিন এ পাড়ার মায়ে খেদানো বাপে তাড়ানো ছোঁড়াগুলোর পালের গোদা। তার পসার মাটি হয়ে গিয়েছে শ্রীমান বংশীবদনের আবির্ভাবে। এখন আর কেউ তাকে মানে না। এজন্যে সর্বদাই সে মনমরা হয়ে থাকে। গলার জোরে এবং গায়ের জোরে বংশীবদনের কাছে সে নগণ্য।

সেদিন সকালে দালানে বসে ভোঁদা পাঁপর ভাজা খেতে খেতে চা পান করছে এবং দাসী বাটনা বাটতে বাটতে তার মায়ের সঙ্গে কথা কইছে। ঠিকে ঝি, আরও দু-বাড়িতে কাজ করে।

মা বলছিলেন, 'হ্যাঁ রে, ভালোর মা, তুই তো বংশীদেরও বাড়িতে কাজ করিস। অমন দজ্জাল ছেলেকে বাড়ির লোক শাসন করতে পারে না?'

ভালোর মা দুই চোখ কপালে তুলে বললে, 'কে দাদাবাবুকে শাসন করবে গো? সে একটা খুনে ডাকাত, সবাই তার ভয়ে কেঁচো হয়ে থাকে।'

মা বললেন, 'ওমা, এমন কথাও কখনো শুনিনি!'

ভালোর মা বললে, 'দাদাবাবু জব্দ কেবল রাতের বেলায়। অমন যে দত্যির মতো গতর, অন্ধকারে গেলেই কেঁপে সারা। সঙ্গে আর কেউ না শুলে ভয়ে ঘুমোতেই পারে না!'

মা সবিস্ময়ে শুধোন, 'কেন রে!'

—'ভূতের ভয় মা, ভূতের ভয়। রাতে কেউ ভূতের নাম করলেও দাদাবাবু আঁতকে ওঠে। যেন যত রাজ্যের ভূত-পেতনি তারই ঘাড় মটকাবার জন্যে ওঁত পেতে আছে।'

ঝি হাসতে লাগল, মা হাসতে লাগলেন, ভোঁদাও হেসে খুন!

॥ চার ॥

বংশীবদনদের বাসা বড়ো রাস্তার পাশে একটা গলির ভিতরে।

একদিন একটা কাবুলিওয়ালা সেই গলির ভিতরে ঢুকল, নিশ্চয় কারুর কাছে তার টাকা পাওনা ছিল।

কিন্তু কয়েক পা এগিয়েই সে বংশীবদনের বাড়ির সামনে টলে ধপাস করে পড়ে গেল। একেবারে আড়ষ্ট!

সবাই চারিদিক থেকে ছুটে এসে দেখলে, কাবুলির দেহে আর প্রাণ নেই। বোধ হয় তার হৃদরোগ ছিল। পুলিশ এসে লাশ তুলে নিয়ে গেল।

বংশীবদন মুখ ভার করে শুকনো গলায় বললে, 'কাবুলিটা কি নচ্ছার হে! দুনিয়ায় এত ঠাঁই থাকতে ব্যাটা কিনা পটল তুললে আমাদের বাসার সামনে এসেই!' তাকে তখন দেখাচ্ছিল খানিকটা গ্যাস বেরিয়ে যাওয়া বেলুনের মতো।

দিন তিন-চার পরেই পাড়ায় খবর রটে গেল, একজন কাবুলি সন্ধ্যা হলেই খট খট শব্দ তুলে গলির ভিতরে পায়চারি করে এবং দুই চোখে তার দুটো আগুন জ্বলে! নিশ্চয় সে খাবি খেয়েও দেনাদারকে ভোলেনি, নিজের পাওনা টাকা ছাড়তে নারাজ।

কাবুলিটাকে প্রথম কে দেখেছিল তা জানা গেল না বটে, কিন্তু দূর থেকে আরও কেউ কেউ তাকে দেখতে পেলে। প্রত্যেকেই বলে এক কথা—পায়ের জুতোয় খট খট শব্দ হয় এবং চোখে জ্বলে দুটো আগুন!

সন্ধ্যা নামলেই গলি একেবারে ফাঁকা—জনপ্রাণী বাড়ির বাইরে পা বাড়ায় না এবং সন্ধ্যা হবার আগেই বংশীবদনও সুড়সুড় করে বাড়ির ভিতরে ঢুকে সদর দরজা বন্ধ করে দেয়।

দলপতির অভাবে রোয়াকের আড্ডা মাটি হয় বুঝি।

॥ পাঁচ ॥

বংশীবদনদের বাড়িখানা একতলা। সদর দরজার পাশেই তার ঘর।

সন্ধ্যা হতে না হতেই সে গলির দিকের জানালাগুলোর খড়খড়ি বন্ধ করে দিলে। তার অবস্থা হয়েছে পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের মতো। এখন থেকে কাল সকাল পর্যন্ত তাকে ঘরের ভিতরেই বন্দি হয়ে থাকতে হবে।

উপায় কী? সময় কাটাবার জন্যে সে সাহিত্যচর্চা করতে বাধ্য হল—অর্থাৎ একখানা বই নিয়ে পড়তে বসল। গোয়েন্দাকাহিনি—নাম 'কন্ধকাটার হত্যাকাণ্ড'। দম বন্ধ করে পড়বার মতো বই।

কোথা দিয়ে কেটে যায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা। কাবুলি ভূতের কথাও ভুলে যেতে হয়।

আচম্বিতে শব্দ শোনা গেল—খট খট, খটাখট!

বংশীবদনের বুক ধড়াস করে ওঠে, সর্বাঙ্গে জাগে রোমাঞ্চ! বই ফেলে সে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। প্রাণপণে সাহস সঞ্চয় করে ভাবে, শব্দ বলতেই তো ভূত বোঝায় না, ব্যাপারটা কোনো ধাপ্পাবাজের চক্রান্ত নয়তো?

যা থাকে কপালে! চক্ষু-কর্ণের বিবাদভঞ্জন করবার জন্যে সে রুদ্ধশ্বাসে কম্পিত হস্তে খড়খড়ির একটা পাখি নিঃশব্দে একটুখানি খুলে গলির মধ্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে।

ওরে ব্রাদার! পরমুহূর্তে বিকট চিৎকারে পাড়া কাঁপিয়ে মাটির উপরে লম্বমান হল বংশীবদন।

বাড়ির লোকজন হাঁ হাঁ করে ছুটে এল। হল কী রে, হল কী?

—'কাবুলি ভূত! কাবুলি ভূত! চোখ দুটো দপ দপ করে জ্বলছে!'

॥ ছয় ॥

কাবুলি ভূতের বিপজ্জনক সান্নিধ্য পরিত্যাগ করে পরদিনেই বংশীবদনরা সে পাড়া ছেড়ে সরে পড়ল। ভূতটা আজ যেমন পথে পায়চারি করে, কাল যদি তার বাড়ির ভিতরে বেড়াবার শখ হয়, তখন তাকে ঠেকিয়ে রাখবে কে?

ভোঁদার মুখে হাসি ধরে না। আবার রোয়াকে গিয়ে সে দখল করলে দলপতির গদি।

কিন্তু সকলের মনে একটা সন্দেহ থেকে গেল। বংশীবদনদের পলায়নের সঙ্গে সঙ্গে কাবুলি ভূতটাও অদৃশ্য হল কেন?

এ গুপ্ত কথাটা ভোঁদা কেবল আমার কাছে প্রকাশ করেছে চুপিচুপি।

থিয়েটারের বেশকারের কাছে ধন্না দিয়ে সে কাবুলিওয়ালার ছদ্মবেশ সংগ্রহ করে এনেছিল। জ্বলন্ত চক্ষুর ভ্রান্তি সৃষ্টি করেছিল ফসফোরাস।

নামে এবং দেহে ভোঁদা হলেও বুদ্ধি তার মোটা ছিল না।

নাটক

অলৌকিক

নাটকের পোশাকে একটি অসম্ভব গল্প

॥ ১ ॥

সুকোমলের বাড়ির দোতলার কক্ষ। সুকোমলের স্ত্রী সুনীতি ব্যস্তভাবে একবার পথের দিকে জানালার কাছে এগিয়ে যাচ্ছে, আবার ফিরে এসে হতাশ ভাবে চেয়ারের উপরে বসে পড়ছে। ঢং ঢং করে যেই রাত এগারোটা বাজল, তখনই শুরু হল আমাদের কাহিনি।

সুনীতি। (চিন্তিত স্বরে) রাত এগারোটা! এখনও ইনি ফিরলেন না কেন? যে-পাষণ্ডের কাছে গিয়েছেন, আমার বড়ো ভয় করছে! (সিঁড়িতে পায়ের শব্দ) ওই বুঝি তিনি আসছেন—না, না, ও তো ঠাকুরপোর পায়ের শব্দ।

(পরিমলের প্রবেশ)

পরিমল। বউদি, দাদা এখনও ফেরেননি?

সুনীতি। না ঠাকুরপো, আমি ভেবে ভেবে সারা হচ্ছি।

পরিমল। তাই তো, ভাবনারই কথা বটে! একবার তাঁর খোঁজে শংকর উপাধ্যায়ের বাড়ি যাব নাকি?

সুনীতি। না ঠাকুরপো, আমি আর একলা থাকতে পারব না। তুমি তো থানায় গিয়েছিলে, পুলিশ কী বললে?

পরিমল। পুলিশ? তারা তো আমার কথা হেসেই উড়িয়ে দিলে! বললে, 'এটা হচ্ছে ইংরেজ রাজ্যের রাজধানী, বিংশ শতাব্দীতে প্রকাশ্যে এখানে কোনো অপার্থিব ভয়ংকরের আবির্ভাব হতে পারে না।' আমি বললুম, 'মশাই, আপনারা জানেন না, শংকর উপাধ্যায় হচ্ছে প্রেতসিদ্ধ!' তারা তো হো হো করে হেসেই অস্থির! বলে, 'পুলিশের কেতাবে প্রেত বলে কোনো কথা নেই।' তারপর তাদের অনেক বোঝাবার আর কাকুতি মিনতি করবার পর ইনস্পেকটার বললে, 'আচ্ছা, রাত বারোটার সময় আমি যখন রোঁদে বেরুব, তখন তোমাদের বাড়ির কাছটা একবার ঘুরে আসব।'

সুনীতি। ঠাকুরপো, এই শংকর উপাধ্যায়কে তুমি কখনো দেখেছ?

পরিমল। দেখেছি বই কি! বার-তিনেক দেখেছি।

সুনীতি। কী-রকম তাকে দেখতে?

পরিমল। তাকেই তো বলা চলে মূর্তিমান ভয়ংকর!

সুনীতি। (সভয়ে) ভয়ংকর!

পরিমল। হ্যাঁ বউদি। মাথায় সে প্রায় সাড়ে-ছয় ফুট উঁচু। গায়ের রং তার অমাবস্যার অন্ধকারে মিশিয়ে যায়। তার ঘন-কালো মুখের উপরে ভাঁটার মতো গোল চোখদুটো থেকে বেরোয় যেন অসহ্য আগুনের তীব্রতা! সে-চোখদুটোতে চোখ মিলিয়ে তাকিয়ে থাকা অসম্ভব। তার কালো কপালের উপরে জ্বলতে থাকে উজ্জ্বল সিঁদুরের সুদীর্ঘ রেখা। পরনে তার লাল-টকটকে চেলির কাপড় আর উত্তরীয়। যখন সে কথা কয়, তখন তার হিংস্র বাঘের মতো চকচকে ক্রূর দাঁতগুলোর উপরে ফুটে ওঠে ক্ষুধিত নিষ্ঠুরতার ইঙ্গিত! ও-রকম দাঁত আর কোনো মানুষের মুখে দেখিনি! উঃ, ভয়াবহ!

সুনীতি। এত শক্তি হল তার কেমন করে?

পরিমল। তা আমি ঠিক বলতে পারি না! তবে, লোকের মুখে তার অনেক কথাই শুনেছি। সে নাকি অনেকবার শবসাধনা করেছে। সে নাকি মহামাংসও খেয়েছে।

সুনীতি। মহামাংস! মহামাংস কী ঠাকুরপো?

পরিমল। কালীমূর্তির সামনে নরবলি দিয়ে যে বলি-দেওয়া মাংস খাওয়া হয়।

সুনীতি। (শিউরে উঠে) বলো কী ঠাকুরপো, মানুষ কখনো মানুষের মাংস মুখে তুলতে পারে?

পরিমল। মানুষে পারে না, কিন্তু পিশাচে পারে। শংকর উপাধ্যায়কে আমি সাক্ষাৎ নরপিশাচ বলেই মনে করি। সে সব করতে পারে।

সুনীতি। কিন্তু ইংরেজরাজত্বে নরবলি দেয় কেমন করে?

পরিমল। বউদি, ইংরেজরাজত্বে নরহত্যাও তো নিষিদ্ধ। তবু এখানে কি নিত্যই নরহত্যা হয় না? আর হত্যাকারী কি সব সময়েই ধরা পড়ে? শংকর উপাধ্যায় সত্যই যদি নরবলি দিয়ে থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই প্রকাশ্যে দেয়নি।

সুনীতি। আচ্ছা ঠাকুরপো, শ্মশান-জাগানো, ভূত-প্রেত নামানো, শবসাধনা, এ-সব কি তুমি বিশ্বাস করো?

পরিমল। বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না।

সুনীতি। শবসাধনায় সিদ্ধিলাভ করলে সত্যিই কি কেউ অলৌকিক শক্তির অধিকারী হয়?

পরমিল। ও-বিষয়েও আমার বিশেষ কোনো জ্ঞান নেই। সবাই জানে, সাধক রামপ্রসাদ আর নাটোরের মহারাজা রামকৃষ্ণ শবসাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা কোনোদিন অলৌকিক শক্তির খেলা দেখিয়েছেন বলে তো শুনিনি। ম্যাজিক দেখাবার জন্যে বা শয়তানি শক্তি অর্জন করবার জন্যে কোনো সাধুলোক শবসাধনায় নিযুক্ত হয় না। শবসাধনা হচ্ছে ধর্মসাধনারই একটি অঙ্গ।

সুনীতি। তবু শংকর উপাধ্যায়কে তোমরা সাধু বলো না কেন?

পরিমল। শবসাধনায় বসে সে অর্জন করেছে পশুশক্তি। সে ভগবানের বর চায়নি, চেয়েছে শয়তানের আশীর্বাদ।

সুনীতি। কিন্তু সে আমাদের কাছ থেকে কী চায়?

পরিমল। আমি জানি না। তুমিও কি জানো না?

সুনীতি। না।

পরিমল। দাদা তোমায় বলেননি?

সুনীতি। না। আমি তো আগে জানতুম, তোমাদের বোনের বিয়ের সময় উনি ওই লোকটার কাছ থেকে দু-হাজার টাকা ধার করেছিলেন। সেই ধারের টাকা সুদে আসলে বেড়ে এখন দাঁড়িয়েছে সাড়ে তিন হাজার টাকায়। কিছুদিন আগে থেকেই সেই ধার শোধ করবার জন্যে শংকর উপাধ্যায় তোমার দাদাকে রীতিমতো চেপে ধরে। তোমার দাদা অনেক কষ্টে সব টাকা জোগাড় করে ধার শোধ দিতে যান। কিন্তু শংকর উপাধ্যায় এখন আর টাকা নিতে রাজি হচ্ছে না।

পরিমল। কেন?

সুনীতি। কেন তা জানি না।

পরিমল। এ তো ভারী আশ্চর্য কথা! আর এ-জন্যে দাদাই বা এত ভয় পেয়েছেন কেন? শংকর যদি টাকা নিতে নারাজ হয় আর দাদার নামে নালিশ করে, তাহলে টাকা তো কোর্টে জমা দিলেই সব গোল মিটে যায়।

সুনীতি। তোমার দাদা বলেন সে নাকি কোর্টে নালিশ করতেও চায় না।

পরিমল। কী মুশকিল, তবে কী চায় সে?

সুনীতি। তোমার দাদাই জানেন।

পরিমল। এ-রহস্যের কিছুই তো বুঝতে পারছি না। সুদে-আসলে সব টাকা

ফিরিয়ে পেলে আর কী দাবি করবার অধিকার আছে তার? তুমি কি এ-সম্বন্ধে দাদাকে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করনি?

সুনীতি। করেছিলুম বই কি। কিন্তু তিনি কোনো জবাব দেন না, বোবার মতন একেবারে চুপ করে থাকেন।

পরিমল। দাদার এই নীরবতার কারণ কী?

সুনীতি। তোমার দাদাই জানেন। তবে এইটুকু বুঝেছি, শংকর এমন কিছু চায়, তোমার দাদার পক্ষে যা দেওয়া সম্ভব নয়। অথচ শংকর বলছে তার ইচ্ছা পূর্ণ না করলে আমাদের বাড়িতে সে পাঠিয়ে দেবে ভয়ংকরকে।

পরিমল। হুঁ, ভয়ংকর! কিন্তু এই ভয়ংকর কে? আমি তো ভয়ংকর বলে মনে করি শংকর উপাধ্যায়কেই।

সুনীতি। তাহলে শংকর কি নিজেই আমাদের বাড়িতে আসবে?

পরিমল। বউদি, আমরা ভয় পাচ্ছি বটে, কিন্তু মাঝে মাঝে এটাও মনে হচ্ছে, সে নিজে এখানে এসে কী করতে পারে? এখানে দাদা আছেন, আমি আছি, পাড়ার লোকজনরাও আছে—তার উপরে পুলিশের লোকও আসতে পারে। আমরা এতগুলো লোক মিলে কি ওই একটা পাষণ্ডকেও দণ্ড দিতে পারব না? আমি অনেক দিন ধরে লাঠিখেলা শিখেছি, আমি একলাই লাঠি মেরে শংকরের সমস্ত লম্ফঝম্প বন্ধ করে দিতে পারি।

সুনীতি। না ঠাকুরপো, ব্যাপারটা বোধহয় অত সহজ নয়। হয়তো কেবল শংকরের জন্যেই তোমার দাদা ভয় পাচ্ছেন না। তার দাবির পিছনে হয়তো লুকানো আছে অন্য কোনো অর্থ।

পরিমল। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই গভীর কোনো অর্থ! দাদা আমার দুর্বলও নন, কাপুরুষও নন,—তিনি হচ্ছেন ডাক্তার। আর আমি মনে করি, হৃদয় যাদের সবল নয়, ডাক্তারি পেশায় কোনোদিনই তারা সফল হতে পারে না। তাই তো ভাবছি, দাদা যখন ভয়ে এমন কাতর হয়ে পড়েছেন, তখন এই রহস্যের মধ্যে নিশ্চয়ই আছে কোনো ভয়ংকর সংকেত।

সুনীতি। উনি তো এখনও এলেন না। আমার বুক যে কেমন করছে ঠাকুরপো, মনে হচ্ছে এখনই কী যেন একটা অঘটন ঘটবে!

পরিমল। কোনো অঘটন ঘটবে না বউদি, তুমি এখনই অতটা উতলা হয়ো না।

(সিঁড়িতে দ্রুত পায়ের শব্দ)

সুনীতি। (সানন্দে) ওই উনি আসছেন—আঃ, বাঁচলুম!

(সুকোমলের প্রবেশ)

সুকোমল। (উত্তেজিত কণ্ঠে) সুনীতি, সুনীতি, সমস্তই ব্যর্থ হল!

পরিমল। কী ব্যর্থ হল দাদা?

সুকোমল। এত হাতে-পায়ে ধরা, এত অনুরোধ-উপরোধ! শংকর উপাধ্যায় আমার কোনো কথাই শুনবে না!

পরিমল। কেন শুনবে না দাদা? তুমি তো ধারের টাকা শোধ দিতেই গিয়েছিলে।

সুকোমল। শুধু ধারের টাকা নয় পরিমল, আমি তার পাওনা সুদের উপরেও আরও পাঁচশো টাকা বেশি দিতে চেয়েছিলুম।

পরিমল। (সবিস্ময়ে) তবু সে টাকা নিতে রাজি হল না?

সুকোমল। না।

পরিমল। এমন কথাও তো কখনো শুনিনি!

সুকোমল। নোটের তাড়া সে আমার মুখের উপরে ছুড়ে ফেলে দিলে!

পরিমল। বেশ তো, সে যখন ইচ্ছে করেই টাকা নিচ্ছে না, তখন তোমার আর দায়িত্ব কীসের!

সুকোমল। সে টাকা চায় না, তার বদলে চায় অন্য কিছু।

পরিমল। তার দাবি যে কী, তাই তো জানতে পারছি না। শুনছি, তুমি নাকি বউদির কাছেও সে কথা জানাওনি।

সুকোমল। (গম্ভীর স্বরে) সে জানবার কথা নয় পরিমল।

পরিমল। তবে বলো দাদা, তুমি কেন এত ভয় পাচ্ছ?

সুকোমল। পরিমল, দুরাত্মা শংকর এমন কিছু চায় আমার পক্ষে যা দেওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব!

পরিমল। (অধীর স্বরে) কিন্তু সে কী চায় তাই বলো না!

সুকোমল। (গম্ভীর স্বরে) সে চায় তোমার বউদিদিকে!

পরিমল। (সগর্জনে) কী?

সুনীতি। (আর্তস্বরে) ও মা!

সুকোমল। শংকর বলে, তার সাধনার ব্যাঘাত হচ্ছে, বীরাচারী তান্ত্রিকের সাধনায় নাকি ভৈরবীর দরকার হয়। সুনীতিকে সে চায় ভৈরবী রূপে গ্রহণ করতে।

পরিমল। অসম্ভব! অসম্ভব!

সুনীতি। আমি যাব না, আমি যাব না!

সুকোমল। শংকর বলে, ভৈরবী রূপে সুনীতিকে মূর্তিমতী দেবী জ্ঞানে পূজা করবে।

সুনীতি। (সকাতরে) আমি পূজা পেতে চাই না গো, আমি দেবী হতে চাই না!

সুকোমল। হ্যাঁ, সুনীতি, আমিও তোমাকে দেবী হতে বলছি না!

পরিমল। আমার বউদিদি লক্ষ্মীরূপিণী মানবীর মতো আমাদের ঘরেই বিরাজ করুন।

সুকোমল। কিন্তু শংকর যে আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই জোর করে তোমার বউদিদিকে এখান থেকে কেড়ে নিয়ে যেতে চায়!

পরিমল। (দৃপ্ত স্বরে) আমার প্রাণ থাকতে নয়!

সুকোমল। আমিও তাই বলি পরিমল, আমাদের জীবন থাকতে নয়!

পরিমল। আমি পুলিশে খবর দিয়ে এসেছি দাদা! শংকর কী জানে না, তার মতন দুরাত্মাকে বাধা দেবার জন্যে কলকাতায় আছে হাজার হাজার পুলিশের সেপাই?

সুকোমল। সে-কথা আমিও তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে ত্রুটি করিনি। শুনে সে হা হা করে হাসতে লাগল। বিকট সেই হাস্য!

পরিমল। সব দুরাত্মাই বিকট হাস্য করতে পারে দাদা, কিন্তু একবার পুলিশের হাতে পড়লে তাদের বিকট হাসি থেমে গিয়ে জেগে ওঠে কাতর কান্না। এখানে এলে শংকরকেও কাঁদতে হবে।

সুকোমল। কিন্তু শংকর কি নিজে আসবে বলে মনে করো?

পরিমল। তবে?

সুকোমল। সে হয়তো পাঠিয়ে দেবে এক ভয়ংকরকে!

পরিমল। কে সেই ভয়ংকর? আমি তাকে ভয় করি না!

সুকোমল। আমিও ঠিক জানি না। কিন্তু শংকর বলে, সে হচ্ছে এমন ভয়ংকর, আমরা কেউ তাকে কল্পনাতেও আনতে পারব না!

পরিমল। (সকৌতুকে হাসতে লাগল)

সুকোমল। ও কী, হঠাৎ অমন করে হাসছ কেন?

পরিমল। (সহাস্যে) তোমার ছেলেমানুষি কথা শুনে আমার হাসি পাচ্ছে দাদা! শংকরের ধাপ্পায় তুমিও কি নিজের বুদ্ধি হারিয়ে ফেললে? থানায় যখন গিয়েছিলুম, পুলিশও না হেসে পারেনি। এখন বুঝছি, এই ভয়ংকরের কথাটা হাস্যকরই বটে!

সুকোমল। হাস্যকর?

পরিমল। হাস্যকর নয়তো কী? কল্পনায় মানুষ কুম্ভকর্ণের মতন মহাকায় দানব সৃষ্টি করে, আর শংকরের এমন কে ভয়ংকর আসবে আমরা যাকে কল্পনাতেও আনতে পারব না? সব বাজে কথা, একেবারে ধাপ্পাবাজি!

সুকোমল। পরিমল, শংকরের আস্তানায় গিয়ে আমি কী দেখেছি জানো?

পরিমল। তুমি কী দেখেছ আমি তা কেমন করে জানব?

সুকোমল। শুনলেও তোমরা বিশ্বাস করতে পারবে না!

পরিমল। বিশ্বাস করতে পারব না? তাহলে তুমি কি নিজেই সেই ভয়ংকরকে দেখে এসেছ?

সুকোমল। না, ভয়ংকর নয়।

পরিমল। তবে?

সুকোমল। (সভয়ে শিহরিত স্বরে) সে কথা বলতে গিয়ে এখনও আমার বুক কেঁপে কেঁপে উঠছে!

সুনীতি। ওগো, ওগো, তুমি কী দেখেছ?

সুকোমল। কল্পনার অতীত এক মূর্তিমান বীভৎসতা!

পরিমল। দাদা, দাদা, যা বলবার তাড়াতাড়ি বলে ফ্যালো!

সুকোমল। শংকর আমাকে তার পূজার ঘরে নিয়ে গেল। সে ঘরটাও যেন পৃথিবী ছাড়া। সেখানে গিয়ে দাঁড়ালেও মনে হয় যেন উৎকট দুঃস্বপ্ন দেখছি। কিন্তু ঘরের সমস্ত বর্ণনা এখন আমি করব না। তবে, এইটুকু শুনে রাখো, তার চার কোণে দাঁড়িয়ে আছে চারটে নরকঙ্কাল, আর একদিকে মানুষের হাড়ের বেদির উপর দাঁড় করানো রয়েছে এক প্রকাণ্ড অতি-কুৎসিত অনার্য দেবতার ভীষণ মূর্তি। সাঁওতালিরা যেরকম সব অপদেবতার মূর্তি পূজা করে, এ-মূর্তিটাও অনেকটা সেইরকম দেখতে। ঘরের মাঝখানে পাতা রয়েছে চারিদিকে মড়ার মুণ্ডু দিয়ে সাজানো ব্যাঘ্রচর্মের উপরে আর-একটা মূর্তি।

পরিমল। সে কীসের মূর্তি?

সুকোমল। মানুষের।

পরিমল। তবে তার কথা বলতে গিয়ে তোমার গলার আওয়াজ এত কাঁপছে কেন?

সুকোমল। (অভিভূত কণ্ঠে) হ্যাঁ, সে মানষের মূর্তি পরিমল, সে মানুষেরই মূর্তি। কিন্তু সে জীবিত নয়।

পরিমল। শংকর বুঝি কোথা থেকে একটা মড়া জোগাড় করে এনে তোমাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করেছে? কিন্তু দাদা, নিজের হাতে কত মড়া কেটেছ, তবু তুমি ভয় পেয়েছ একটা তুচ্ছ মড়া দেখে? তোমার কথা শুনে আবার আমার হাসি আসছে দাদা!

সুকোমল। (বিকৃত স্বরে) হেসো না পরিমল হেসো না! সেটা মড়া নয়।

পরিমল। (সবিস্ময়ে) তুমি যে কী বলতে চাও দাদা, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না! আমার মনে হচ্ছে তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে!

সুনীতি। (চিন্তিত স্বরে) ওগো চলো, বিছানায় শুয়ে খানিকক্ষণ বিশ্রাম করবে চলো।

সুকোমল। (শুষ্ক হাস্য করে) হ্যাঁ, বিশ্রামই করব বটে! না পরিমল, তোমার দাদা এখনও পাগল হয়নি। ব্যাঘ্রাসনের উপরে যে বসে ছিল সে মরা মানুষ নয়! সে চোখ মুদে ছিল, আমার পায়ের শব্দ শুনেই দুই চোখ মেলে তাকিয়ে দেখলে। কী অস্বাভাবিক সেই দৃষ্টি! যেন আমার দেহ ভেদ করে চলে গেল কোনো দূর দূরান্তরে, কোনো সীমাহীন শূন্যতার দিকে! শংকর তাকে সম্বোধন করে বললে, 'ঘরের ভিতরে কে এসেছে দেখতে পাচ্ছ?' মূর্তির ওষ্ঠাধর নড়ে উঠল, তারপর যেন তার উদরের তলদেশ থেকে গম্ভীর, ভয়াল একটা স্বর বেরিয়ে এল। সে বললে, 'হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি।' শংকর আমার দিকে ফিরে বললে, 'সুকোমল, তুমি তো চোখেও দেখলে আর কানেও শুনলে, এই লোকটি তাকিয়ে আছে আর কথাও কইছে। এইবারে ওর গায়ে হাত দাও দেখি!' আমি তার গায়ে হাত দিলুম—উঃ! তারপরে পরিমল, তারপরে চমকে উঠে হাতখানা আবার সরিয়ে আনলুম!

পরিমল। (সাগ্রহে) কেন, কেন?

সুকোমল। তার গা কনকন করছে—ঠান্ডা দু-দিনের বাসি মড়ারও গা অতটা অসম্ভব ঠান্ডা হয় না! আমার চমকানি [illegible] ংকর হেসে উঠে আবার বললে,

'সুকোমল, তুমি তো ডাক্তার। একবার ওই লোকটার বক্ষ পরীক্ষা করে দ্যাখো দেখি! আমি তার কথামতো কাজ করলুম। (চিৎকার করে) পরিমল, তার বুক একেবারে স্থির, তার হৃৎপিণ্ডে এতটুকু স্পন্দন নেই! তারপর নাকের কাছে হাত নিয়ে গিয়ে দেখলুম, তার শ্বাস-প্রশ্বাস কিছুই নেই! সে একটা মৃতদেহই বটে, কিন্তু সে কথা কয়, শুনতে পায়, চোখ মেলে তাকায়!

পরিমল। তোমার ভুল হয়নি দাদা?

সুকোমল। অসম্ভব! আমি সাধারণ লোক নই, আমি ডাক্তার, আজ বারো বছর ধরে ডাক্তারি করছি।

সুনীতি। (আড়ষ্ট স্বরে) তারপর?

সুকোমল। স্তম্ভিতের মতো বসে আছি, শংকর আবার আমাকে ডেকে বললে, 'তুমি আমার শক্তি স্বচক্ষে দেখলে তো? শুনে রাখো, আমার ভয়ংকর এরও চেয়ে ভয়াবহ! এখন তুমি আমার কথায় রাজি হবে?' আমি তখনই উঠে দাঁড়িয়ে ক্রুদ্ধ স্বরে তাকে বললুম, 'আমি ভোজবাজি দেখে ভয় পাই না শংকর, তোমার কথায় এ-জীবনে আমি রাজি হব না!' শংকর পাগলের মতো চেঁচিয়ে উঠে বললে, 'তাহলে প্রস্তুত থেকো! রাত বারোটার পরেই আমার ভয়ংকর তোমার বাড়িতে গিয়ে হাজির হবে!' আমি আর সেখানে দাঁড়ালুম না, তাড়াতাড়ি সেই নরকের বাইরে চলে এলুম।

সুনীতি। (সভয়ে) রাত বারোটা! ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দ্যাখো গো, ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দ্যাখো!

পরিমল। (সচমকে) রাত বারোটা বাজতে আর দশ মিনিট বাকি।

সুকোমল। (উদ্ভ্রান্ত স্বরে) আমি এখন কী করি পরিমল—আমি এখন কী করি সুনীতি? এখনই মনে হচ্ছে আমার সারা বাড়িখানা কী এক অপার্থিব ভাবে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে! পরিমল, পরিমল, তোমার স্ত্রী কোথায়, বউমা?

পরিমল। কমলা এখন ঘুমিয়ে আছে।

সুনীতি। বারোটা বাজতে আট মিনিট বাকি! (সকাতরে) ওগো, কী হবে গো?

(হঠাৎ ঘরের বাহির থেকে তীক্ষ্ণ একটা আর্তনাদ ভেসে এল)

সুকোমল। (চমকে উঠে) ও যে বউমার গলা!

পরিমল। (উচ্চস্বরে) ...কমলা—কমলা—কমলা! (দ্রুতপদে প্রস্থান)

—(আবার সেই আর্তনাদ—এবারে আরও তীব্র)

পরিমল। (ঘরের বাহির থেকে) দাদা, দাদা!

সুকোমল। যাই পরিমল, যাই!

[স্ত্রী-কণ্ঠে আবার আর্তনাদ। সুকোমলের বাড়ির তিনতলায় পরিমলের ঘর। কমলা ঘরের এক কোণে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে যেন দেওয়ালের সঙ্গে মিশিয়ে যেতে চাইছে। তার মুখে-চোখে দারুণ ভয়ের ভাব।]

পরিমল। (বেগে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করে) কমলা!

কমলা। (ভীতিবিহ্বল বদ্ধ কণ্ঠে) ওগো! (কাঁপতে কাঁপতে মেঝের উপরে বসে পড়ল)

পরিমল। (কমলার কাছে গিয়ে নিজের দুই হাতে তার দুই হাত ধরে) কমলা, তুমি চিৎকার করে কাঁদছিলে কেন? এখনও তুমি এত কাঁপছ কেন?

কমলা। (সেইরকম বদ্ধ কণ্ঠে) সে চলে গেছে?

পরিমল। কে চলে গেছে কমলা?

কমলা। সেই মূর্তিটা?

পরিমল। (সবিস্ময়ে) মূর্তি? মূর্তি আবার কী?

কমলা। পিশাচ!

পরিমল। তুমি এসব কী বলছ?

কমলা। রাক্ষস!

পরিমল। মূর্তি—পিশাচ—রাক্ষস, স্বপ্নে কিছু দেখে ভয় পেয়ে তুমি কি প্রলাপ করছ?

কমলা। না গো না, আমি ঘুমোইনি, আমি স্বপ্ন দেখিনি! আমি জেগে জেগেই দেখেছি সেই মূর্তিটাকে!

সুকোমল। (ঘরের বাহিরে কার বিস্মিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল) কে? কে? সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে যাচ্ছ কে তুমি? সাড়া দিচ্ছ না যে? চোর নাকি? দাঁড়াও, দেখছি!

কমলা। ওই শোনো! তোমার দাদাও তাকে দেখতে পেয়েছেন!

পরিমল। কাকে দেখতে পেয়েছেন?

কমলা। সেই পিশাচটাকে!

পরিমল। কে পিশাচ?

কমলা। জানি না! মানুষের মূর্তি, কিন্তু সে মানুষ নয়!

পরিমল। মানুষের মূর্তি, মানুষ ছাড়া আর কী হতে পারে?

সুকোমল। (ঘরের ভিতর প্রবেশ করে) আশ্চর্য!

পরিমল। কী আশ্চর্য দাদা?

সুকোমল। পায়ের শব্দে সিঁড়ি কাঁপিয়ে কে নেমে গেল নীচের দিকে। কিন্তু নীচে গিয়ে কারুকেই দেখতে পেলুম না! অথচ সদর দরজাটা খোলা রয়েছে। চলেই বা গেল কে, আর দরজাই বা খুললে কে? আমার বেশ মনে আছে বাড়ির ভিতরে ঢুকে নিজের হাতে আমি দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলুম! কে এল? কে গেল? কে দরজা খুললে?

কমলা। সেই মূর্তি! আমি তাকে দেখেছি!

সুকোমল। তুমি কাকে দেখেছ বউমা?

কমলা। একটা অমানুষের মূর্তিকে! আমি বিছানায় শুয়ে ছিলুম, হঠাৎ ঘরের ভিতরটা ভরে গেল পচা মাংসের গন্ধে। অবাক হয়ে মুখ তুলে দেখি, আমার শিয়রের কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে ভীষণ একটা মূর্তি! আমার মুখের পানে স্থির চোখে সে তাকিয়ে ছিল, আমি চিৎকার করে উঠতেই ঘরের ভিতর থেকে আবার বেরিয়ে গেল।

[বাইরে রাস্তা থেকে কে উচ্চস্বরে বলে উঠল,—'এই সেপাই! পাকড়ো উসকো!']

পরিমল। রাস্তায় আবার কী কাণ্ড হচ্ছে! (ছুটে জানলার কাছে গিয়ে) কিছু দেখা যায় না, ঘুটঘুটে অন্ধকার! কেবল শোনা যাচ্ছে ছুটোছুটির শব্দ!

[রাস্তা থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে এল—'এটা কি সুকোমলবাবুর বাড়ি?']

সুকোমল। (চমকে উঠে) কে ডাকে?

পরিমল। বোধহয় অবনীবাবু এসেছেন।

সুকোমল। অবনীবাবু কে?

পরিমল। থানার ইনস্পেকটার। চলো আমরা নীচে নেমে যাই।

সুকোমল। হ্যাঁ, চলো চলো! বাড়ির ভিতরে থাকতে আমার ভয় করছে!

[রাস্তা। সুকোমলের বাড়ির সম্মুখভাগ। ইনস্পেকটার অবনীবাবু কয়েকজন পাহারাওয়ালার সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছেন। সুকোমল ও পরিমল বাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে পথের উপরে এসে দাঁড়াল।]

অবনী। (টর্চের আলো জ্বেলে) এই যে পরিমলবাবু! আপনার সঙ্গে উনি কে?

পরিমল। আমার দাদা।

অবনী। এইমাত্র আপনাদের বাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে গেল কে?

পরিমল। জানি না।

অবনী। জানেন না?

পরিমল। না, আমি কারুকে দেখিনি। আপনি যাকে দেখেছেন, সে পুরুষ না স্ত্রীলোক?

অবনী। পুরুষ।

পরিমল। আমাদের বাড়িতে আমরা দুজন ছাড়া আর কোনো পুরুষ নেই।

অবনী। কিন্তু আমি যে তাকে স্বচক্ষে দেখেছি! আমি—

সুকোমল। (সভয়ে) ইনস্পেকটারবাবু, একটা দুর্গন্ধ পাচ্ছেন?

অবনী। পাচ্ছি।

সুকোমল। পচা মড়ার দুর্গন্ধ।

অবনী। ঠিক বলেছেন! এতক্ষণ ও-কথাটা আমার মনে হয়নি। কিন্তু এ কীসের দুর্গন্ধ?

সুকোমল। আমার বোধ হয়, যে গেল তার গায়ের গন্ধ।

অবনী। কী বলছেন! জ্যান্ত মানুষের গায়ে মড়ার দুর্গন্ধ?

সুকোমল। ঠিক তাই।

অবনী। কী করে জানলেন আপনি?

সুকোমল। অনুমান করছি।

অবনী। এমন অদ্ভুত অনুমানের কারণ?

সুকোমল। বোধহয় এইমাত্র এখানে যার আবির্ভাব হয়েছিল, খানিক আগে তাকেই আমি দেখেছি শংকর উপাধ্যায়ের বাড়িতে।

অবনী। কে সে?

সুকোমল। (শিউরে) জ্যান্ত মড়া!

অবনী। কী, কী বললেন?

সুকোমল। জীবন্ত মৃতদেহ!

অবনী। পরিমলবাবু, আপনার দাদার মাথা খারাপ নয় তো?

সুকোমল। (শুকনো হাসি হেসে) আপনিও সেই সন্দেহ করছেন? না, আমার মাথা এখনও খারাপ হয়নি ইনস্পেকটারবাবু, তবে মাথা খারাপ হতে আর

বেশিক্ষণ লাগবে না বোধহয়। হ্যাঁ, যা বলছি, সত্য কথা! শংকর উপাধ্যায়ের বাড়িতে গিয়ে আমি একটা মৃতদেহ দেখেছি, কিন্তু জীবন্ত মৃতদেহ!

অবনী। আপনার কথার কোনোই মানে হয় না। যা জীবন্ত, তাকে মৃতদেহ বলা চলে না।

সুকোমল। তা চলে না। তবু ওই কথাই আমি বলতে চাই। আমার বিশ্বাস, আপনিও আজ তাকেই দেখেছেন।

অবনী। (দৃঢ় স্বরে) না, আমি দেখেছি একজন জীবন্ত মানুষকে।

সুকোমল। তাকে কীরকম দেখতে বলুন দেখি?

অবনী। ওইখানেই একটু মুশকিল আছে। আমি তার মুখ দেখতে পাইনি—দেখেছি তার পিছন দিকটা। তবে তার হাব-ভাব, চলা-ফেরা আমার কাছে সন্দেহজনক বলে মনে হয়েছিল। তাই তাকে দাঁড়াতে বললুম, কিন্তু সে আমার কথা না শুনে কলে-চলা পুতুলের মতো হন হন করে এগিয়ে চলে গেল। পাহারাওয়ালাদের তাকে ধরে আনতে বললুম, কিন্তু সে ওই সরু গলিটার ভিতরে ঢুকে পড়ে কোথায় যে মিলিয়ে গেল বলতে পারি না।

সুকোমল। আমার বড়োই সন্দেহ হচ্ছে, আমার বড়োই সন্দেহ হচ্ছে যে শংকর উপাধ্যায় আমাকে ভয় দেখাবার জন্যে সেই মৃতদেহটাকেই আমার বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছিল! আর—

অবনী। (বাধা দিয়ে অধীর স্বরে) থামুন মশাই থামুন! বার বার একটা বাজে কথা বলে আমাকে ত্যক্ত করবেন না। জ্যান্ত মড়া! যা নয় তাই!

সুকোমল। আপনি যদি বিশ্বাস না করেন, আমি নাচার! শংকর উপাধ্যায়কে আপনি চেনেন না, তাই এই কথা বলছেন।

অবনী। রাখুন আপনার শংকর উপাধ্যায়! দুনিয়ায় আমি অনেক শর্মাকেই ঠান্ডা করেছি!

পরিমল। ইনস্পেকটার মশাই, আপনি আমার দাদার কথা উড়িয়ে দিতে চাইছেন বটে, কিন্তু আমার মনে হয় এই ব্যাপারটার মধ্যে নিশ্চয়ই অলৌকিক কিছু আছে!

অবনী। আমি পুলিশ, অলৌকিক ঘটনা মানি না।

পরিমল। আজ কী হয়েছে জানেন?

অবনী। কী?

পরিমল। আমাদের বাড়ির সদর দরজা যে ভিতর থেকে বন্ধ ছিল, সে-বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই। কিন্তু ওই মূর্তিটা বাহির থেকে আশ্চর্য উপায়ে দরজা খুলে বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করেছিল।

অবনী। এতে আশ্চর্য হবার কী আছে? অনেক কৌশলী চোরও বাহির থেকে দরজা খোলবার উপায় জানে। আপনাদের বাড়িতে চোর এসেছিল, সকলের সাড়া পেয়ে পালিয়ে গিয়েছে।

পরিমল। তারপর শুনুন, আমরা তাকে দেখিনি বটে, কিন্তু আমার স্ত্রী স্বচক্ষে তাকে দেখেছেন। তিনি কী বলেন জানেন?

অবনী। কী বলেন?

পরিমল। তিনি বলেন তাকে দেখতে পিশাচের মতো, রাক্ষসের মতো! তিনি বলেন, যাকে দেখেছেন তার মানুষের মূর্তি, কিন্তু সে মানুষ নয়।

অবনী। (বিরক্ত স্বরে) রাবিশ! আমি এখন ডিউটিতে আছি। এখানে দাঁড়িয়ে আপনাদের রূপকথা শুনে সময় নষ্ট করতে চাই না। (প্রস্থান করতে উদ্যত হলেন।)

সুকোমল। (কাতর স্বরে) যাবেন না ইনস্পেকটার মশাই, আমাদের ফেলে চলে যাবেন না!

অবনী। আচ্ছা মুশকিল তো! আমার কি আর কোনো কর্তব্য নেই? এখানে সারারাত দাঁড়িয়ে আমাকে কি পাগলের প্রলাপ শুনতে হবে?

সুকোমল। শংকর উপাধ্যায় বলেছে, আজ রাত বারোটার সময় ওই জ্যান্ত মড়াটার চেয়েও সাংঘাতিক কোনো ভয়ংকরকে আমাদের বাড়িতে পাঠিয়ে দেবে।

অবনী। (হা হা করে হেসে উঠে) জ্যান্ত মড়ার উপরেও আরও কিছু আছে নাকি? তাহলে বোধহয় শংকর উপাধ্যায়ের হুকুমে জড় হিমালয় পর্বত আজ জ্যান্ত হয়ে আপনাদের বাড়ির উপরে এসে ভেঙে পড়বে! কী বলেন? (আবার কৌতুক হাস্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন)

পরিমল। (সভয়ে) দাদা, দাদা! চেয়ে দ্যাখো, ওইদিকে চেয়ে দ্যাখো! ওই গলির ভিতর থেকে সাদা-মতন কী-একটা এদিকে আসছে না?

অবনী। (তাড়াতাড়ি ফিরে দাঁড়িয়ে) হ্যাঁ, কেউ আসছে বটে। মাঝে মাঝে টর্চ জ্বেলে পথ দেখছে। সে লোকটাও ওই গলির ভিতরেই ঢুকে গিয়েছিল, কিন্তু তার হাতে টর্চ ছিল না। এ অন্য কোনো লোক।

[সকলে সেইদিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল, মূর্তিটা ধীরে ধীরে তাদের কাছে এসে দাঁড়াল।]

অবনী। (আগন্তুকের দিকে টর্চের আলো নিক্ষেপ করে) কে আপনি?

আগন্তুক। (সহাস্যে) পথিক।

অবনী। এত রাত্রে কোথা থেকে আসছেন?

আগন্তুক। বিয়েবাড়ি থেকে নিমন্ত্রণ খেয়ে ফিরছি।

অবনী। আপনার নাম কী? কোথায় থাকেন?

আগন্তুক। আমার নাম হরিহর চৌধুরি। থাকি জোড়াসাঁকোয়।

অবনী। দেখলুম আপনি ওই গলির ভিতর থেকে বাইরে এলেন। ওখানে আর কারুর সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল?

হরিহর। (রহস্যময় হাসি হেসে) হয়েছিল।

অবনী। তার মুখ দেখেছেন? আবার তাকে দেখলে চিনতে পারবেন?

হরিহর। (আবার সেইরকম হাসি হেসে) তার মুখ দেখেছি। পায়ের শব্দ শুনে টর্চের আলো জ্বেলেই দেখলুম, গলির ভিতরে পচা মড়ার গন্ধ ছড়িয়ে এগিয়ে আসছে একটা অদ্ভুত মূর্তি।

অবনী। অদ্ভুত মূর্তি?

হরিহর। হ্যাঁ। অদ্ভুত মূর্তি, কারণ সে হচ্ছে একটা চলন্ত মৃতদেহ।

অবনী। (ব্যঙ্গের হাসি হেসে) এতক্ষণ শুনছিলুম জীবন্ত মৃতদেহ, এখন আবার শুনছি চলন্ত মৃতদেহের কথা। আজ কি সকলেই খেপে গিয়েছে!

হরিহর। আপনাকে পুলিশ কর্মচারী বলে মনে হচ্ছে। পৃথিবীর অপরাধীদের নিয়েই আপনাদের কারবার, কিন্তু এই সাধারণ পৃথিবীর ভিতরেই যেসব অসাধারণ রহস্য আছে, আপনারা তার কতটুকু খবর রাখেন?

অবনী। আপনি দেখছি সুকোমলবাবুর চেয়েও আর-এক পর্দা উপরে উঠে কথা কইছেন! সাধারণ পৃথিবীর অসাধারণ রহস্যের কথা আপনি আমার চেয়ে ভালো করে জানলেন কেমন করে?

হরিহর। প্রেততত্ত্ববিদ বলে আমার কিঞ্চিৎ খ্যাতি আছে।

সুকোমল। (তাড়াতাড়ি এগিয়ে) আপনিই কি সেই বিখ্যাত প্রেততত্ত্ববিদ হরিহরবাবু?

অবনী। (হাস্য করে) তাহলে আপনার নাম আমারও অপরিচিত নয়। শুনেছি আপনি ইহলোকে বসেই পরলোকের বাসিন্দাদের সঙ্গে আলাপ করতে পারেন। কিন্তু আমি মশাই, ওসব কথায় একটুও বিশ্বাস করি না।

হরিহর। আপনি বিশ্বাস না করলেও ইহলোকের বা পরলোকের কোনোই ইষ্ট বা অনিষ্ট হবে না।

সুকোমল। (ব্যস্তভাবে) হরিহরবাবু, হরিহরবাবু! আপনার কাছে আমি গোটাকয়েক কথা নিবেদন করতে পারি কি?

হরিহর। অনায়াসেই।

সুকোমল। তাহলে দয়া করে এইদিকে একটু এগিয়ে আসুন।

[হরিহরকে নিয়ে সুকোমল খানিকটা তফাতে গিয়ে মৃদুস্বরে কী বলতে লাগল, শোনা গেল না।]

অবনী। পরিমলবাবু, আপনাদের এখানে আর কিছুক্ষণ থাকলে আমিও খেপে যাব বলে মনে হচ্ছে! কই, এখনও তো কোনো ভয়ংকরেরই আবির্ভাব হল না! ও-সব বাজে ভয় নিয়ে মাথা ঘামাবেন না, আমি এখন চললুম।

পরিমল। ইনস্পেকটার মশাই, দয়া করে আর একটু অপেক্ষা করুন।

অবনী। আমি হচ্ছি পুলিশের লোক, রোজা নই। ভৌতিক কাণ্ডকারখানার ভিতরে আমি থাকতে ইচ্ছা করি না।

পরিমল। আপনাদের পেয়ে আমরা অকূলে কূল পেয়েছি! আর মিনিট কয়েকের জন্যে এখানে অপেক্ষা করলে বোধহয় আপনার কাজের কোনোই ক্ষতি হবে না।

অবনী। (নাচার ভাবে) আপনারা জ্বালালেন দেখছি! (মিনিট পাঁচেক কেটে গেল। হরিহর ও সুকোমল আবার এদিকে অগ্রসর হয়ে এল।)

হরিহর। সুকোমলবাবু, আপনার ব্যাপারটা বিশেষ জটিল বলে বোধ হচ্ছে না। যদিও এ-রকম ঘটনার মধ্যে এর আগে আমি নিজে কখনো এসে পড়িনি, তাহলেও আমার গুরুদেব সত্যশিবসুন্দর স্বামীজির কাছ থেকে শুনেছি, এমন সব ঘটনা ঘটাও কিছুই অসম্ভব নয়। বামাচারীরা নিম্নশ্রেণির সাধক বটে, কিন্তু তারা এমন সব অদ্ভুত শক্তি অর্জন করে যা আমরা অনায়াসেই অপার্থিব বলে মনে করতে পারি। এমনকি, একান্তভাবে ধ্যানের দ্বারা আর মন্ত্রগুণে তারা অতিকায় দানব পর্যন্ত সৃষ্টি করতে পারে। আমার বিশ্বাস, আপনাদের ওই শংকর উপাধ্যায় আপনাকে ভয় দেখাবার জন্যে হয়তো ওইরকম কোনো একটা মূর্তি এখানে প্রেরণ করতে চায়। সত্যি সত্যিই সে মূর্তি হচ্ছে অসীম শক্তিশালী আর কল্পনাতীতরূপে ভয়ংকর, যার বিরুদ্ধে দাঁড়ালে আমাদের এই ইনস্পেকটার মশাইয়ের একাধিক রিভলভার আর পাহারাওয়ালাদের শতাধিক রুলের গুঁতো পর্যন্ত একেবারেই ব্যর্থ হয়ে যাবে।

অবনী। মশাই, আপনি দেখছি সকলের উপরে টেক্কা মারলেন! আপনার

মতন উন্মত্ত মানুষ পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো পাগলাগারদে গেলেও আবিষ্কার করা অসম্ভব।

হরিহর। (সহাস্যে ও বিনীত ভাবে) আপনার এই অভিনন্দন আমি সাদরে গ্রহণ করলুম। কিন্তু আমার একটি অনুরোধ আছে। রাখবেন কি?

অবনী। কী অনুরোধ?

হরিহর। দয়া করে যদি এখানে আর-কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেন, তাহলে কল্পনাতীত অলৌকিক ঘটনাও যে এই সাধারণ পৃথিবীতে সম্ভবপর হয়, সেইটেই আপনার চোখের সামনে প্রমাণিত করে দেব।

অবনী। কথায় বলে—'পড়েছি মোগলের হাতে খানা খেতে হবে সাথে।' বেশ, আপনারা ভৌতিক ধাপ্পাবাজির আয়োজন যখন করেছেন, তখন তার শেষ পর্যন্তই দেখা যাক। 'ডুবেছি না ডুবতে আছি, দেখা যাক পাতাল কত দূর!'

হরিহর। সুকোমলবাবু, ইনস্পেকটার মশাই এখনও অবিশ্বাসী। সুতরাং ওঁর কথা নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই। আসুন, এখন আমরা নিজেদের কর্তব্য পালন করি।

সুকোমল। আমার যে কী কর্তব্য আমি তা নিজেই বুঝতে পারছি না।

হরিহর। আমার অনুরোধ রক্ষা করলেই আপনাদের কর্তব্য পালন করা হবে।

সুকোমল। আদেশ করুন।

হরিহর। আদেশ নয়, অনুরোধ।

সুকোমল। বলুন।

হরিহর। আমার অনুরোধ হচ্ছে, আপনারা সকলে বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করুন।

অবনী। (ব্যঙ্গসূচক ভ্রূভঙ্গি করে) তারপর?

হরিহর। তারপর? তারপর আপনাদের আর বিশেষ কিছুই করতে হবে না, কারণ তারপর আপনারা অধিকার করবেন কেবল দর্শকের আসন।

অবনী। আর আপনি? তারপর অভিনেতা হবেন কি আপনি?

হরিহর। মোটেই নয়। এই বিচিত্র নাটকীয় দৃশ্যাভিনয়ের জন্যে আমি কেবল রঙ্গমঞ্চ প্রস্তুত করে রাখতে চাই।

অবনী। তার মানে?

হরিহর। মানে আপনি কিছুই বুঝবেন না, কারণ আপনি এখনও পর্যন্ত অবিশ্বাসী।

অবনী। (ক্রুদ্ধ স্বরে) আমি বিশ্বাসী কি অবিশ্বাসী তা নিয়ে বাজে কথা খরচ করবেন না! আমি জানতে চাই, আপনি এখানে কোন ভূমিকায় অভিনয় করবেন?

হরিহর। আমি? আমি আগে এই বাড়িখানার চারিদিকে মন্ত্রপূত রেখা টেনে দিতে চাই।

অবনী। কেন?

হরিহর। ভয়াবহ অমঙ্গলের কবল থেকে আপনাদের রক্ষা করার জন্যে।

অবনী। (ঠোঁট বেঁকিয়ে হেসে) তাই নাকি?

হরিহর। (তপ্ত কণ্ঠে) হ্যাঁ, তাই! আপনার ওই অজ্ঞতা আর মূর্খতা দিয়ে বারবার আমাকে বাধা দেবার চেষ্টা করবেন না। আমি বুঝতে পারছি, আর সময় নেই! মনে মনে আমি শুনতে পাচ্ছি, এমন কোনো ভয়ংকর পৃথিবীর মাটির উপর তার অপার্থিব মূর্তি নিয়ে এইদিকে ধেয়ে আসছে, যার কবলে পড়লে আপনাদের তুচ্ছ অস্তিত্ব এখনই বিলুপ্ত হয়ে যাবে! (আদেশের স্বরে) যান, যদি প্রাণে বাঁচতে চান, অবিলম্বে ওই বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করুন!

[অকস্মাৎ হরিহরের মূর্তির এবং তাঁর কণ্ঠস্বরের অদ্ভুত পরিবর্তন হল। তাঁর গাম্ভীর্য ও সুদৃঢ় কণ্ঠস্বর শুনে সকলেরই মন হয়ে উঠল সচকিত। সকলে, এমনকি ইনস্পেকটার অবনী পর্যন্ত আর কোনো কথা বলতে সাহস না পেয়ে মাথা নত করে বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করলে।]

॥ ৪ ॥

[সুকোমলের বাড়ির দোতলার বারান্দা। সেখানে দাঁড়িয়ে আছে সুকোমল, পরিমল ও অবনীবাবুর সঙ্গে হরিহর। তাদের সকলেরই দৃষ্টি নীচেকার রাস্তার দিকে।]

অবনী। অন্ধকারের ভিতরে যেন দুটো চলন্ত মূর্তি দেখা যাচ্ছে না?

হরিহর। হ্যাঁ। মূর্তিদুটো এইবারে এই বাড়ির কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল।

[অবনী সেইদিকে টর্চের আলোক নিক্ষেপ করলে।]

সুকোমল। (সভয়ে আর্তনাদ করে উঠল।)

অবনী। অমন করে উঠলেন কেন সুকোমলবাবু?

সুকোমল। (অভিভূত স্বরে) ও যে সেই!

অবনী। কে?

সুকোমল। সেই জীবন্ত মৃতদেহটা!

হরিহর। অমন আড়ষ্টভাবে তাকিয়ে কী দেখছেন ইনস্পেকটার মশাই? আমিও টর্চ জ্বালি, ডবল টর্চের আলোয় আপনি আরও ভালো করে ওই মূর্তিটাকে দেখুন। ও চলছে আর নড়ছে বটে, কিন্তু ওকে কি জ্যান্ত মানুষ বলে মনে হয়?

অবনী। (খানিকক্ষণ স্তম্ভিতের মতন থেকে) এ কী দেখছি!

সুকোমল। (উত্তেজিত কণ্ঠে) ওই মূর্তিটা এবারে একলা আসেনি, ওর সঙ্গে এসেছে শংকর উপাধ্যায় নিজেও!

শংকর। (হা হা স্বরে উচ্চহাস্য করে) হ্যাঁ সুকোমল, এবার আমিও তোমার বাড়িতে বেড়াতে এসেছি!

অবনী। কে তুমি? কী চাও এখানে?

শংকর। (আবার বিকট হাস্য করে) আমি যা চাই সুকোমল তা জানে!

অবনী। আমি এখনই তোমাকে আর তোমার সঙ্গীকে গ্রেপ্তার করব!

শংকর। তাই নাকি? হা হা হা হা হা! তুচ্ছ জীব, আমাকে গ্রেপ্তার করবে তুমি?

অবনী। (ক্রোধে চিৎকার করে পাহারাওয়ালাদের উদ্দেশে) সেপাই! এই সেপাই! তোমরা—

হরিহর। (বাধা দিয়ে) শান্ত হোন। পাহারাওয়ালাদের ডাকছেন কেন?

অবনী। ওই দুটো বদমাইসকে ধরে আনবে বলে। মারের চোটে ওদের হাড় গুঁড়ো করে দেব!

হরিহর। এখন এ-বাড়ি থেকে জনপ্রাণীর রাস্তায় বেরুনো উচিত নয়।

অবনী। আপনার ও-কথা আমি মানব না। আগে ওদের গ্রেপ্তার করি, তারপর অন্য কথা।

হরিহর। কিন্তু কাকে আপনি গ্রেপ্তার করবেন? চেয়ে দেখুন, ওরা আবার অন্ধকার সমুদ্রে তলিয়ে গিয়েছে।

অবনী। কিন্তু তলিয়ে ওরা যাবে কোথায়? এখনও ওরা বেশি দূরে যেতে পারেনি। (চিৎকার করে) সেপাই! সেপাই!

হরিহর। চুপ করুন! আরও দূরে তাকিয়ে দেখুন।

অবনী। (তীক্ষ্ণ নেত্রে দেখবার চেষ্টা করে) কই, কী দেখব? দেখছি তো খালি অন্ধকার!

হরিহর। অন্ধকারের ভিতরে অন্ধকারের চেয়েও কালো আর-একটা বিরাট

ছায়া দেখছেন না? ভালো করে দেখুন, ছায়াটা এইদিকেই এগিয়ে আসছে!

অবনী। (আবার দেখবার চেষ্টা করে) হ্যাঁ,—আশ্চর্যরকম প্রকাণ্ড একটা ছায়া! প্রায় দোতলা বাড়ির সমান উঁচু, আর চওড়াতেও বোধহয় আট-দশ হাতের কম হবে না! কী ওটা?

হরিহর। ভয়ংকর!

অবনী। সে আবার কী?

হরিহর। ওই ছায়াটাই হচ্ছে শংকর উপাধ্যায়ের ভয়ংকর! কিন্তু ওটা ছায়া নয়, রীতিমতো কায়া! ও আরও কাছে এগিয়ে এসেছে। ওর মাটিকাঁপানো বিপুল পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছেন তো?

সুকোমল। (সভয়ে) ও কেন এগিয়ে আসছে—ও কেন এদিকে এগিয়ে আসছে?

হরিহর। আপনারই জন্যে।

অবনী। (টর্চ জ্বেলে বিস্মিত কণ্ঠে) কই, আর-কিছুই দেখতে পাচ্ছি না তো?

হরিহর। (মৃদু হাস্য করে) আলো জ্বেলে আপনি কাকে দেখতে চান, ইনস্পেকটার মশাই? অন্ধকারের ভিতরে গিয়ে পড়লে আলো নিজেই ফুটে ওঠে বটে, কিন্তু আলো জ্বেলে কেউ কি কখনো অন্ধকারকে খুঁজে পেয়েছে? যে আসছে সে হচ্ছে অন্ধকারের সন্তান, নিরেট অন্ধকার দিয়ে ওর সর্বশরীর গড়া। আলো নেবালেই আবার ওকে দেখতে পাবেন।

অবনী। (আলো নিবিয়ে) কিন্তু এই যে বললেন ওটা ছায়া নয়, কায়া?

হরিহর। হ্যাঁ, কায়া বটে, কিন্তু অন্ধকারেরই কায়া। ওটা কায়া বলেই ওর ভয়াবহ পদশব্দ আমরা শুনতে পাচ্ছি।

অবনী। (হতভম্বের মতো) আপনার কোনো কথার অর্থই আমি বুঝতে পারছি না, সবই যেন অসম্ভব আজগুবি কথা!

হরিহর। এমন অর্থ বোঝবার চেষ্টা করবেন না, অর্থ বোঝাবার সময়ও আমার নেই। কিন্তু আবার চেয়ে দেখুন, রাস্তা থেকে কত উঁচুতে ও-দুটো কী দেখছেন?

অবনী। ক্রিকেট বলের মতো বড়ো দুটো আগুনের গোলা। ও দুটো আবার কী?

হরিহর। ওই কৃষ্ণ অপচ্ছায়ার দুটো অগ্নিময় চক্ষু। দেখছেন ওই চোখদুটো? ওর ভীষণ আত্মার সমস্ত বীভৎসতা ফুটে উঠেছে ওই দুটো চক্ষুর ভিতর দিয়ে। পৃথিবীর যত পাপ আর হত্যা আর হিংসার ভাব যেন ওই দুটো চক্ষুর ভিতরেই গিয়ে বাসা বেঁধেছে! দেখুন, ওই ক্ষুধিত চোখদুটো তাকিয়ে আছে সুকোমলবাবুর দিকেই।

সুকোমল। উঃ! (কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়ল)

হরিহর। ভয় নেই সুকোমলবাবু, ভয় নেই! ওই অন্ধকারের জীবদের সমস্ত রহস্যই আছে আমার নখদর্পণে, আমি যতক্ষণ এখানে আছি আপনাদের কারুর কোনোই ভয় নেই।

শংকর। (দৃষ্টির অন্তরালে থেকে প্রচণ্ড স্বরে অট্টহাস্য করে) ভয় নেই? ভয়ংকর যখন মূর্তি ধারণ করেছে, তখন কে বলে ভয় নেই? ...ওরে ভয়ংকর! ওরে বিশ্বগ্রাসী মৃত্যুর শরীরী প্রকাশ। ওরে চির-অতৃপ্ত ক্ষুধার নিজস্ব মূর্তি! জেগে ওঠ তুই, আরও ভালো করে জেগে ওঠ! পৃথিবীর বুক থেঁতলে মূর্তিমান ঝড়ের মতো ধেয়ে যা তুই এই অভিশপ্ত বাড়ির দিকে, ধেয়ে যা! এক পদাঘাতে এখানকার যা কিছু সব করে দে চূর্ণবিচূর্ণ! আমি নিজে তোর মূর্তি গঠন করেছি—আমি তোর পিতা, আমি তোর স্রষ্টা! সমস্ত বিলুপ্ত করে দিয়ে তোর ক্ষুধা নিবৃত্তি কর—এই হচ্ছে আমার আদেশ!

[অন্ধকারে শোনা গেল কেবল দ্রুত পদের প্রচণ্ড শব্দ এবং অন্ধকার পরিপূর্ণ শূন্যের মধ্যে বৃহৎ দুটো অগ্নিময় নেত্রের চারিদিকে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল যেন কতকগুলো বিদ্যুৎ শিখা। একমাত্র হরিহর ছাড়া আর সকলেই দারুণ আতঙ্কে আর্তনাদ করে উঠল।...আচম্বিতে পদশব্দ হল নীরব, নিবে গেল দুটো জ্বলন্ত চক্ষু।]

হরিহর। (সানন্দে) আমার মন্ত্রঃপূত রেখা সফল হয়েছে! আমার রেখা ব্যর্থ করে দিয়েছে এই দীপ্ত চক্ষুর ছায়াময় বিভীষিকার মারাত্মক আক্রমণকে! অন্ধকারের অভিশপ্ত আত্মা আবার মিলিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে অন্ধকারের মধ্যে। কিন্তু মিলিয়ে যাওয়ার আগে ওকে আমারই আদেশ পালন করতে হবে। ...(চিৎকার করে) ওরে নিষ্ঠুর হত্যার শরীরী কালিমা। ওরে চির-অতৃপ্ত হিংস্র ক্ষুধার মূর্তি! বিলুপ্ত হবার আগে পরিতৃপ্ত কর তোর ওই বীভৎস ক্ষুধাকে! ধেয়ে যা তোর স্রষ্টার দিকে—যে আজ তোর ক্ষুধাকে জাগ্রত করেও তৃপ্ত করতে পারলে না! তোর ক্ষুধাগ্নির ইন্ধন রূপে গ্রহণ কর সেই দুরাত্মাকেই!

[আবার মাটি-কাঁপানো দ্রুত পদশব্দ শোনা গেল। কিন্তু শব্দ এবারে এগিয়ে আসছে না, অন্যদিকে চলে যাচ্ছে। অন্ধকার ফুঁড়ে দাউ দাউ শিখা নাচিয়ে জেগে উঠল আবার দুটো প্রদীপ্ত ও ভয়াল চক্ষু।]

শংকর। (দৃষ্টির অন্তরালে থেকে গগনভেদী আর্তনাদ করে) রক্ষা করো! ক্ষমা করো! মুক্তি দাও! ওরে, আমি তোর স্রষ্টা। ওরে, আমাকে হত্যা—(আর কিছু শোনা গেল না)

হরিহর। (প্রশান্ত কণ্ঠে) শান্তি, শান্তি, শান্তি! হত্যাকে যে মূর্তিদান করে, হত্যার পায়ে আত্মবলি দিতে হয় তাকেই! সুকোমলবাবু, উঠে দাঁড়ান, আর আপনার কোনো ভয় নেই। পৃথিবী থেকে একটা মহাপাপ বিদায় হয়েছে।

অবনী। (বিহ্বলের মতো) আমি কিছুই বুঝতে পারছি না! আমি জেগে আছি, না দুঃস্বপ্নের জগতে বাস করছি?

হরিহর। বলতে পারি না। এই দুনিয়ায় স্বপ্নই হয় সত্য, কিংবা সত্য পরিণত হয় স্বপ্নে, এ কথা ঠিক করে বলা বড়ো কঠিন। আজকে যা দেখলেন আর শুনলেন, আপনারা এখন তাই নিয়েই আলোচনা করুন, আমি এখন বিদায় হলুম। নমস্কার।

॥ ৫ ॥

[রাস্তা। অবনী, সুকোমল ও পরিমল এবং পাহারাওয়ালারা। সকলেরই হাতে জ্বলন্ত টর্চ। এদিকে-ওদিকে তাকাতে তাকাতে তারা অগ্রসর হচ্ছে।]

সুকোমল। যদিও এখন আর কোনোদিকে কারুর সাড়া নেই, তবু এখনও আমার কেমন ভয় করছে!

অবনী। পুলিশে চাকরি করি, আমার তো ভয় করলে চলবে না! যারা ভয়াল, তাদের নিয়েই আমাদের কাজ।

পরিমল। কিন্তু কী দেখতে আমরা এখানে এসেছি?

অবনী। জানি না। আজ যা স্বচক্ষে দেখেছি তাও সত্য সত্যই দেখেছি বলেও বিশ্বাস হচ্ছে না। জীবন্ত মৃতদেহ, ছায়াময় বিরাট কায়া পদভারে মাটি কাঁপিয়ে চলাফেরা করে, মন্ত্রপূত রেখা টেনে তাকে আবার বাধা দেওয়া যায়! আমরা যেন আরব্য রজনীর ভিতরে গিয়ে একটি রাত্রিযাপন করছি! এসব কথা যদি আমার রিপোর্টে লিখি, তাহলে আমাদের বড়ো, মেজো, ছোটো সাহেব তো হেসেই খুন হবে! হয়তো বাধ্য হয়ে আমাকে পেনশন পাওয়ার আগেই কাজ থেকে অবসর নিতে হবে!

পরিমল। তাহলে আপনার রিপোর্টে এ সব উল্লেখ না করাই ভালো। আজকের রাতের কোনো কথাই অন্য কারুকে বলবার দরকার নেই।

অবনী। তাই বা কেমন করে হয়? বিকট একটা আর্তনাদ শুনেছি—ঠিক যেন মৃত্যু-যন্ত্রণার আর্তনাদ! খুব সম্ভব আজ এখানে একটা নরহত্যা হয়েছে। আমি তার

তদন্ত করতে বাধ্য। কে মারলে কাকে? কেন মারলে? কেমন করে মারলে? এ সব প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে আমাকেই। আমাদের সঙ্গে হরিহরবাবুও থাকলে ভালো হত, কিন্তু ঘটনাস্থলে হঠাৎ আবির্ভূত হয়ে আবার তিনি হঠাৎ অন্তর্হিত হয়ে গেছেন।

পরিমল। আশ্চর্য মানুষ! যেন ঈশ্বর-প্রেরিত! তিনি না থাকলে আমাদের অবস্থা কী যে হত, কে জানে?

সুকোমল। (সচমকে) খানিক দূরে কে যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে না?

অবনী। হ্যাঁ, একটা মূর্তি।

সুকোমল। (সভয়ে) তবে কি—

অবনী। লোকটা কে দেখতে হচ্ছে।

সুকোমল। না, না, আর এগিয়ে যাবেন না!

অবনী। কেন?

সুকোমল। ও যদি শংকর উপাধ্যায় হয়?

অবনী। তাহলেও আমাকে এগিয়ে যেতে হবে। (আরও খানিক অগ্রসর হয়ে) এ কী, হরিহরবাবু?

হরিহর। আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি যে হরিহর, সে বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই।

অবনী। আপনি এখনও এখানে?

হরিহর। (সহাস্যে) বোধহয় একই কারণে আমরা সকলেই এখানে এসেছি।

অবনী। আমরা এসেছি, কে এখানে আর্তনাদ করলে তাই জানবার জন্যে।

হরিহর। আমারও ঠিক ওই উদ্দেশ্য।

অবনী। কিছু জানতে পেরেছেন?

হরিহর। পেরেছি।

অবনী। কী জানতে পেরেছেন?

হরিহর। আরও খানিকটা এগিয়ে এলেই দেখবেন, এখানে দুটো লাশ পড়ে আছে।

(সকলে তাড়াতাড়ি সেইদিকে ছুটে গেল)

সুকোমল। (সবিস্ময়ে) অ্যাঁ, এ যে শংকর উপাধ্যায়ের দেহ! উঃ, ওর মুখের কী ভয়ংকর ভাব!

হরিহর। তারও চেয়ে ভয়ংকর কিছু দেখতে পাচ্ছেন না?

সুকোমল। কী?

হরিহর। (গম্ভীর স্বরে) আমি ওর দেহটা ভালো করেই পরীক্ষা করেছি। ও

কেমন করে মরেছে জানি না, কারণ দেহের কোথাও কোনো আঘাতের এতটুকু চিহ্ন নেই। কিন্তু ওর দেহের ভিতরে যে এতটুকু রক্তও নেই, পরীক্ষা করলে আপনারাও তা জানতে পারবেন। কে যেন কোনো রহস্যজনক উপায়ে ওর দেহ থেকে সমস্ত রক্ত একেবারে শোষণ করে নিয়েছে!

অবনী। এমন কথাও এই প্রথম শুনলুম!

হরিহর। তারপর ওইদিকে তাকিয়ে দেখুন।

অবনী। আর-একটা লাশ!

হরিহর। ও হচ্ছে সেই মূর্তি—মৃত্যুর পরেও যে জীবন্ত দেহ নিয়ে পৃথিবীর উপরে বিচরণ করত।

অবনী। মড়ার মৃত্যু!

হরিহর। অবনীবাবু, ও আগেও ছিল মড়া, এখনও আছে মড়া। ওরও দেহ পরীক্ষা করলে বুঝবেন, ওটা তাজা নয়, অনেক দিন আগেই ওর মৃত্যু হয়েছে।

সুকোমল। কিন্তু ওর মধ্যেও যে জীবনীশক্তি ছিল, সেটাও আমরা সকলে স্বচক্ষে দেখেছি।

হরিহর। (মাথা নেড়ে) সে জীবনীশক্তি ওর নিজের নয়।

সুকোমল। তবে?

হরিহর। শংকর উপাধ্যায় মন্ত্রগুণে এই মৃতদেহের মধ্যে সঞ্চারিত করেছিল নিজের জীবনীশক্তির অংশ। মড়ার উপরে এখানে কেউ খাঁড়ার ঘা মারেনি, শংকরের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই এই মৃতদেহের ভিতর থেকে তার জীবনীশক্তি অদৃশ্য হয়েছে।

অবনী। আর সেই ভয়ংকরের বিরাট ছায়া-দেহটা?

হরিহর। (হাত তুলে চারিদিকের অন্ধকারকে দেখিয়ে) নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে বাস করে যত পাপ, যত অমঙ্গল, যত ভয়ংকর। মহাপাপী শংকরের অপবিত্র কল্পনা অন্ধকারের ভিতর থেকে মূর্ত করে তুলেছিল যে নৃশংস অমঙ্গলকে, স্রষ্টাকে হত্যা করেও সে কি আর নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারে? স্রষ্টার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই মানসপুত্রেরও মৃত্যু হয়েছে। অন্ধকারের আত্মজ আবার প্রবেশ করেছে অন্ধকারের অন্তঃপুরে!

যবনিকা

এখন যাঁদের দেখছি
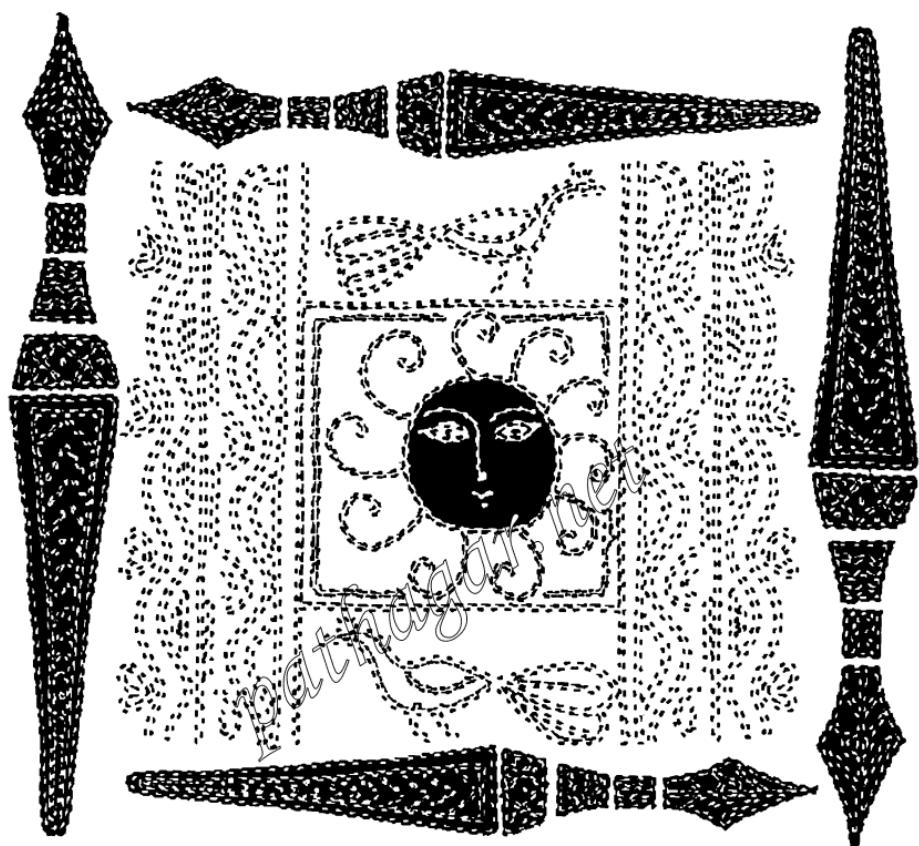
শিবদাস ভাদুড়ী

বাংলায় sport বলতে বুঝায় খেলা বা ক্রীড়া-কৌতুক। এখানে জ্ঞানীরা ও-ব্যাপারটাকে মোটেই আমল দেন না বা দিতেন না এবং জাতীয় জীবনে তার বিশেষ প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করতেন না। কিন্তু ইউরোপীয়দের, বিশেষ করে ইংরেজদের কথা স্বতন্ত্র। পুরুষোচিত দেহগঠনের তথা জাতিগঠনের উপযোগী ক্রীড়া-কৌতুকের অসামান্য সাফল্য তারা প্রকৃষ্টভাবে প্রমাণিত করেছে। ইংরেজরা বলে, আমরা ওয়াটার্লুর যুদ্ধে জিতেছি ইংল্যান্ডের ক্রীড়াক্ষেত্রেই। তারা জানে, পঙ্গু দেহে সক্রিয় মস্তিষ্কের চেয়ে সক্ষম দেহে সবল মস্তিষ্কের কার্যকারিতা হচ্ছে বেশি। তারা বড়ো বড়ো পণ্ডিত, বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক ও শিল্পীর সঙ্গে ডন ব্র্যাডম্যান প্রমুখ খেলোয়াড়দেরও স্যার উপাধিতে ভূষিত করতে ইতস্তত করে না।

ক্রীড়াক্ষেত্রে মোহনবাগানের অবদান ভারতবর্ষে অমর হয়ে থাকবে। শিবদাস ছিলেন সেই মোহনবাগানের অতুলনীয় মুকুটমণি। প্রায় চল্লিশ বছর আগে মোহনবাগান ফুটবল খেলার মাঠে বিখ্যাত একটি ইংরেজ খেলোয়াড়ের দলকে পর্যুদস্ত করে যখন শিল্ড লাভ করেছিল, তখন সারা দেশে যে বিস্ময়, আনন্দ ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল, এ যুগের বালক ও যুবকদের কথা ছেড়ে দিই, প্রৌঢ়রাও তা উপলব্ধি করতে পারবেন না। ও ঘটনাটা হয়ে দাঁড়িয়েছিল প্রায় পলাশীর যুদ্ধের প্রতিশোধের মতো। কলকাতার পথে পথে সেদিন যেসব স্মরণীয় দৃশ্য দেখেছি, তা দেখতে পাইনি ভারতের প্রথম স্বাধীনতা দিবসেও।

অতিবৃদ্ধ গিরিশচন্দ্র ঘোষ, দেহ তাঁর রোগে পঙ্গু। তিনি কারবার করেন সাহিত্য ও শিল্প নিয়ে, খেলার মাঠে কোনোদিন পদার্পণ করেছেন বলে শুনিনি। এই অভাবিত সংবাদ শুনে উচ্ছ্বসিত ভাষায় বলে উঠলেন, 'বাঃ! আমাদের আজ বড়ো আনন্দের দিন! বাংলা দেশের ছেলেদের উপর কিছু ভরসা হচ্ছে! এও যে দেখব তা ভাবিনি। ...মনে করে দ্যাখো দেখি, যে লাল মুখ দেখলে আমরা ভয়ে আঁতকে উঠি, বরাবর মনে করে থাকি আমরা চেষ্টা করলে তাদের চেয়ে intellectually বড়ো হলেও হতে পারি, কিন্তু বাহুবলে তাদের কাছে কস্মিন কালে এগুতে পারব না—শিখ গোরখা কেবল তাদের কাছে যেতে পারে—সেই জাতের মিলিটারি দলকে খেলায় পরাজিত করা কম কাজ নাকি? একটা ভয়—

একটা সঙ্কোচ—যেটা শুধু মনগড়া ছায়া—সেটা দূর হয়েছে। এখন আমরা মনে করতে পারি যে বাহুবলে আমরা তাদের সামনে এগিয়ে যেতে পারি—প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে চেষ্টা করে তাদের পরাজিত করতে পারি। বাঃ, খুব বাহাদুর! বাংলা দেশকে এই খেলায় জিতে দশ বছর এগিয়ে দিয়েছে।'

সেই বিখ্যাত খেলায় নেমেছিলেন মোহনবাগানের এগারো জন খেলোয়াড় এবং প্রত্যেকেরই ক্রীড়ানৈপুণ্য হয়েছিল চমৎকার। কিন্তু তাঁদের ভিতরে শিবদাস বিরাজ করেছিলেন মধ্যমণির মতো। মোহনবাগানকে বিজয়গৌরবে গরীয়ান করেছিল শিবদাসের প্রতিভাই।

আমি তখন গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলের ছাত্র। মার্কাস স্কোয়্যারে গিয়ে প্রতিদিন ক্রিকেট-ফুটবল-হকি খেলারও চর্চা করি কিছু কিছু। আমার তখনকার সমসাময়িক খেলোয়াড়দের মধ্যে ডোঙাবাবু, হাবুলবাবু ও স্বর্গীয় ভূতি সুকুল পরে মোহনবাগানের দলে যোগ দিয়েও যশস্বী হয়েছিলেন (শেষোক্ত দুই জন তো শিল্ড-বিজয়ী দলের মধ্যেও ছিলেন)। আর্ট স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার আগে প্রত্যহই গড়ের মাঠে গিয়ে ফুটবল খেলা দেখে আসতুম। সেই সময়ে আমার চোখের সামনেই মোহনবাগান প্রথম ট্রেডস কাপ লাভ করে বিখ্যাত হয়ে ওঠে। তখনকার দিনে ওই প্রতিযোগিতার গৌরব ছিল আজকের চেয়ে অনেক বেশি। কিন্তু মোহনবাগান উপর উপরি তিন-তিন বার ট্রেডস কাপ জিতে চ্যাম্পিয়ান আখ্যা লাভ করে। তখন তার প্রধান প্রতিযোগী ছিল মিলিটারি মেডিক্যাল ও ন্যাশন্যাল স্পোর্টিং-এর দল। প্রথমোক্ত দলটিতে খেলত অ্যাংলো ইন্ডিয়ানরা এবং তাদের উইলিয়মস নামে এক দীর্ঘদেহ যুবকের নিপুণ খেলা এখনও আমার মনে আছে। শেষোক্ত দলটির সব খেলোয়াড়ই ছিলেন বাঙালি এবং তাদের গোলরক্ষক বাঁকাবাবু তখন খুব নামজাদা। ন্যাশন্যাল-এর আর-এক খেলোয়াড় ছিলেন ক্ষেত্রবাবু। ছোটোখাটো বেঁটে মানুষটি, কিন্তু তাঁর অগ্রগতি রোধ করা ছিল অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ব্যাপার। স্মরণ আছে, এক বৎসর ন্যাশন্যাল-এর বিরুদ্ধে উপর উপরি তিন দিন খেলে মোহনবাগান জয়ী হতে পেরেছিল।

কেবল তিন বার ট্রেডস কাপ জয় করার জন্যে নয়, আর-এক বিশেষ কারণে মোহনবাগানের নাম ফিরতে লাগল লোকের মুখে মুখে। ইংল্যান্ডের অসামরিক দলের মধ্যে তখন সমধিক প্রতাপ ছিল ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাবের। তাকে যে নিম্নতর শ্রেণিভুক্ত কোনো দেশীয় দল হারিয়ে দিতে পারে, এটা ছিল একেবারেই

কল্পনার অতীত। কিন্তু মোহনবাগান সেই অসাধ্য সাধনই করলে। মিন্টোফেট-এর এক প্রতিযোগিতায় তার কাছে হেরে গেল ক্যালকাটার দল। কিন্তু মোহনবাগানের দলে একজন বাইরের খেলোয়াড় আছে, এই অজুহাতে কর্তৃপক্ষ সে খেলাটি নাকচ করে দেন।

মোহনবাগানের এইসব বিজয়-যাত্রার অধিনায়ক রূপে অতুলনীয় খ্যাতি অর্জন করলেন শিবদাস ভাদুড়ী।

সাধারণত তিনি লেফট লাইনে খেলতেন। একহারা ছিপছিপে দেহ, বিপুলবপু ইংরেজ প্রতিযোগীদের পাশে কী নগণ্যই দেখাত! কিন্তু বলের উপরে যেমন তাঁর অসামান্য দখল ছিল, তেমনি তাঁর গতিও ছিল অত্যন্ত দ্রুত। প্রতিযোগীদের অনায়াসেই এড়িয়ে একেবারে কর্নারের কাছে গিয়ে তিনি সেন্টার করতেন, নয় বলটিকে এক পদাঘাতে প্রেরণ করতেন গোলপোস্টের দিকে। লাইন থেকে তাঁর মতো আর কোনো খেলোয়াড়কে আজ পর্যন্ত এত বেশি গোল দিতে দেখিনি—অধিকাংশ খেলাতে গোল দেবার কৃতিত্ব অর্জন করতেন তিনিই। হয় নিজে গোল দিয়েছেন, নয় সুগম করে দিয়েছেন গোল দেবার পথ। তাঁর আর-একটি অদ্ভুত অভ্যাস ছিল। বেগে ছুটতে ছুটতে এগিয়ে গিয়ে গোলের দিকে বল মেরেই তিনি প্রায়ই হতেন ভূতলশায়ী। হয়তো অতিরিক্ত দ্রুতগতির টাল তিনি সামলাতে পারতেন না।

আর-একটি ব্যাপার লক্ষ করেছি। লেফট ইনে অর্থাৎ ঠিক পাশেই তাঁর দাদা বিজয়দাস ভাদুড়ী না থাকলে শিবদাসের খেলা তেমন খুলত না। দাদার সঙ্গে তাঁর ঠিক মনের মিল ছিল বলেই তাঁরা দুজনেই বুঝতেন দুজনের খেলার ধরন ও কৌশল। সামনে বাধা পেলেই দুই ভাই এমন কায়দায় পরস্পরের সঙ্গে বল বিনিময় করতেন যে, প্রতিপক্ষেরা দেখত দুই চক্ষে অন্ধকার। বিজয়দাসও একজন সুচতুর ভালো খেলোয়াড় ছিলেন।

১৯১১ খ্রিস্টাব্দের শিল্ড ফাইন্যাল-এর ছবি আজও চোখের সামনে ভাসছে। কিন্তু কী অবিশ্বাস্য কষ্ট স্বীকার করেই যে সে খেলা দেখতে হয়েছে! জানতুম মোহনবাগানের নামেই মাঠে জনতার সৃষ্টি হয় এবং শিল্ডের চরম খেলায় সেই জনতা যে বহুগুণ বেড়ে উঠবে, এটাও আমার অজানা ছিল না। বেশ সকাল সকালই মাঠে গিয়ে হাজির হলুম। কিন্তু দেখলুম এক কল্পনাতীত, অসম্ভব দৃশ্য! সমস্ত গড়ের মাঠটা পরিণত হয়েছে জনতা সাগরে, তেমন বিপুল জনতা জীবনে আর কখনো চোখে দেখিনি। খেলার মাঠের দিকেও অগ্রসর হবার কোনো

উপায়ই নেই। তখন তো গ্যালারি ছিল না, লোকে খেলা দেখত ভাড়া দিয়ে ছয় ফুট থেকে বারো-চোদ্দ ফুট উঁচু মাচানের উপরে চড়ে। নিতান্ত পলকা, বিপজ্জনক মাচান, প্রায়ই মানুষের ভার সইতে না পেরে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ত—কারুর মাথা ফাটত, কারুর হাত-পা ভাঙত। কিন্তু সে-সব মাচানেও আর তিলধারণের ঠাঁই নেই, দ্বিগুণ ভাড়ার লোভ দেখিয়েও একটুখানি পা রাখবার জায়গা সংগ্রহ করতে পারলুম না।

ইডেন গার্ডেনে ফিরে গিয়ে ম্লানমুখে জনকোলাহল শ্রবণ করছি, এমন সময়ে এক পরিচিত ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা, তিনি ওই বাগানের রক্ষক। আমার দুঃখের কথা শুনে তিনি তখনই একখানা লম্বা মই আনিয়ে বললেন, 'দক্ষিণ দিকের একটা দেবদারু গাছে চড়ে খেলা দেখুন।' অন্য কোনো উপায় না দেখে তাই করতে হল।

প্রায় আড়াই তলা উঁচু একটা ডালের উপরে বসে সানন্দে দেখলুম, জনতার ফ্রেমে বাঁধানো গোটা খেলার মাঠটি চোখের সামনে পড়ে রয়েছে। বাইরের মাঠও মানুষের মাথায় মাথায় কালো হয়ে উঠেছে, কিন্তু তখনও জনতার পর জনতার স্রোত। দেখতে দেখতে দুই পক্ষের খেলোয়াড়দের আবির্ভাব, রেফারির বংশিধ্বনি এবং খেলা হল শুরু।

মোহনবাগানের প্রতিযোগী ইস্ট ইয়র্কের দল ঠিক বিজেতার মতোই প্রবল বিক্রমে খেলতে লাগল, বাঙালিরাও বাধা দিতে লাগল প্রাণপণে। বল একবার ছুটে যায় ওদিকে, আবার ছুটে আসে এদিকে। অবশেষে মোহনবাগানের গোল থেকে বেশ খানিকটা দূরে ইস্ট ইয়র্ক পেলে একটি ফ্রি কিক। কিন্তু কী দুর্বিপাক! গোলরক্ষক হীরালালকে এড়িয়ে বল সাঁৎ করে ঢুকে গেল মোহনবাগানের গোলপোস্টের ভিতরে! বাঙালি দর্শকরা বজ্রাহত! ইংরেজরা প্রচণ্ড আনন্দে উন্মত্ত—চিৎকার করতে করতে কেউ লাফায়, কেউ শূন্যে টুপি ছোড়ে, কেউ পায়রা উড়িয়ে দেয়। কালা আদমির কাছে পরাজয়! কবি হেমচন্দ্রের ভাষায়—'নেভার, নেভার!'

কিন্তু তারপরেই পাওয়া গেল শিবদাসের অপূব প্রতিভার আশ্চর্য পরিচয়! তিনি যেন মরিয়া, তিনি যেন একাই একশো! তাঁর স্থান যে লেফট লাইনে এ কথা আর তাঁর মনে রইল না—কখনো তিনি মাঠের ডান দিকে, কখনো মাঝখানে, কখনো পুরোভাগে, কখনো এদিকে, কখনো ওদিকে, কখনো সেদিকে

এবং বলও ছুটছে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে। সর্বত্রই শিবদাস! সে যেন ইস্ট ইয়র্ক বনাম শিবদাসের খেলা! আচম্বিতে শিবদাসের পদ ত্যাগ করে একটি বল উল্কাবেগে ছুটে গেল ইস্ট ইয়র্কের গোলের দিকে এবং তখনকার সর্বশ্রেষ্ঠ গোলকিপার ক্রেসি তাকে স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারলেন না।

গোল! গো-ও-ল! গো-ও-ল! বিশাল জনসাগরের সেই গগনভেদী কোলাহল গঙ্গার ওপার থেকেও শোনা গিয়েছিল! আমার পাশের গাছের একটা উঁচু লম্বা ডালে মাথার উপরকার আর একটা ডাল ধরে শাখামৃগের মতো সারি সারি বসে ছিল দশ-বারো জন লোক। উত্তেজনায় আত্মবিস্মৃত হয়ে উপরকার ডাল ছেড়ে তারা দুই হাতে তালি দিতে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে ঝুপ ঝুপ করে মাটির উপরে গিয়ে অবতীর্ণ হল সশব্দে। তাদের আর্তনাদ শুনতে শুনতে সভয়ে আমি কোঁচা খুলে গাছের গুঁড়ির সঙ্গে নিজের দেহকে বেঁধে ফেললুম। কী জানি বাবা, বলা তো যায় না, আমারও যদি দৈবাৎ হাততালি দেবার শখ হয়!

মায়াবী শিবদাসের ইন্দ্রজাল তখনও শ্রান্ত হয়নি, তখনও তিনি বল নিয়ে দুর্বার গতিতে ছুটোছুটি করছেন এখানে-ওখানে যেখানে-সেখানে। রীতিমতো মস্তিষ্ক চালনার সঙ্গে সঙ্গে পদচালনা না করলে সেরকম খেলা কেউ খেলতে পারে না। প্রতিপক্ষের দশাসই চেহারাগুলো কিছুতেই তাঁর ক্ষিপ্রগামী ছিপছিপে দেহের নাগাল ধরতে পারছে না—যেন তিনি আলেয়া। আবার তিনি হলেন গোলের নিকটবর্তী। একজন প্রতিযোগী বাঘের মতো তাঁর সামনে এসে পড়ল, কিন্তু তিনি টুক করে বলটি তুলে দিলেন নিজেদের সেন্টার ফরোয়ার্ড অভিলাষের পায়ের উপরে এবং অভিলাষও কিছুমাত্র ভুল করলেন না।

আবার ইংরেজদের কানে ভয়াবহ সেই হাজার হাজার কণ্ঠের আকাশ ফাটানো জয়ধ্বনি ও করতালি, নর্তন ও কুর্দন! সাহেবদের আসনে সমাধির স্তব্ধতা।

বাজল খেলাশেষের বাঁশি। বাঙালির প্রথম শিল্ড অধিকার। পুরুষোচিত ক্রীড়াক্ষেত্রে কালোর কাছে গোরার প্রথম পরাজয়। তার পরের দৃশ্য বর্ণনাতীত। বাড়ি ফিরেছিলুম সারা শহর মাড়িয়ে, অনেক রাতে।

খেলার মাঠে সেদিন শিবদাসের যে-ব্যক্তিত্বের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলুম তার তুলনা পাইনি অদ্যাবধি। অবশ্য তার পরে তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত হবার ও আলাপ করবার সুযোগ পেয়েছিলুম বটে, কিন্তু ক্রীড়কের বিশেষত্ব ক্রীড়ানৈপুণ্যে, তাই তার মুখের ভাষা লিপিবদ্ধ না করলেও ক্ষতি নেই।

মরণ-বিজয়ীর দল

রবীন্দ্রনাথের মুখে তোমরা বন্দিবীর বান্দার অপূর্ব কাহিনি শ্রবণ করেছ। চিত্তোত্তেজকে গল্পের দিক দিয়ে ধরলে, ও গাথাটির তুলনা নেই।

কিন্তু এখানে সাধারণ পাঠকের কথা ছেড়ে দিচ্ছি। কারণ আমরা বলব ইতিহাসের কথা এবং রবীন্দ্রনাথের ওই কবিতাটি পাঠ করলে ঐতিহাসিকেরা খুব বেশি বোধ করি অভিভূত হবেন না।

বান্দা যে জাতির জন্যে, ধর্মের জন্যে প্রাণ বিলিয়ে দিয়েছিলেন, সে কথা কেহই অস্বীকার করতে পারবেন না। কিন্তু মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে মুসলমান নরনারী—এমনকি অজাত শিশুর উপরে তিনি যেসব অকথ্য, অমানুষিক ও পৈশাচিক অত্যাচার করেছিলেন, ইতিহাসে তা স্পষ্ট ভাষায় লেখা আছে। অধিকন্তু বান্দার অনুচরদের কবল থেকে বহু হিন্দুও মুক্তিলাভ করতে পারেননি। এই সব কথা মনে করলে বান্দার প্রতি আমাদের সহানুভূতি যথেষ্ট দুর্বল হয়ে পড়ে এবং বলতে ইচ্ছা হয় যে, বান্দা একজন সাধারণ অপরাধী ছাড়া আর কিছুই ছিলেন না।

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় উজ্জ্বল ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে, বান্দা কেমন করে স্বহস্তে নিজের পুত্রকে বধ করেছিলেন। কিন্তু ইতিহাস বলে, বান্দা স্বহস্তে পুত্রহত্যা করেননি। ব্যাপারটা হয়েছিল আরও মর্মন্তুদ, আরও ভয়ানক।

বধ্যভূমিতে (দিল্লির কুতুব মিনারের সামনে) বন্দি বান্দার কোলে তাঁর তিন বছরের ছেলেকে তুলে নিয়ে বলা হল, 'একে হত্যা করো।'

বান্দা হুকুম গ্রাহ্য করলেন না। এমন হুকুম তামিল করতে পারে না কোনো পিতাই।

ঘাতক তখন এক সুদীর্ঘ ছুরিকার আঘাতে শিশুকে হত্যা করলে এবং তার উদরের ভিতর থেকে যকৃত টেনে বের করে বান্দার মুখের ভিতরে ঢুকিয়ে দিলে।

তারপর বিষম যন্ত্রণা দিয়ে একে একে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে নিয়ে বান্দাকেও হত্যা করা হল।

কয়েক বৎসর ধরে পাঞ্জাবের দিকে দিকে বিদ্রোহের ধ্বজা তুলে রাজশক্তির

বিরুদ্ধে যুদ্ধের পর যুদ্ধ করে বান্দা শেষটা সদলবলে বন্দি হলেন গুরুদাসপুর গড়ে (১৭১৫ খ্রিঃ)। দীর্ঘ ছয় বৎসর ধরে যে বিদ্রোহী মোগল সম্রাটের বিপুল জনবল ও অর্থবল ব্যর্থ করে এসেছিলেন, তাঁর ভাণ্ডার লুণ্ঠন করে পাওয়া গেল মাত্র ১,০০০ তরবারি, ২৭৮ ঢাল, ১৭৩ ধনুক, ১৮০ বন্দুক, ১১৪ ছোরা, ২১৭ লম্বা ছুরি, খানকয় সোনার গহনা, ২৩টি মোহর ও কিছু বেশি ৬০০ টাকা। গুরুদাসপুর গড়ও মোগলরা গায়ের জোরে কেড়ে নিতে পারেনি, কেবল নির্জল উপবাসের যন্ত্রণা সইতে না পেরেই শিখেরা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছিল। কোনো কোনো ঐতিহাসিক বলেন, দুর্গের মধ্যে অবরুদ্ধ শিখদের দুর্দশা এমন চরমে উঠেছিল যে, অনেকে নাকি অন্য খাদ্যের অভাবে আপন আপন উরু থেকে মাংস কেটে নিয়ে আগুনে পুড়িয়ে তারই সাহায্যে করেছিল উদর-পূর্তি।

গুরুদাসপুর গড়ের পতনের পর যে নাটকীয় দৃশ্যের অভিনয় হয় এবং শিখদের যে অলৌকিক বীরত্বের পরিচয় পাওয়া যায়, তা নিয়ে একাধিক বিচিত্র কাব্য রচনা করা যেতে পারে। কিন্তু আমি এখানে কবিতা কিংবা অত্যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করব না। সাধাসিধে ভাষায় সোজাসুজি মূল ঘটনাগুলি বর্ণনা করে যাব। দেখবেন, তার ভিতরেই অসাধারণ রূপ ফুটে উঠে হৃদয়কে অভিভূত করে দেবে।

অগুনতি শিখকে হত্যা করা হল। সাত শত চল্লিশ জন শিখ হল বন্দি। দিল্লির রাজ-দরবার থেকে হুকুম এল—ছত্রপতি শিবাজির পুত্র রাজা শম্ভুজিকে বন্দি করে যেভাবে রাজধানীতে নিয়ে আসা হয়েছিল, বান্দা ও তাঁর অনুচরদেরও সেইভাবে দিল্লিতে নিয়ে আসতে হবে।

নির্দিষ্ট দিনে দিল্লি দুর্গের লাহোরি ফটক থেকে আমেদাবাদ পর্যন্ত কয়েক মাইল-ব্যাপী পথের দুই ধার জুড়ে দাঁড়াল অস্ত্রধারী সৈনিকরা এবং পথের উপর ভেঙে পড়ল বিপুল জনতা-সাগরের তরঙ্গের পর তরঙ্গ।

প্রথমেই দেখা গেল, হাতির উপরে লোহার খাঁচা এবং তার ভিতরে বন্দি বান্দা। অঙ্গে তাঁর স্বর্ণখচিত সমুজ্জ্বল ও বহুমূল্য পোশাক। পিছনে দাঁড়িয়ে লৌহবর্মধারী মোগল সেনানী, হাতে তার নগ্ন তরবারি। বান্দার হাতির সুমুখে দেখা যাচ্ছে শত শত বংশদণ্ডের উপরে নিহত শিখ যোদ্ধাদের ছিন্ন মুণ্ড, তাদের লম্বা চুলগুলো মুখের উপরে পড়ে দুলছে ঝালরের মতো।

বান্দার হাতির পিছনে পিছনে আসছে দলে দলে উট। প্রত্যেক উটের উপরে

বসে আছে দুজন করে শিখ বন্দি। তাদের পরিয়ে দেওয়া হয়েছে বিসদৃশ পোশাক, অনেককে দেখতে হয়েছে পশুর মতো।

জনতার মধ্যে জাগল ঘন ঘন জয়ধ্বনি। বন্দিদের লক্ষ্য করে অনেকে টিটকারি দিতে লাগল। কিন্তু বন্দিরা তা শুনে বিচলিত হল না। মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও তারা কেউ ভীত ভাব প্রকাশ করলে না, বরং অনেকের মুখ দেখলে মনে হয় যেন তারা সানন্দে চলেছে কোনো উৎসব সভার দিকে।

কেউ ঠাট্টা করলে তারা নির্ভয়ে পাল্টা জবাব দিতেও ছাড়লে না। কেউ তাদের 'খুন করব' বলে ভয় দেখালে তারা বলে, 'মারো, আমাদের মেরে ফ্যালো—মৃত্যুকে আমরা ভয় করব কেন? কেবল ক্ষুধাতৃষ্ণা সইতে না পেরেই আমরা তোমাদের হাতে ধরা দিয়েছি। আমাদের সাহস আর বীরত্ব কি তোমরা জানো না?'

স্থির হল, প্রতিদিন একশো জন করে বন্দিকে বধ করা হবে।

বধ্যভূমিতে দর্শকদের দলে উপস্থিত ছিলেন কয়েকজন ইউরোপীয় ভদ্রলোকও। সকলেই বলেন, মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েও শিখ বন্দিরা যে ধীরতা, দৃঢ়তা ও বীরত্বের পরিচয় দিলে, তা বিস্ময়কর!

বন্দিদের বলা হল, 'জীবন ভিক্ষা চাও তো মুসলমান হও।'

প্রত্যেক বন্দি এককণ্ঠে বললে, 'মুণ্ড দেব, ধর্ম দেব না।'

তাদের কারুর এতটুকু মৃত্যুভয় নেই, ঘাতককে ডাকতে লাগল 'মুক্তিদাতা' বলে। সকলে মহা আনন্দে ঘাতকের সামনে ছুটে গিয়ে চিৎকার করে বলতে লাগল, 'মুক্তিদাতা, আগে আমাকে হত্যা করো!'

সাড়ে সাত শত শিখ বন্দি। প্রতিদিন নিয়মিতভাবে তরবারি শূন্যে ওঠে চকমকিয়ে এবং পরমুহূর্তে নীচে নেমে উড়িয়ে দেয় এক এক বীরের মুণ্ড। কাটতে কাটতে তরবারি ভোঁতা হয়ে যায়, আবার তাকে শানিয়ে নিতে হয়। সাত শত চল্লিশ জন বন্দির ভিতর থেকে একজন মাত্র মৃত্যুভীত কাপুরুষকে পাওয়া গেল না। সাত শত চল্লিশ মহাবীর একে একে মুণ্ড দিলে, ধর্ম দিলে না। সাত শত চল্লিশ মহাবীরের রক্ত শোষণ করে বধ্যভূমি হয়ে উঠল বীরভূমি।

বান্দা তো দলের নেতা, সব দিক বুঝে প্রস্তুত হয়েই তিনি ধারণ করেছিলেন বিদ্রোহের পতাকা। কিন্তু এই সাত শত চল্লিশ জন শিখ, এদের অধিকাংশই-সাধারণ লোক—অনেকেই হয়তো নিরক্ষর ও চাষাভুষো শ্রেণির। তবু এদের

কেউ ধর্মের বিনিময়ে জীবন ভিক্ষা করলে না। বান্দার মৃত্যুর চেয়েও এদের আত্মদান অধিকতর গৌরবময়।

প্রতিদিন উচ্চ হয়ে ওঠে মৃতদেহের স্তূপ। মৃত্যুর পরেও বীরদেহগুলির উপরে কিছুমাত্র সম্মান প্রকাশ করা হল না। গাড়িতে করে দেহের স্তূপ নগরের বাইরে চালান করা হল। তারপর প্রত্যেক দেহকে ঝুলিয়ে দেওয়া হল গাছের ডালে।

কিন্তু এর চেয়েও স্মরণীয় ঘটনা আছে। আমরা মরণের ভয়ের কথাই জানি, মরণের আনন্দের কথা বড়ো একটা শোনা যায় না। আজীবন প্রাণ বাঁচাতে বাঁচাতেই আমাদের প্রাণান্ত হয়, জীবনকে ঘৃণা করবার ও মরণকে ভালোবাসবার আশ্চর্য সুযোগ হয় কয়জনের?

কুতব-উল-মুল্ক ছিলেন তখন ভারত সম্রাটের উজির। তিনি হচ্ছেন সেই ইতিহাস বিখ্যাত সৈয়দ ভ্রাতৃযুগলের অন্যতম—যাঁদের প্রভাবে বা কৃপা কটাক্ষে ময়ূর-সিংহাসনের উপর বসেছেন সম্রাটের পর সম্রাট। কুতব-উল-মুল্কের হিন্দু দেওয়ানের নাম রতনচাঁদ। তিনি উজিরের বিশেষ প্রিয়পাত্র।

এক নারী রতনচাঁদের কাছে গিয়ে ধর্না দিয়ে পড়ল।

নারী বললে, 'হুজুর, আমি অসহায়া বিধবা। আমাকে দয়া করুন।'

রতনচাঁদ জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে তুমি?'

—'আমি এক বালক শিখ-বন্দির মা।'

—'আমার কাছে এসেছ কেন?'

—'আমার বালক পুত্রের উপরে প্রাণদণ্ডের হুকুম হয়েছে। ওই ছেলেটি ছাড়া এই দুনিয়ায় আমাকে আর দেখবার লোক কেউ নেই। সে মারা পড়লে আমার কী গতি হবে হুজুর?'

—'তোমার ছেলেকে বাঁচাবার ক্ষমতা আমার নেই। সে বালক হতে পারে, কিন্তু রাজবিদ্রোহী।'

—'হুজুর, আমার ছেলে রাজবিদ্রোহী নয়। এমনকি সে গুরু বান্দার শিষ্যও নয়। তার বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগ মিথ্যা। তাকে ভুল করে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। হুজুর, তাকে রক্ষা করে এই অনাথাকে রক্ষা করুন!'

অবশেষে মায়ের সেই করুণ ক্রন্দন আর সহ্য করতে না পেরে দেওয়ান রতন চাঁদ তার আরজি নিয়ে গেলেন উজিরের কাছে। প্রিয়পাত্রের অনুরোধ এড়াতে না পেরে কুতব-উল-মুল্ক সেই বিধবা নারীর বালক-পুত্রকে জীবন ভিক্ষা দিলেন।

বেচারা মা আনন্দের অশ্রুজল ফেলতে ফেলতে উজিরের আদেশ পত্র নিয়ে ছুটল কোতোয়ালের কাছে।

বন্দিকে কারাগারের বাইরে এনে কোতোয়াল বললে, 'তুমি মুক্ত।'

বালক সবিস্ময়ে বললে, 'আমি মুক্ত? না না, এ অসম্ভব!'

তার মা কাছে এগিয়ে এসে বললে, 'হ্যাঁ বাছা, তুমি মুক্ত। তুমি তো বিদ্রোহী গুরুর শিষ্য নও, তাই আমার কথা শুনে উজিরমশাই তোমায় ছেড়ে দিয়েছেন!'

ভয়াবহ মৃত্যুকে পিছনে রেখে সামনে এসে দাঁড়াল নবযৌবনের উদ্দাম জীবন। নূতন আশায় উচ্ছ্বসিত জননীর স্নেহহাসিমাখা মুখ। কিন্তু সেদিকে না তাকিয়ে প্রাণপণে হৃদয়ের আবেগ দমন করে বালক কঠিন স্বরে কোতোয়ালকে জিজ্ঞাসা করলে, 'কে এই নারী!'

কোনো জননীর সামনে কোনো পুত্রের মুখে এমন নিষ্ঠুর কথা বোধহয় আর কখনো উচ্চারিত হয়নি। মা তো একেবারে অবাক! হয়তো ভাবলেন, জেলখানায় গিয়ে মৃত্যুভয়ে ছেলের মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে।

কোতোয়াল বিস্মিত কণ্ঠে বললে, 'সে কি, ইনি যে তোমার মা!'

বালক অবিচলিত কণ্ঠে বললে, 'না, এই নারীকে আমি চিনি না।'

—'ইনি তোমার মা নন?'

—'না। ইনি কী চান তাও আমি জানি না। এঁর কথা সত্যি নয়। আমি বিদ্রোহী, আমি গুরুজির শিষ্য। গুরুজির সঙ্গে আমিও প্রাণ দিতে চাই। জয়, গুরুজির জয়!'

বালক জীবন ভিক্ষা নিলে না, জীবন দান করলে।

পৃথিবীর কোনো দেশের ইতিহাসে আছে এর চেয়ে অদ্ভুত কাহিনি?

দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

একদিন 'বসুমতী' কার্যালয়ে গিয়েছি। সম্পাদকের ঘরে প্রবেশ করে দেখলুম টেবিলের ধারে তাঁর সামনে বসে আছেন জনৈক হৃষ্টপুষ্ট প্রাচীন ভদ্রলোক। মার্জিত চেহারা, মুখে-চোখে বিশিষ্টতার স্পষ্ট পরিচয়। চিনতে পারলুম না বটে, কিন্তু তাঁকে প্রফেসর বলেই মনে হল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখেছি, প্রফেসরদের চিনিয়ে দেয় কেবল তাঁদের মুখ। বহু কবি ও লেখক বর্ণচোরা চেহারার অধিকারী।

দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয়কুমার বড়াল, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও যতীন্দ্রমোহন বাগচী প্রভৃতিকে কেউ চেহারা দেখে কবি বলে ধরতে পারত না। জীবিত কবিদের মধ্যেও এমন লোকের অভাব নেই। যেমন করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, মোহিতলাল মজুমদার ও শ্রীকালিদাস রায় প্রভৃতি।

সম্পাদক শুধালেন, 'হেমেনদা, এঁকে চেনেন?'

আমি মাথা নেড়ে জানালুম, না।

—'ইনি হচ্ছেন ডক্টর সুশীলকুমার দে।'

সুশীলকুমার! সানন্দে ঝুঁকে পড়ে তাঁর বাহুমূল ধরে বললুম, 'ইনি যে আমার প্রথম যৌবনের বন্ধু!'

চোখের সুমুখ থেকে সরে গেল কিছু কম চার যুগের পুরাতন পর্দা। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যখন সবে আত্মপ্রকাশ করেছেন, সেই সময়ে 'যমুনা' পত্রিকার বৈঠকে সুশীলকুমারের সঙ্গে প্রথম দেখা হয়। তখনও তিনি কৃতবিদ্য হলেও প্রখ্যাত ছিলেন না। তাঁর নাম বিদ্বজ্জনসমাজে সুপরিচিত।

সুশীলকুমার সহাস্যে বললেন, 'আমাকে চিনতে তো পারেননি?'

বললুম, 'আমরা ছিলুম যুবক, আজ হয়েছি বৃদ্ধ। এত কালের অদর্শনের পর আর কি মানুষ চেনা যায়?'

সুশীলকুমার 'ভারতী'র বৈঠকের কথা তুলে বললেন, 'অমন চমৎকার বৈঠক আর হবে না।'

সত্য কথা। আর হবে না। আজকের তরুণ সাহিত্যিকরা উচিত মতো একজোট হবার অভ্যাস ক্রমেই বেশি করে হারিয়ে ফেলছেন। 'যমুনা', 'মর্মবাণী' ও বিশেষ করে 'ভারতী' পত্রিকার সাহিত্য-বৈঠকেই আমি আধুনিক কালের অধিকাংশ সাহিত্যিক ও শিল্পীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করার সুযোগ পেয়েছিলুম। এবং সেইজন্যেই আমার এই আলোচনায় বার বার ওই সব বৈঠকের প্রসঙ্গ এসে পড়ে।

'ভারতী' কার্যালয়ের ওই বৈঠকেই স্বর্গীয় সুলেখক সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে একটি তরুণ যুবক মাঝে মাঝে আসতে লাগলেন। নাম তাঁর দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী। শুনলুম, তিনি তাজহাটের রাজার ভাগিনেয়। চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করেন। অবনীন্দ্রনাথের ছাত্র। তাঁর চেহারা, ভাবভঙ্গি ও কথাবার্তা সপ্রতিভ।

দেবীপ্রসাদের দেহ দেখেই বুঝতে বিলম্ব হল না যে, তিনি নিয়মিতভাবে ব্যায়াম অভ্যাস করেন। বাংলা দেশের অধিকাংশ কলমবিলাসী কবি ও শিল্পীদের

ঠুনকো দেহ দেখলেই সন্দেহ হয়, যেন তাঁরা তথাকথিত চকোরের মতো কেবল জ্যোৎস্না পান করেই বেঁচে থাকতে চান। কারুর কারুর দেহ আবার দস্তুরমতো মেয়েলি। তাঁরা কথা কন নাকি সুরে, হাসেন মুচকি হাসি, চলেন কোমর দুলিয়ে। কিন্তু দেবীপ্রসাদের মতো বলিষ্ঠ, পেশিবদ্ধ ও পুরুষোচিত চেহারা বাঙালি কবি ও শিল্পীদের মধ্যে আমি আর দ্বিতীয় দেখিনি। রাস্তা দিয়ে যখন হাঁটতেন, অপরিচিত লোকেরা নিশ্চয়ই তাঁকে পলোয়ান ছাড়া আর কিছু বলে মনে করতে পারত না।

এক-একদিন আমাদের অনুরোধে তিনি গায়ের জামা খুলে ফেলে যখন মাংসপেশির খেলা দেখাতেন, আমরা চমৎকৃত হয়ে তাকিয়ে থাকতুম তাঁর পরিপুষ্ট দেহের দিকে। কণ্ঠের, বক্ষের, উদরের ও বাহুর সমস্ত মাংসপেশিই ছিল তাঁর আজ্ঞাধীন।

যে হাতে গদাই মানায় বেশি, সেই হাতই সুপটু ছিল সূক্ষ্ম তুলিকা-চালনায়, আবার সেই হাতেই একদিন সবিস্ময়ে দেখলুম ছোট্ট একটি বাঁশের বাঁশি!

বললুম, 'আরে দেবী, তুমি আবার বাঁশি বাজাতেও পারো নাকি?'

দেবীপ্রসাদ হেসে বললেন, 'পারি।'

—'বাজাও তো, শুনি।'

বিনাবাক্যব্যয়ে মাথাটি কাত করে তিনি দিলেন বাঁশিতে ফুঁ। মুরলীগুঞ্জনে খেলা শুরু হল সপ্তগ্রামের। সেই বিচিত্র ধ্বনিতরঙ্গের মধ্যেও আবিষ্কার করলুম একজন অসামান্য শিল্পীকে। তারপর একাধিক গানবাজনার আসরে শুনেছি দেবীপ্রসাদের বাঁশের বাঁশি। সৌখিন হলেও তিনি নিপুণ বংশীবাদক বলে খ্যাতিলাভ করেছিলেন।

পুরুষোচিত দেহের মধ্যে থাকা উচিত পুরুষোচিত মন। তাই পরে তিনি বন্দুক ধারণ করেছেন শুনে বিস্মিত হইনি। শিকারির বেশে বনে বনে ঘুরে বেড়ান। হাতি-গন্ডার হয়তো হাতের কাছে পাননি, তবে একাধিক ব্যাঘ্রপুঙ্গব পঞ্চত্বলাভ করেছে তাঁর হাতে। এবং নিজেই তিনি দিয়েছেন এ সন্দেশ। মুখে নয়, বন্দুক চালনার পর লেখনীচালনা করে। তাঁর লেখা শিকারকাহিনি আমার ভালো লাগে। পরিণত বয়সে লেখক রূপেও আত্মপ্রকাশ করে তিনি রচনাকার্যে নিযুক্ত হয়েছেন। কেবল শিকারকাহিনি নয়, গল্প ও উপন্যাসও। তাঁর ভাষা জোরালো।

প্রথমে সকলে তাঁকে গ্রহণ করেছিল উদীয়মান চিত্রকর বলে। তারপর সকলে জেনেছে তিনি একজন উচ্চশ্রেণির ভাস্কর। তাহলে দেখা যাচ্ছে মানুষটি বহুরূপী। চিত্রকরের তুলি, ভাস্করের বাটালি, লেখকের কলম, সঙ্গীতবিদের বাঁশি, ব্যায়ামবীরের মুগুর ও শিকারির বন্দুক এ সবেরই সদ্ব্যবহার করতে পারেন দেবীপ্রসাদ। একাধারে তাঁর মনের উপরে কাজ করেছে ক্ষত্রধর্মের সঙ্গে চিত্র, ভাস্কর্য, সাহিত্য ও সংগীত প্রভৃতি চারুকলা। ঠিক এই শ্রেণির শাক্ত ও সব্যসাচী শিল্পী বাংলা দেশে তো দেখাই দেননি, ভারতের অন্য কোনো প্রদেশেও আছেন বলে মনে হয় না।

চিত্রকলায় কয়েকজন প্রথম শ্রেণির বাঙালি শিল্পীর নাম করা যায়। কিন্তু ভাস্কর্যকলা নিয়ে অবহিতভাবে সাধনায় নিযুক্ত হয়ে আছেন, এমন কোনো উচ্চশ্রেণির বাঙালি শিল্পীর নাম সেদিন পর্যন্ত আমরা জানতুম না, যদিও শখের খাতিরে এ বিভাগে মাঝে মাঝে হস্তক্ষেপ করেছেন, কোনো কোনো চিত্রশিল্পী। যেমন শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ। কিন্তু সে হচ্ছে খেলাচ্ছলে কোনো-কিছু গড়ে তোলা এবং তাও টুকিটাকি ভাস্কর্যের কাজ।

অনেক কাল আগে তাই প্রথম যেদিন শুনলুম, দেবীপ্রসাদ ভাস্কর্যকলাকেও বিশেষভাবে অবলম্বন করেছেন, তখন মনে জেগেছিল আনন্দের সাড়া। দেবীপ্রসাদের আমন্ত্রণে একদিন সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর বাড়িতে গিয়ে হাজির হলুম। তাঁর হাতের কী কী কাজ দেখেছিলুম তা আর মনে নেই, তবে প্রমাণ নরদেহের চেয়ে ঢের বেশি উঁচু একটি মূর্তির কথা স্মরণ হচ্ছে। সেটি তাজহাটের রাজার—অর্থাৎ দেবীপ্রসাদের মাতুলের প্রতিমূর্তি।

তারপর থেকে আজ পর্যন্ত ছবি আঁকার সঙ্গে সঙ্গে তিনি গড়েছেন মূর্তির পর মূর্তি। একটু আগেই তাঁকে বলেছি সব্যসাচী। সত্যই তাই। তিনি সব্যসাচীর মতোই দুই দক্ষ হাতে কাজ করতে পারেন। ডান হাতে ধরেন তুলি এবং বাম হাতে ধরেন বাটালি। আজ তাঁর ভারতজোড়া নাম। তিনিই হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি ভাস্কর। তাঁর কৃতিত্বের জন্যে আমরা অনায়াসেই গর্ব অনুভব করতে পারি।

কলকাতায় বার্ষিক শিল্পপ্রদর্শনী হয়। সেখানে গেলে বোঝা যায়, ভাস্কর্যকলার দিকে আজকাল তরুণ বাঙালি শিল্পীদের দৃষ্টি হয়েছে অধিকতর আকৃষ্ট। ভাস্করদের সংখ্যা অবশ্য বেশি নয়, দুই-চারি জনের দুই চারিটি হাতের কাজের নমুনা থাকে মাত্র। তবু এটা আশাপ্রদ লক্ষণ বলে ধরে নিতে পারি।

কিন্তু মনে হয়, আমাদের তরুণ ভাস্কররা গোড়াতেই গলদ করে বসতে চান। কারণ অন্তর্মুখী নয় তাঁদের দৃষ্টি, তা হচ্ছে বহির্মুখী। পরিকল্পনার বিষয়বস্তু সংগ্রহ করেন না তাঁরা আপন আপন মনের ভিতর থেকে স্বাধীনভাবে। তাঁরা করতে চান অনুকরণ। তাঁদের চোখের সামনে সর্বদাই বিরাজ করে এপস্টিন, জ্যাডকাইন, বার্বারা হেপওয়ার্থ, মুর, লিয়ন আন্ডারউড, জন স্কিপিং ও রিচার্ড বেডফোর্ড প্রমুখ অতি আধুনিক ভাস্করদের কাজ। তাঁদের চোখ দিয়ে তাঁরা গোড়া থেকেই দেখতে শুরু করেছেন মানুষ ও পৃথিবীকে। অথচ ভিতরের কথা কিছু বুঝেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না।

বাংলার আধুনিক ভাস্কর্যকলা নবজাত শিশু, এখনও সে ভালো করে চলতে শেখেনি কিংবা কোনোরকম ঐতিহ্য সৃষ্টি করতে পারেনি। কিন্তু এর মধ্যেই সে যদি নিজের মায়ের কথা ভুলে বিদেশিনী বিমাতার স্তন্যপান করতে উদ্যত হয়, তাহলে নিশ্চয়ই তার কপালে নেই কল্যাণময়ী কলাকমলার আশীর্বাদ লাভ। আর্ট হচ্ছে সার্বজাতিক—এই একেলে ভুয়ো ফতোয়ার কোনো মূল্য নেই। নিজের জাতীয়তা ভুললে কোনো দেশের কোনো আর্টই আপন পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে সর্বজাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে না। আফ্রিকার বেনিন অঞ্চলের নিগ্রো ভাস্কর্যের কথা অর্ধশতাব্দী আগেও অবিদিত ছিল। সেখানকার অসভ্য শিল্পীরা গ্রিক বা মধ্য বা আধুনিক যুগের কোনো ভাস্কর্যেরই নমুনা দেখেনি। তাদের প্রত্যেকেই পরিস্ফুট করতে চেয়েছে বিশেষ এক আদর্শে স্বকীয় পরিকল্পনাকেই। এই যে বিশেষ আদর্শ, এটা আসেনি তাদের দেশের বাহির থেকে এবং এইজন্যেই এর মধ্যেই আছে তাদের আর্টের জাতীয়তা। আজ তাই বেনিন ভাস্কর্য করতে পেরেছে পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ। উপরন্তু তার দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছেন আধুনিক পাশ্চাত্য ভাস্কররাও। ঠিক অনুরূপ কারণেই প্রাচীন ভারতীয় ভাস্কর্যও প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে পাশ্চাত্য শিল্পীদের মনের উপরে। তাকে অল্পবিস্তর অবলম্বন করে একাধিক বৈদেশিক শিল্পী আধুনিক যুগের উপযোগী মূর্তিগঠনও করেছেন। দুঃখের বিষয়, আমাদের আধুনিক শিল্পীদের দৃষ্টি এই সত্যটা দেখেও দেখতে পায় না।

বলেছি দেবীপ্রসাদের পুরুষোচিত দেহ ও পুরুষোচিত মন। তাঁর চিত্র ও ভাস্কর্যের মধ্যেও প্রকাশ পায় এই পৌরুষের ভাব। আর্টের ভিতর দিয়েও তিনি করতে চান শক্তিসাধনা। তাঁর আঁকা ছবিগুলির রেখার টানে ও বর্ণবিন্যাসে

থাকে যে বলিষ্ঠতা, যে-কোনো সাধারণ দর্শকও তার দ্বারা অভিভূত না হয়ে পারবে না। এইখানেই তাঁর প্রধান বিশিষ্টতা, যা অন্য কোনো ভারতীয় শিল্পীর কাজে আবিষ্কার করা সহজ নয়।

দেবীপ্রসাদ মাদ্রাজের সরকারি চিত্রবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ। তাঁর কথা সর্বদা মনে পড়লেও তাঁর সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হবার সুযোগ আর ঘটে ওঠে না। তাই তিনি কলকাতায় এসেছেন শুনে কিছুকাল আগে এক সন্ধ্যায় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলুম। ভেবেছিলুম দুজনে একান্তে বসে অতীত স্মৃতির রোমন্থনে খানিকটা সময় কাটিয়ে দেব। কিন্তু তা আর হল না, কারণ গিয়ে দেখলুম, তাঁর ঘরে বসে গেছে একটি সাহিত্য সভা। উপস্থিত আছেন শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল), শ্রীসজনীকান্ত দাস, শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর (ইনিও কবি ও চিত্রশিল্পী), শ্রীপবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় এবং আরও কেউ কেউ। অতীতের কথা আর উঠল না, বর্তমানকে নিয়েই আলাপ-আলোচনা ও হাস্যপরিহাস চলতে লাগল—সঙ্গে সঙ্গে পানভোজন। খাবারের পর খাবার আসে—রীতিমতো দীয়তাম্ ভুজ্যতাম্। মুখ বন্ধ করে ও ডান হাতের ব্যাপার সেরে যখন বাড়ির দিকে ফিরলুম তখন নিশুতি রাত। নির্জন, নিস্তব্ধ, নিদ্রামগ্ন শহর। দেবীপ্রসাদ অতিথি সৎকার করতেও জানেন।

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

'ভারতী'র আসরে তখনও নেবেনি সন্ধ্যাদীপ। বৈকাল থেকে নিত্য বসে আমাদের বৈঠক। আমাদের দেহ বাস করত মাটির পৃথিবীতে, কিন্তু আমাদের মন বিচরণ করত চারুকলার রম্য ভুবনে।

কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটের একটি মনিহারির দোকানে দাঁড়িয়ে এটা-ওটা-সেটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছি, এমন সময়ে পাশে এসে দাঁড়ালেন একটি যুবক। রংটি কালো হলেও মুখশ্রী চিত্তাকর্ষক। আমার দিকে অল্পক্ষণ তাকিয়ে থেকে তিনি শুধোলেন, 'আপনিই তো হেমেন্দ্রবাবু?'

আমি বললুম, 'হ্যাঁ।'

যুবক বললেন, 'আমার নাম শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়।'

অচেনা নাম নয়। মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর রচিত কয়লাকুঠি সংক্রান্ত গল্পগুলি তখন প্রশস্তি লাভ করেছে পাঠকসমাজে। কয়লার খনি এবং সেখানকার হাজার হাজার কুলিকে আমরাও অনেকেই দেখেছি। কিন্তু সে দেখা চোখের দেখা, মনের দেখা নয়। কুলির কাজ করে যেসব নর-নারী, তাদের দৈনন্দিন জীবনের ছোটো ছোটো সুখদুঃখ আশা ও আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে আমরা কেহই পরিচিত হতে পারিনি—পরিচিত হবার জন্যে আগ্রহ প্রকাশও করিনি। প্রবীণ লেখকরা উচ্চতর শ্রেণির নরনারীদের নিয়ে রোমান্স রচনায় নিযুক্ত হয়ে থেকেছেন এবং নবীন লেখকরা মানুষের প্রথম রিপুটির উপরে বিসদৃশ ও অশোভন ঝোঁক দিয়ে পাঠক আকর্ষণের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু দরদী প্রাণ ও শিল্পীর দৃষ্টি নিয়ে শৈলজানন্দ প্রবেশ করেছেন কয়লাকুঠিতে ও কুলিদের পল্লিতে। বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন সেখানকার জীবনযাত্রা, সেখানকার মেঘ ও রৌদ্র, অশ্রু ও হাসির ছন্দ। এমনকি কয়লাকুঠির চলতি ভাষা পর্যন্ত কণ্ঠস্থ করে ফেলতে ত্রুটি করেননি। হাতের ক্যামেরায় তুলে নেওয়া যায় কুলিদের জনবহুল বস্তির হুবহু ফোটো। কিন্তু সেই সঙ্গে কুলিদের চিত্তবৃত্তি দেখাতে পারে কেবল মনের ক্যামেরাই। শৈলজানন্দও ব্যবহার করেছেন শেষোক্ত ক্যামেরা। তাঁর সুনির্বাচিত শব্দচিত্রে কুলিজীবনের যে সব বিচিত্র ও অপূর্ব দৃশ্য আমরা দেখেছি, আজ পর্যন্ত তা দেখাতে পারেননি আর-কোনো বাঙালি লেখক। বাইরের ফোটো, ভিতরের ফোটো। বাস্তবতার মধ্যে রোমান্স। কালো কয়লার গুঁড়োর ভিতরে আলো করা হিরার টুকরো। শৈলজানন্দ কুলিবস্তির নিরতিশয় দারিদ্র্যের মধ্যেও আবিষ্কার করেছেন অভাবিত সাহিত্যসম্পদ।

শৈলজানন্দ নিজেই তাঁর আত্মপরিচয়। তখন আমি বললুম, 'আপনার গল্প আমি পড়েছি। আমার খুব ভালো লাগে।'

শৈলজানন্দের সঙ্গে সেই হল আমার প্রথম পরিচয়।

কয়লাখনির কুলিজীবন নিয়ে তিনি 'মাসিক বসুমতী'তে প্রথম যে গল্প লিখেছিলেন, তখন তাঁর বয়স হবে কত? বাইশ কি তেইশের বেশি নয়। কিন্তু সেই বয়সেই লেখনীধারণ করে তিনি দেখাতে পারতেন যথেষ্ট মুনশিয়ানা। অচিন্ত্য, প্রেমেন ও বুদ্ধদেব প্রভৃতির নাম তখনও অপরিচিত। শৈলজানন্দ তাঁদের চেয়ে বয়সেও বড়ো এবং নামও কিনেছেন তাঁদের আগে।

'কল্লোল' পত্রিকায় আত্মপ্রকাশ করে তিনি খ্যাতি লাভ করেননি বটে, কিন্তু

কিছুকালের জন্যে তিনিও 'কল্লোলে'র দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর ছিল অতিশয় অর্থের অপ্রতুলতা এবং সে অনটন মেটাবার সাধ্য ছিল না 'কল্লোলে'র। কাজেই অবশেষে দলছাড়া হয়ে তিনি 'কালিকলমের' সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন এবং ঠিক ওই কারণেই তাঁর পদানুসরণ করেন প্রেমেন্দ্রও।

তাঁর কয়লাকুঠির গল্পগুলি পাঠ করে আমরা পরস্পরের মধ্যে বলাবলি করতুম, এই একজন শক্তিশালী নূতন লেখক দেখা দিয়েছেন, যাঁর মধ্যে আছে প্রভূত সম্ভাবনার ইঙ্গিত। বাস্তবিক পাশ্চাত্য দেশের বহু লেখকই অনুরূপ শক্তিপ্রকাশ করে একসঙ্গে পেয়েছেন লক্ষ্মী ও সরস্বতীর আশীর্বাদ। ডবলিউ ডবলিউ জেকব কেবল সমুদ্রের নাবিকদের গল্প লিখেই রোজগার করেছেন কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা। তিনি পরলোকে যান ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে ঊনআশি বৎসর বয়সে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিশ্চিন্ত জীবনযাপন করে গিয়েছেন একমাত্র সাহিত্যের দৌলতেই। ওখানে আরও কেউ কেউ খ্যাতিমান ও ধনবান হয়েছেন ইহুদিদের কিংবা নিগ্রোদের জীবনীচিত্র দেখিয়ে।

শৈলজানন্দও বাংলা কথাসাহিত্যে খুলেছিলেন একটি সম্পূর্ণ নূতন বিভাগ। তাঁর কয়লাকুঠির গল্পগুলি পড়ে লোকে তাঁকে বাহবা দিয়েছিল খুব, কিন্তু টাকা দেয়নি বেশি। প্রথম বয়স থেকেই অর্থকৃচ্ছ্রতায় তিনি দারুণ কষ্টভোগ করেছেন। ব্রাহ্মণের ঘরের শিক্ষিত যুবক, বাস করতে হয়েছে বস্তিতে। ভাত-কাপড়ের জন্যে খুলতে হয়েছে পানের দোকান। লেখনীধারণ করে নাম কিনলেন, অবস্থারও উন্নতি হল অল্পবিস্তর, কিন্তু সে উন্নতিও উল্লেখযোগ্য নয়। যৎকিঞ্চিৎ ঘরে এলেও ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না।

এই তো আমাদের সাহিত্যিকদের অবস্থা। এইজন্যেই বাংলার কবিকে আক্ষেপ করে বলতে হয়েছে :

'হায় মা ভারতি, চিরদিন তোর
কেন এ কুখ্যাতি ভবে?
যে জন সেবিবে ও পদযুগল,
সেই সে দরিদ্র হবে।'

ইউরোপের কবির মুখে এমন আক্ষেপ মানায় না। সেখানে সাহিত্যসাধনার সঙ্গে নিশ্চিত দারিদ্র্যের সম্পর্ক নেই।

'কল্লোল' বন্ধ হল, সম্পাদক দীনেশরঞ্জন ছুটলেন সিনেমা জগতে অর্থের

সন্ধানে। তাঁর আগেই স্বর্গত 'কল্লোলে'র অন্যতম সম্পাদক গোকুল নাগ এদিকে পথপ্রদর্শন করেছিলেন। তিনি আরও কয়েকজন কর্মীর সঙ্গে Photoplay Syndicate of India নামে একটি চিত্র-সম্প্রদায় গঠন করে Soul of a Slave নামে একখানি চমৎকার ছবি তুলেছিলেন এবং সেই ছবিতে পর্দার গায়ে প্রথম দেখা দেন শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী। গোকুলবাবু (তিনি ডক্টর শ্রীকালিদাস নাগের ভ্রাতা) অকালেই পরলোকগমন করেন, তাই চিত্রজগতে আর কোনো উল্লেখযোগ্য দান রেখে যেতে পারেননি। কিন্তু বাংলা দেশের সাহিত্যিকদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথমে যোগ দেন চলচ্চিত্রশালায়। তারপর একে একে অনেক লেখকই ওইদিকে ছুটেছেন মধুলুব্ধ মধুকরের মতো। শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী, দীনেশরঞ্জন দাস, 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিউ'য়ের বর্তমান সম্পাদক শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র, শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, 'নাচঘরে'র সহকারী সম্পাদক শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায়, শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য ও শ্রীপ্রণব রায় প্রভৃতি। শ্রীদেবকী বসুও প্রথম জীবনে ছিলেন মফস্সলের এক পত্রিকার সহকারী সম্পাদক। আমিও একসময়ে আকৃষ্ট হয়েছিলুম সিনেমার দিকে। বৎসর দুই হাতেনাতে কাজও করেছি নানা বিভাগে। পরিচালকরূপে পত্রিকায় একবার আমার নামও বিজ্ঞাপিত হয়েছিল। কিন্তু সিনেমা আমাকে পুরোপুরি আবিষ্ট করতে পারেনি কোনোদিনই। যথাসময়েই বুঝে নিয়েছিলুম একসঙ্গে সিনেমা ও সাহিত্যের জোড়া ঘোড়া চালাবার সাধ্য আমার হবে না। তাই পালিয়ে এসেছি আবার সাহিত্যজগতে। প্রেমাঙ্কুর, শৈলজানন্দ ও প্রেমেন্দ্র প্রভৃতি তা পারেননি, তাই সাহিত্যসভা থেকে তাঁদের বিদায় গ্রহণ করতে হয়েছে। অবশ্য প্রেমাঙ্কুর আবার নতুন করে কলম ধরেছেন বটে। কিন্তু সিনেমার সঙ্গে এখন আর তাঁর কোনো সম্পর্কও নেই।

কেবল সাহিত্যিক নন, অভিনেতা ছাড়া অন্যান্য শ্রেণির অধিকাংশ শিল্পীও সিনেমা নিয়ে মাতলে নিজের ধর্মরক্ষা করতে পারে না। চিত্রশিল্পীরূপে শ্রীচারুচন্দ্র রায়ের তারকা হচ্ছিল ক্রমেই ঊর্ধ্বগামী। সিনেমা জগতে গিয়েও তিনি শিল্পকর্ম ছাড়েননি বটে, কিন্তু একক শিল্পীরূপে তিনি করতেন যেসব রূপসৃষ্টি, প্রকাশ করতেন নিজের যে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, রূপরসিকদের কি তা থেকে বঞ্চিত হতে হয়নি? সিনেমায় এখন তিনি কী করছেন না করছেন বাইরে তার খবর আসে না। এবং তাঁর নিজের হাতে আঁকা কোনো ছবিও আর কারুর চোখে পড়ে না। লোকে তাঁকে এর মধ্যেই ভুলে যেতে বসেছে। আর তাঁর চেয়ে বয়োকনিষ্ঠ শিল্পী

দেবীপ্রসাদ নিজের সাধনায় অবহিত থেকে তাঁকে ছাড়িয়ে কত দূরে এগিয়ে যেতে পেরেছেন?

অনন্যসাধারণ গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র এবং তাঁর এককালীন শিষ্য শ্রীশচীন্দ্র দেববর্মণকে দেখুন। বৈঠকি গানের আসরে কৃষ্ণচন্দ্রের ব্যক্তিত্বের উচ্চতা বেড়ে উঠছিল ক্রমশই। কিন্তু তাঁর সে উচ্চগতি আজ হয়েছে রুদ্ধ, কারণ তিনি এখন সিনেমার প্রেমে মশগুল। তবু তো তিনি বেশ কিছু কাল ধরে দরাজ হাতে দান করে গিয়েছেন নব নব আনন্দ। কিন্তু শচীন্দ্র দেব উদীয়মান অবস্থাতেই প্রধান করে তোলেন টাকার ধান্ধা। তারপর থেকে তিনি একান্তভাবেই চিত্রজগৎবিহারী হয়ে স্বদেশি গানের আসর ছেড়ে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছেন বোম্বাই শহরের এ স্টুডিয়ো থেকে ও স্টুডিয়োয়। ব্যাঙ্কের খাতায় অঙ্ক বাড়ছে নিশ্চয়ই, কিন্তু বোবা হয়ে গেছে তাঁর ব্যক্তিগত মুখর আর্ট!

চলচ্চিত্র যে শিল্পীদের ব্যক্তিগত শক্তির পরিপন্থী, রবীন্দ্রনাথেরও ছিল এই ধারণা। শ্রীশান্তিদেব ঘোষ হচ্ছেন রবীন্দ্রসংগীতে বিশেষজ্ঞ এবং আজন্ম শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের ছাত্র। সিনেমাওয়ালারা তাঁকেও দলে টানবার জন্যে চেষ্টা করেছিল। তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পত্র লিখে রবীন্দ্রনাথের মতামত জানতে চান। তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে যে উষ্ণ উত্তর দেন, তা পাঠ করে শান্তিদেব সিনেমাওয়ালাদের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখেন।

জীবিকা নির্বাহের জন্যে অর্থের প্রয়োজনীয়তা কে অস্বীকার করে? কিন্তু অর্থাগম হলেই শিল্পসৃষ্টির কথা ভুললে শিল্পীর জন্যে দুঃখ হয়। বিগত যুগের অধিকাংশ বাঙালি সাহিত্যিকই লেখবার সময়ে টাকার কথা মনেও আনতেন না এবং ভারতবর্ষে বাংলা সাহিত্যের অতুলনীয় সমৃদ্ধির জন্যে পনেরো আনা গৌরব তাঁদেরই প্রাপ্য। এখনকার শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তকে দেখুন। যখন তাঁর জেব ছিল রিক্ত, তখনও তাঁর কলমের বিরাম ছিল না। এখন পদস্থ সরকারি চাকুরে হয়ে অর্থের জন্যে নেই তাঁর কোনোই দুর্ভাবনা, কিন্তু আজও তাঁর লেখনী অত্যন্ত অশ্রান্ত। এইখানেই পাওয়া যায় সাহিত্যিক মনোবৃত্তির পরিচয়। সুবর্ণপিঞ্জরে বন্দি করলেও বনের পাখিকে ভুলানো যায় না অরণ্যের সংগীত। আসুক সুখ, আসুক দুঃখ, সত্যিকার শিল্পীকে করতে হবেই শিল্পসৃষ্টি। প্রেমেন্দ্র ও শৈলজানন্দকে আমি সত্যিকার সাহিত্যিক বলেই শ্রদ্ধা করি। তাই তাঁদেরও মধ্যে দেখতে চাই সাহিত্যিক মনোবৃত্তি।

আমি তখন কালী ফিল্মের একখানি গীতিনাট্য-চি. (বিদ্যাসুন্দর) জন্যে গান রচনার এবং নৃত্য পরিকল্পনা ও পরিচালনার ভার . য়েছি। স্টুডিয়োতে যেতে হয় প্রত্যহ। সেই সময়ে একদিন কালী ফিল্মের মালিক বন্ধুবর শ্রীপ্রিয়নাথ গঙ্গোপাধ্যায় আমার হাতে একখানা কেতাব দিয়ে বললেন, 'হে. নদা, বইখানা পড়ে দেখবেন তো, ছবিতে জমবে কি না?'

বইখানির নাম 'পাতালপুরী'। লেখক শৈলজানন্দ। এও কয়লাকুঠি: কাহিনি। এ শ্রেণির লেখায় শৈলজানন্দের জোড়া নেই। সুতরাং গল্পটি যে ভালে. লাগল সে কথা বলা বাহুল্য। কেবল সাধারণ গল্প হিসাবে নয়, চিত্রকাহিনি হিসাবেও তার উপযোগিতা ছিল যথেষ্ট। প্রিয়বাবুকে সেই কথাই বললুম।

প্রিয়বাবু যথেষ্ট শ্রম, যত্ন ও আয়োজন করে ছবিখানি তুলেছিলেন। কয়লাখনির ভিতরকার দৃশ্য যথাযথভাবে দেখাবার জন্যে তাঁর অর্থব্যয়ও বড়ো কম হয়নি। নজরুল ইসলাম নিয়েছিলেন গান রচনার ও সুর সংযোজনার ভার। শৈলজানন্দ নিজেও দেখা দিয়েছিলেন একটি ছোটো ভূমিকায়।

ছবিখানি ভালো হলেও আশানুরূপ অর্থকর হয়নি। কিন্তু শৈলজানন্দ সেই যে চিত্রজগতের অন্দরমহলে ঢুকে পড়লেন, আজ পর্যন্ত আর বেরিয়ে আসেননি। সে বোধ হয় আঠারো-উনিশ বৎসর আগেকার কথা।

আগে তিনি মাঝে মাঝে আমার বাড়িতে এসে দেখা দিতেন। আমি বরাবরই শিল্পীদের সাহচর্য ভালোবাসি। তাঁকে পেলে খুশি হতুম।

একদিন দেখিয়েছিলুম তাঁকে নৈশজীবন। কলকাতায় নয়, চন্দননগরে। সেখানে গঙ্গার ধারে ছিল স্যাভয় হোটেল। সেখানে বাঙালিরা বড়ো একটা উঁকিঝুঁকি মারত না বা মারতে সাহস করত না। সেখানে হেসে গেয়ে নেচে আসর রাখত সাহেব-মেমরাই। হোটেলের স্বত্বাধিকারিণী রুশীয় মহিলা ম্যাডাম লোলা ছিলেন আমার বন্ধু। তাঁর আমন্ত্রণে আমার সাহিত্যিক ও শিল্পী সুহৃদদের নিয়ে প্রায়ই সেখানে গিয়ে উপস্থিত হতুম। একদিন সন্ধ্যার পর সেখানে নিয়ে গেলুম শৈলজানন্দকেও এবং ফিরে এলুম পরদিন সূর্যোদয়ের পর।

রচনা-বৈচিত্র্য আর সৃষ্টি-প্রাচুর্যে বাংলা সাহিত্যে একমাত্র হেমেন্দ্রকুমারই হেমেন্দ্রকুমারের তুলনা। উপন্যাস, ছোটোগল্প, নাটক, গীতি রচনা, চিত্রাঙ্কন, শিল্প-সমালোচনা, সম্পাদনা এমনকি নৃত্য পরিচালনাতেও হেমেন্দ্রকুমার রেখে গেছেন তাঁর স্বাতন্ত্র প্রতিভার স্বাক্ষর।

জয়ন্ত-মানিক, বিমল-কুমার আর সুন্দর দারোগা—অবিস্মরণীয় বিস্তৃতি পেয়েছে বাংলা রহস্য, রোমাঞ্চ আর অ্যাডভেঞ্চার-ভুবন।

বিপুল, বিচিত্র আর বর্ণময়—বহুল প্রচলিত থেকে অধুনালুপ্ত সমগ্র হেমেন্দ্রকুমার একালের পাঠকের হাতে তুলে দেবার প্রয়াসেই **হেমেন্দ্রকুমার রায় রচনাবলী**-র সশ্রদ্ধ প্রকাশ।

ISBN 81-7942-068-X